আর্য-সভ্যতার সন্ধানে

আর্য-সভ্যতার সন্ধানে

খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পরিবেশক

সাহিত্যায়ন

১/১বি, ডাঃ অমল রায়চৌধুরী লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

Arya Sabhyatar Sandhane : by Khagendranath Dasgupta

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রকাশক
সন্ধ্যা সেনগুপ্তা
৪২/বি, বাবুবাগান লেন
ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১

প্রচ্ছদশিল্পী
চারু খান

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

আমার সকল কাজের প্রেরণাদাত্রী
অকালপ্রয়াতা জ্যেষ্ঠা কন্যা
মৈত্রেয়ী-র অমর স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয়সূচী

মুখবন্ধ

আত্মানং বিদ্ধি—'আত্মাকে—নিজেকে জানো', এ কথাটি আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই উপলব্ধির বিষয়। মানবদেহে আত্মার অবস্থিতি যেমন ধ্রুব, স্ব স্ব দেশের মধ্যেও আত্মার অধিষ্ঠান তেমনি সত্য। স্বদেশের সেই আত্মাকে উপলব্ধি করাকেই দেশাত্মবোধ বলে। নিজ দেশকে ভালোবাসার কথা বলা হয়। দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হলে, সর্বাগ্রে তাকে জানতে হয়। তার ইতিহাস যেমন জানা প্রয়োজন, সে দেশের দর্শন ও স্মৃতি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ প্রয়োজন। দেশের জনগণ পুরুষানুক্রমিক কোন্ ভাবধারার উত্তরাধিকারী, তার সমাজ-ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে কোন্ পথে এগিয়েছে এ সকল জানা, দেশের মানুষ সম্বন্ধে সমগ্রভাবে ধারণা করা প্রয়োজন। অতীতকে না জানলে, বর্তমান গড়ে তোলা যায় না। কোন কিছু গড়তে হলে তার ভিত্তি প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, আমরা ভারতবাসী, নিজের দেশকে জানি না। আমরা একটা প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী; তুলনায় সে কত প্রাচীন, কি তার বৈশিষ্ট্য, কোন্ ভাবধারা যুগ যুগ ধরে আমরা বহন করে চলেছি এ সবই জানা প্রয়োজন—তা হলেই তো মমতা আসবে, ভালোবাসা জন্মাবে।

আমাদের পরম প্রিয়কবি রবীন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষে জন্মেছেন বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। তিনি লিখে গেছেন, "আমি ভারতবর্ষকে ভালো-বাসি—এ ভূপ্রকৃতিকে প্রতিমা জ্ঞানে পূজা করি বলে নয়—আমি ভালোবাসি—ভারতবর্ষ তার মহান সন্তানদের প্রজ্ঞালোকজাত মহান বাণীকে বহু বিক্ষত কালের মধ্যেও রক্ষা করে এসেছেন এ কারণেই। ... এ দেশেরই প্রাচীন ঋষিগণ, বিশ্বের অমৃতের পুত্রগণকে সম্বোধন করে যে আশ্চর্য সত্য জ্ঞানের সন্ধান রেখে গেছেন তার জন্যে।" সে জ্ঞানের উৎস কোথায়? সেই ঋষিগণ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন? কোন্ ভাবধারা বশে সে জ্ঞানের উদ্ভব, সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

বৈচিত্র্য বজায় রেখেও তার মধ্যে ঐক্যবোধ, ভারতীয় সভ্যতা দেখিয়েছে। কি করে পাশাপাশি ভিন ধর্মাবলম্বী মানুষ হানাহানি না করে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে সহবাস করতে পারে, প্রাচীন ভারত তা দেখিয়েছে। সহিষ্ণুতা, গ্রাহিষ্ণুতা প্রভৃতি জাতিগত বৈশিষ্ট্য কোন্ গুণে অর্জন করেছিল, এ সকলের ইতিহাস জানতে পারলে দেশের মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ আপনিই জন্মাবে। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, "নিজ সামর্থ্যে বিশ্বাস থেকেই বেরিয়ে আসে জাতির মূল শক্তি—আর ঐ বিশ্বাস, পূর্বপুরুষদের গুণ গৌরব সম্বন্ধ থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয় এই আশ্বাস—অতীতে যা করতে পেরেছে ভবিষ্যতেও সে তা করতে সমর্থ।"

একদা ছোটবেলায়, বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার এবং কয়েক বৎসর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের সৌভাগ্য ও সুযোগ আমার হয়েছিল। সে সময়ে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কাছ থেকে শুনে মনে গেঁথে ছিল— আমরা আমাদের দেশের যে প্রাচীন ইতিহাস পড়ি তা বিকৃত; ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক প্রচারিত কতকগুলো অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে তা রচিত। আমাদের দেশের প্রকৃত পরিচয়, আমরা তা থেকে পেতে পারি না। পরে, বি. এ. ক্লাসে ইতিহাস (ভারতীয়) পড়তে গিয়ে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। মনে ইচ্ছা জেগেছিল, এ সম্পর্কে গবেষণা করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করবার। রাজনীতির আবর্তে পড়ে, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারিনি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কলম ধরেছি বটে, কিন্তু যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। আমি নিজে পণ্ডিত নই, প্রাচীন বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় আমার দখলও নেই। যে সকল পুঁথিপত্রের সহায়তা প্রয়োজন, অর্থাভাব এবং বার্ধক্য জনিত অক্ষমতার কারণে তা সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে পারি নি। তা সত্ত্বেও প্রচেষ্টায় বিরত হইনি।

আমি পল্লবগ্রাহী, নানাস্থান থেকে সংগ্রহ করে একত্রে সাজিয়েছি মাত্র। এ পুস্তক কোনদিন প্রকাশিত হবে তা ভাবিনি। কোথা থেকে কোন্‌টি সংগ্রহ করেছি তা সম্পূর্ণ স্মরণে নেই, সব লিখেও রাখিনি। এই পুস্তক রচনায় যেসব পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করেছি, যতদূর স্মরণে আছে তার মোটামুটি তালিকা এ-পুস্তকের শেষে দেওয়া হলো। তা ছাড়া, এ পুস্তকের স্থানে স্থানে, কোন্ তথ্য কোন্ উৎস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, পাদটীকা আকারে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমার এই পুস্তক যদি অনুসন্ধিৎসু মনে আগ্রহ জন্মাতে পারে এবং এ সম্পর্কে আরও গবেষণায় উদ্‌বুদ্ধ করাতে পারে তাহলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক মনে করব। সব শেষে উল্লেখ্য, আমার লেখাটি পড়ে শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি ভূমিকা লিখে পাঠান এবং লেখাটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর ভূমিকাটি এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছি।

এই গ্রন্থ হয়তো কোনদিনই প্রকাশিত হত না, যদি আমার বন্ধুবর প্রয়াত শ্রমিকনেতা স্বর্গীয় দেবেন সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র আমার অনুজপ্রতিম শ্রীরঞ্জিতকুমার সেনগুপ্ত সর্বদায়িত্বে এই কাজের ভার গ্রহণ না করতেন। তাঁর অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ও সততার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভূমিকা

বর্তমান সন্দর্ভের লেখক শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি প্রবীণ বয়সে সক্রিয় জীবন হতে অবসর গ্রহণ করে তিনি গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ভারততত্ত্ব। বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠার সহিত বিভিন্ন সূত্র হতে নানা তথ্য সংগ্রহ করে বর্তমান পুস্তকখানি রচনা করেছেন।

বর্তমান সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় যাকে ভারতের আর্য সংস্কৃতি বলা হয়, তার সঙ্গে জড়িত কতকগুলি প্রশ্ন। সেই প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে বেশ দুরূহ। ফলে তাদের নিয়ে বিভিন্ন গবেষকের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে, এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত ইতিহাসে গৃহীত হয়েছে। বর্তমান লেখক সেই সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন; প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি নিজস্ব প্রতিপাদ্য স্থাপন করেছেন।

তাঁর প্রতিবাদের তাৎপর্য বুঝতে হলে বর্তমান ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে যে সিদ্ধান্তগুলি স্বীকৃতি লাভ করেছে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তার ভিত্তিতে ভারততত্ত্ববিদ হুইলার (Wheeler) ও পিগোট (Piggot) কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, ভারতের আর্য সংস্কৃতি, ভারতের বাহির হতে আগত এক স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠীর (race) সংস্কৃতি। তাদের আগমনের পূর্বে খ্রীস্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দে একটি উচ্চতর মানের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার ধ্বংসাবশেষ হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া যায়। আর্যগণ, উত্তর-পশ্চিম হতে এসে খ্রীস্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দের প্রারম্ভে এই প্রাচীনতর সংস্কৃতির ধারকদের পরাভূত করে পঞ্চনদীতে বসতি স্থাপন করে। এই অভিযানে ইন্দ্র এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরাজিত জাতির সহিত যুদ্ধে তিনি বহু দুর্গ ধ্বংস করেন বলে তাঁকে পুরন্দর নামে ভূষিত করা হয়। পরবর্তীকালে আর্যদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সংঘর্ষ হয়। এরাই ঋকবেদের দস্যু বা দাস নামে বর্ণিত। আর্যরা আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদ রচনা করেন।

দেখা যাবে বর্তমান সন্দর্ভকার এই সিদ্ধান্তগুলি একেবারেই গ্রহণ করেননি। এর পরিবর্তে তিনি কতকগুলি নিজস্ব প্রতিপাদ্য স্থাপন করেছেন। তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

তাঁর অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য হলো, আর্যরা বাহির হতে আসেনি। তারা আদিম কাল হতে ভারতের মানুষ। আর্য শব্দ, একটি পৃথক মানবগোষ্ঠী (race) সূচিত করে না। তা একটি গুণবাচক শব্দ। অনুরূপভাবে, যাদের ঋগ্বেদে দস্যু বা দাস বলা হয়েছে, তারাও স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী (race) নয়। তারা বৈদিক ক্রিয়ার বিরোধিতা করতো বলে তাদের দস্যু বলা হতো। উভয়েই একই মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও বলেন, সংস্কৃত ভাষার সহিত ভারত-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির সাদৃশ্য এটা সূচিত করে না যে, এই ভাষাগুলি যারা ব্যবহার করে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীনকালে ভারতের বাহিরে এক সাধারণ আবাসভূমি ছিল। কারণ, এ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা তাদের কোন আদিম বাসস্থান আবিষ্কার করে দিতে পারে নি। অতিরিক্ত ভাবে দেখা যায়, প্রাচীনকালে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর দেশান্তর গমন ঘটেছে পূর্ব হতে পশ্চিমে, পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে নয়।

লেখকের আর একটি মূল প্রতিপাদ্য হলো, হারাপ্পা সংস্কৃতি—বাহির হতে আগত শত্রুর আগমনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। তা এক ব্যাপক ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ছিল এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তা ভারত-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত একটি যুগের মত এবং সম্ভবতঃ বৈদিক সংস্কৃতির সমসাময়িক। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ইন্দ্রকে "পুরন্দর" নামে ভূষিত করা হয়েছিল রূপক অর্থে। তিনি মেঘকে আঘাত করে বৃত্ররূপ দৈত্যকে ধ্বংস করে বারিবর্ষণ সংঘটিত করেন। দেবতা হিসাবে এটি তাঁর মুখ্য ভূমিকা। তিনি মেঘের কল্পিত দুর্গ ভাঙেন বলে তাঁর এই নাম।

লেখকের ধারণায় ঋগ্বেদের রচনাকাল, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের পূর্বে স্থাপিত হওয়া উচিত। শতপথ ব্রাহ্মণে নক্ষত্র সন্নিবেশের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে নির্ধারিত করা হয়। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পূর্ববর্তী ১৫৪ জন রাজার নাম পেয়েছিলেন। পুরাণে যে রাজাদের নামের উল্লেখ আছে, তাদের সংখ্যা অনুরূপ। সুতরাং এই তথ্যের ভিত্তিতে, চন্দ্রগুপ্ত হতে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত তিন হাজার বৎসরের অনুমান করা যায়।

লেখকের এই প্রতিপাদ্যগুলি দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যয়ন ও চিন্তা হতে উদ্ভূত।

তিনি নিষ্ঠার সহিত প্রচুর পরিশ্রম করে এবং বহু তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সুতরাং সেগুলি ইতিহাসে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী হলেও উপেক্ষণীয় নয়। বরং সত্যের অনুরোধে প্রশ্নগুলি নূতন ভাবে বিবেচনা করে দেখার সপক্ষে সেগুলি প্রবল যুক্তি হয়ে দাঁড়াবে। আমার ধারণা, লেখকের স্থাপিত প্রতিপাদ্য ও সমর্থক যুক্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আলোচনার ফলে আর্য সংস্কৃতি বিষয়ক জটিল প্রশ্নগুলির আরও সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব হবে। এইভাবে ব্যবহৃত হলে, বর্তমান গ্রন্থকার যে কঠিন শ্রম স্বীকার করেছেন তা সার্থক হয়ে উঠবে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের এই নূতন ভূমিকায় আবির্ভাব আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। পরিণত বয়সে এমন তীব্র জ্ঞানপিপাসা এবং তার তৃপ্তির জন্য এমন কঠোর সাধনা এমন একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত—যা সকল ধরনের জ্ঞানপিপাসু মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার অধিকার রাখে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্য : কিছু বিতর্কিত প্রশ্ন

ভারত ইতিহাসের সূত্রপাতেই আমরা "আর্য" শব্দটির সাথে পরিচিত হই। এদেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকেই শিখতে হয় ও জানতে হয় যে, অতি প্রাচীন কালে আর্য নামে এক মানবগোষ্ঠী (race) বা ভাষাভাষীগোষ্ঠী বাইরের কোথাও না কোথাও হতে, (খুব সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়ার মালভূমি অঞ্চল হতে) ভারতে অনুপ্রবেশ করে, সংগ্রামে সেদেশের আদিম অধিবাসীগণকে পরাজিত, নিহত বা বিতাড়িত করে বসতি স্থাপন করে। তাদেরই বংশধরগণ বর্তমান উত্তর ভারতের অধিবাসী। অনুমান-নির্ভর এই তত্ত্বকথা স্বতঃসিদ্ধ রূপে দেশের জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বলা হতো, এই আর্যরা পৃথিবীর আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে একটা বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর বা জাতির অন্তর্গত। এদের শারীরিক গঠনে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এদের নাক, মুখ, চোখ, চোয়াল, করোটি, এদের রঙ অপরাপর জাতিগোষ্ঠী হতে পৃথক। পণ্ডিতগণের মধ্যে একদল মত বদলালেন, বললেন—এই আর্যরা একটা পৃথক জাতি বটে তবে এদের বৈশিষ্ট্য, শারীরিক গঠনে নয়—ভাষায়। কোন স্পষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ, ইয়োরোপীয়গণের এ সিদ্ধান্ত একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। প্রথম প্রথম বলা হতো, সুসভ্য আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে অনুন্নত আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার ঘটায়।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ যখন (বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে) ভারতে অতি প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন সমূহ আবিষ্কার করলেন—ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করলেন, এটা উন্নত সভ্যতা—আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশের পূর্ববর্তী ঘটনা। যাযাবর অর্ধ-বর্বর আর্যগণ, ভারতে প্রবেশের মুখে এই সভ্যতার ধ্বংস সাধন করেছিল। অনুমান-নির্ভর এই তথ্যও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ মান্য করে নিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীগণও বিদ্যালয়ে তাই পাঠ করছে।

অথচ, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে, ভারতীয়গণের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল—আর্যগণ ভারতেরই প্রাচীনতম বিশিষ্ট অধিবাসী। আর্যসভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা, ভারতেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে-পুরাণে-সাহিত্যে-ধর্মগ্রন্থে কোথাও ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নেই এবং কিম্বদন্তী আকারেও আভাস-ইঙ্গিত নেই যে আর্যগণ বহিরাগত।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণই প্রথম আর্য জাতি ও ভাষা সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, আর্য শব্দটি ভারতীয় শব্দ ; ভারতেই এর বহুল প্রচার। এই শব্দের ও নামের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই ঋগ্বেদ ও অপর বেদ-সংহিতায়। ইয়োরোপীয়গণ এ নামের সাথে পরিচিত হন আধুনিক যুগে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বেদই মানবজাতির প্রথম গ্রন্থ, আর্য-ধর্মের আর্য-চিন্তার আর্য-বিশ্বাসের প্রথম ইতিহাস। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণও একথা বিশ্বাস করেন।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করলেন—ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সাথে শুধু প্রাচীন পারসীক নয়, ইয়োরোপের গ্রীক ল্যাটিন জার্মান প্রভৃতি ভাষারও আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। ভাষার সাদৃশ্য শুধু নয়—ভারতীয় আর্য, প্রাচীন পারসীক এবং অধিকাংশ ইয়োরোপীয় জাতির আকৃতিগত সাদৃশ্যও কোন কোন নৃতত্ত্ব বা জাতিতত্ত্ববিদ খুঁজে পেলেন। অপর দিকে, আর একদল ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ঋগ্বেদ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে আবিষ্কার করলেন—আর্যগণের সাথে অনার্যগণের তথাকথিত বহু সংগ্রামের কল্পিত কাহিনী। সুতরাং ধরে নেওয়া হলো, অনার্যগণই ভারতের প্রাচীন-তম অধিবাসী। আর্যগণ বাইরের কোন দেশ থেকে এসে সংগ্রামে অনার্যদের পরাজিত করে, নিহত ও বিতাড়িত করেই বসতি বিস্তার করে। একদিকে ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদগণের ও নৃতত্ত্ববিদগণের ঊনবিংশ শতাব্দীর গবেষণালব্ধ সীমিত তথ্য, অপরদিকে ঋগ্বেদে বর্ণিত আর্য-অনার্যদের সংগ্রামের কল্পিত কাহিনী ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণের এরূপ দৃঢ় ধারণা পোষণে সহায়তা করে।

ইটালি দেশের ফ্লোরেন্স বন্দরের বণিক, ফিলিপো সসেটি, গোয়া বন্দরে পাঁচ বৎসর বসবাসের পর (১৫৮৩-১৫৮৮) সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষার সাথে ইয়োরোপীয় বিশিষ্ট ভাষা সমূহের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন।

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে, কূর্দু (Courdeux) লক্ষ্য করেন যে, সংস্কৃত ভাষার সাথে গ্রীক ও ল্যাটিন-এর ঘোরতর সাদৃশ্য আছে। ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দে এক জার্মান মিশনারী গবেষক সংস্কৃত ভাষার সাথে জার্মান ও ল্যাটিন ভাষার সংখ্যাগত সাদৃশ্য উল্লেখ করেছিলেন।

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোনস্ কলিকাতায় অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় ভাষণ দান কালে উল্লেখ করেন— "সংস্কৃত ভাষা, যত প্রাচীনই হোক না কেন, তার গঠনশৈলী আশ্চর্যজনক ও

গ্রীক ভাষা থেকে অধিকতর পূর্ণতা প্রাপ্ত; ল্যাটিন ভাষা থেকে অধিকতর শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এর প্রত্যেকটির তুলনায় অধিকতর নিখুঁতভাবে পরিমার্জিত; অথচ ক্রিয়াপদ সমূহের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে উভয়েরই সাথে প্রগাঢ়তর প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বর্তমান, যাহা সম্ভবতঃ আকস্মিকভাবে উদ্ভুত হয়নি। সেই সাদৃশ্য এত দৃঢ় যে, তিনটি ভাষা একই মূল থেকে উৎপন্ন—হয়তো সেই মূলের আজ আর অস্তিত্বই নেই, এরূপ বিশ্বাস না করে কোন ভাষাবিদ্‌ই গবেষণা করতে পারে না। যদিও তাদের পৃথক বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গি; গথিক ও কেল্টিক ভাষা সংস্কৃতের সাথে একই উৎস থেকে উৎপন্ন, এরূপ ধারণার সমর্থনে অনুরূপ কারণই বিদ্যমান—সে কারণ তত জোরালো না হতে পারে।"

হেগেল এই আবিষ্কারকে এক নূতন পৃথিবী আবিষ্কার রূপে বর্ণনা করেছেন। এই সময় থেকেই একটি নূতন বিজ্ঞান—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Phylology) সৃষ্টি হয়।

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বপ (Bopp) গবেষণা করে এই ভাষাগুলো "ইন্দো-ইয়োরোপীয়" গোষ্ঠীর ভাষা বলে নামকরণ করেন। ১৮৩৩-৩৪ সালে, বপ একটি তুলনামূলক অভিধান রচনা করেন।

ডাঃ টেলর বলেন, এই বৃহৎ ভাষা-পরিবারে, ইয়োরোপের সাতটি ভাষা-গোষ্ঠী, যথা : হেলেনিক, ইটালিক, কেল্টিক, টিউটনিক, স্লাভনিক, লিথুয়ানিক বা লেট্টিক ও আলবেনিয়ান—অর্থাৎ কেবলমাত্র বাস্ক, ফিন্নিক, মালেয়ার ও তুর্কী বাদে ইয়োরোপের সকল ভাষা এর অন্তর্গত বলে মত প্রকাশ করেন। এ ছাড়া এশিয়ার তিনটি ভাষাগোষ্ঠী—ভারতীয়, ইরানীয়, (জেন্দ, পারসীক, পুস্তু ও আফগান বেলুচি, কুর্দিশ ও অসেটিস) ও আর্মেনিয়ান (গ্রীক ও ইটালিয়ান-এর মধ্যবর্তী) এই আর্য ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত।

আচার্য ম্যাক্সম্যুলর সাহেবও মনে করতেন, আর্যরা এক পৃথক জাতি। তবে কোন মানুষের চুল রক্ত হাড় বা মাথার খুলি দেখে আর্য-অনার্যত্ব নিরূপণ করা যায় না। ওঁর মতে, আর্যভাষায় যিনি কথা বলেন, তিনিই আর্য।

এরূপ মতবাদে বিশ্বাসী, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অধ্যাপক, দার্শনিক এস্. এন. দাশগুপ্ত মহাশয়, তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ভূমিকায় লিখেছিলেন : "এ তথ্য সর্বজন স্বীকৃত যে, সংস্কৃত প্রাচীন আর্য জাতির কথ্য ভাষার জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং সম্ভবতঃ একমাত্র জীবিতা কন্যা। অথচ অপর বিশিষ্ট ছয় সদস্য (কন্যা) কোন স্মারক সাহিত্য রেখে যাননি। তাদের মৌলিক আকৃতি, তাদের নিজেদের

কন্যারূপা ভাষা সমূহ যে সকল উপাদান রেখে গেছে, তা থেকে যতটা সম্ভব পুনর্গঠন করে নিতে হয়। পারসীক, হেলেনীয়, ল্যাটিন, কেল্টিক, টিউটনিক ও লেটো স্লাভনিক সম্পর্কে ঐ কথাই বলতে হয়।"

ইয়োরোপীয় বহু পণ্ডিতের মতে—আর্যভাষাগোষ্ঠী এক দিকে ভারতে, অপরদিকে ইয়োরোপের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। শুধুমাত্র বাদ ছিল পশ্চিম এশিয়ার সেমেটিক ভাষাভাষী তুর্কি-আরব ও ছোটো খাটো দু-তিনটি ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল। পরবর্তীকালে সেমেটিক ও তুর্কি জাতিগোষ্ঠী অনুপ্রবেশ না করলে, ভারত থেকে ইয়োরোপের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ভাষা বিষয়ে অবিভাজ্য থাকত। 'আর্য' নামে পরিচিত ভাষাভাষীগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃত ও জেন্দ্ (পারসীক) সর্বপ্রাচীন এ বিষয়ে মতভেদ নেই। কেবলমাত্র লিথুয়ানিয়ান অতি প্রাচীন হলেও তার কোন প্রাচীন সাহিত্য নেই, কোন পুঁথিপত্র নেই, যা বেদ ও অবেস্তার সাথে তুলনা করা চলে। কোন সুপ্রাচীন কালে হয়তো ভারত থেকে আর্যগণ লিথুয়ানিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভাষা তাদের পূর্ববৎ রয়ে গেছে।

"মধ্য এশিয়া আর্যগণের আদিম বাসস্থল"—এ মতবাদ প্রথমে জে. জি. রোডস্ (J. G. Rhodes) ১৮২০ সালে প্রচার করেছিলেন। পারসীক ধর্মগ্রন্থ 'ভেন্দিদাদ'-এর প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত ভৌগোলিক বিবরণ-সমূহ বিচার করে, ব্যাকট্রিয়াই পারসীগণের আদিম বাসভূমি এই বিশ্বাসে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। রোডস্-এর মতবাদ, স্লেজেল (Schlegel), পট (Pott), ল্যাসেন (Lassen) প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ সমর্থন করেন। পট সাহেব, অক্সাস ও যাক্সারটেস (আমু ও সিরদরিয়া) নদীদ্বয়ের উৎপত্তির মধ্যবর্তী অঞ্চলই সেই আদিম নিবাস বলে বর্ণনা করেন। ১৮৪৭ সালে ল্যাসেন মন্তব্য করেন, সংস্কৃত ভাষাভাষীগণ উত্তর-পশ্চিম থেকে কাবুল দিয়ে খুব সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছিল। অবেস্তার বর্ণনানুসারে পারসীক পূর্বপুরুষগণের আদি বাসস্থল নিশ্চয়ই আমু ও সিরদরিয়া নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটে বেলুরতাগ (Belurtag) ও মুস্তাগ নামীয় ঢালু অঞ্চলে ছিল।

আর্যগণের আদিম নিবাস

১৮৪৮ সালে জেকব গ্রীম (Jacob Grimm) এই মতবাদ সমর্থন করে আর্যদের পূর্ব হতে পশ্চিমে—অর্থাৎ এশিয়া থেকে ইয়োরোপে অভিযানের কাল্পনিক বর্ণনা প্রকাশ করেন।

১৮৫৯ সালে ম্যাক্সম্যুলর, গ্রীম-এর মতবাদ সমর্থন করে তাঁর 'প্রাচীন

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' (*History of Ancient Sanskrit Literature*) গ্রন্থে মন্তব্য করেন—"আর্য জাতির প্রধান দল বরাবরই উত্তর-পশ্চিম দিকেই অভিযান করেছিল। ভারতের ব্রাহ্মণিক আর্যগণ ও ইরানের জোরোয়াষ্ট্রিয়ানগণ দক্ষিণী শাখা ছিল। কোন ঐতিহাসিক বলতে পারে না কোন্ প্রেরণার বশে এই দুঃসাহসী যাযাবরগণ এশিয়ার মধ্য দিয়ে ইয়োরোপের সাগরতীরে ও দ্বীপে তাড়িত হয়েছিল।" তিনি ১৮৬১ সালে তাঁর *Lecture on the Science of Languages* নামক পুস্তকে মন্তব্য করেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন ভারতীয় ও পারসীকগণ গ্রীক, রোমান, স্লাভ, কেল্ট, জার্মানদের আদিপুরুষগণ একত্রে একই আচ্ছাদনের নীচে বসবাস করত। মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালভূমিকেই তিনি সেই অঞ্চল বলে অনুমান করেছিলেন।

এই মতবাদ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণকে এরূপ আচ্ছন্ন করেছিল যে, পিকটেট (Pictet) সাহেব তাঁর *Origines of Indo-Europeans* গ্রন্থের ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে, আর্যগণ মধ্য এশিয়া থেকে কোন্ কোন্ পথে ইয়োরোপ অভিযান করেছিল তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন। অবশ্য সবই তিনি কল্পনা নেত্রে দেখেছিলেন।

১৮৭৪ সালে অধ্যাপক সায়ী (Sayee) তাঁর *Principles of Philology* নামক পুস্তকে (পৃ. ১০১) লিখলেন : আর্য ভাষা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল মধ্য এশিয়ার আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া নদীর উৎপত্তিস্থলের মধ্যবর্তী অঞ্চল (মালভূমি) বেলুরতাগ ও মুস্তাগ নামক পশ্চিম ঢালু এলাকায়।" তাঁর মতে, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বই আর্যভাষাভাষীদের আদি নিবাস এশিয়াতে—এ তত্ত্ব প্রমাণিত করে। সকল আর্যভাষার মধ্যে, প্রথম থেকে জেন্দ ও সংস্কৃত ভাষাতেই সব চাইতে কম পরিবর্তন ঘটেছে। অপর পক্ষে, পশ্চিমে কেল্টিক ভাষা সব চাইতে বেশি রূপান্তর প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং জেন্দ ও সংস্কৃত ভাষা অঞ্চলদ্বয় নিশ্চয় আদিম নিবাসের সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন অবেস্তাতেও পাওয়া যায়। অহুর মাজদা (পারসীগণের প্রধান দেবতা) ব্যাকট্রিয়াতে প্রথম মনুষ্য সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য সায়ী সাহেব স্বীকার করেছেন —এই আখ্যায়িকা পরবর্তী কালের রচনা এবং শুধুমাত্র জোরোয়াষ্ট্রিয়ানগণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

মধ্য এশিয়া ছাড়াও, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ আরও নানা অঞ্চলকে আর্যদের আদি নিবাস রূপে কল্পনা করেছেন। এ বিষয় নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই।

১৮৭৬ সালে মমসেন (Mommsen), ইউফ্রেটিস উপত্যকা আর্যদের

আদিনিবাস বলে মন্তব্য করেন। অধ্যাপক জে. এস. মায়ার্স, হ্যারল্ড পিক (Harold Peake), চাইল্ড (Childe)[১] প্রভৃতির মতে, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, আর্যদের আদিনিবাস ছিল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দে, দক্ষিণ রাশিয়া ও পূর্বাঞ্চলের কাস্পিয়ান সাগরতীরে।

অপর এক পণ্ডিতপ্রবর কুনো সাহেব এই সব মতবাদ অস্বীকার করে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, আদিম অবিভক্ত আর্যগণ নিশ্চয়ই এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে অধিক সংখ্যায় বসবাস করত—যেখানে হাজার হাজার বৎসর ধরে তাদের কথ্য ভাষার ব্যাকরণ গঠিত হয়, ভাষার উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল সেখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেই বিরাট অঞ্চল নিশ্চয়ই সমতল ছিল, সুগম ছিল; বড় বড় পর্বত-অঞ্চল কিম্বা মরুভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল না, আবহাওয়া পরিমিত ছিল। সেই প্রাচীন যুগে সুউচ্চ পর্বত-প্রধান ব্যাকট্রিয়ানা অঞ্চলে আর কত মানুষ ধরত—যাতে তাদের বংশধরগণ, ইয়োরোপ-এশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে! সুতরাং ব্যাকট্রিয়া নয়, উত্তর ইয়োরোপের বিশাল সমভূমি—উরাল থেকে উত্তর জার্মানী, উত্তর ফ্রান্স হয়ে একেবারে অ্যাটলান্টিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলই সেই আদিম বাসভূমি। সেই বিশাল অঞ্চলে, সেকালে জীবন ধারণের অবস্থা সহজসাধ্য ছিল না, বেঁচে থাকবার জন্য সংগ্রাম কষ্টসাধ্য ছিল—যাতে আর্যগণের মত দুর্ধর্ষ উদ্যমশীল জাতি গড়ে উঠতে পেরেছিল। ডাঃ শ্রেডারও (Dr. Schrader) ইয়োরোপকেই আর্যদের আদিম বাসভূমি বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এশিয়ার আদিনিবাস থেকে আর্যদের ইয়োরোপে অভিযান সম্পর্কে, ইংলণ্ডের ল্যাথাম সাহেব প্রথম অপত্তি তুলেছিলেন। তাঁর মতে, শাখা থেকে গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি থেকেই শাখা হয়। ইয়োরোপেই যখন অধিকাংশ আর্যজাতির বাস, তখন সহজেই এ কথা মনে জাগে যে ইয়োরোপেই আর্য-জাতির উদ্ভব হয়েছে এবং পারস্য ও ভারতবর্ষে তার একটা শাখা প্রসারিত হয়েছে মাত্র।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাতত্ত্ববিদ হুইটনি সাহেব উল্লেখ করেন, আর্যদের আদিম বাসস্থান সম্পর্কে পৌরাণিক উপাখ্যান, ইতিহাস বা ভাষা আলোচনা

১. Childe, Gordon (1892-1957) Prof. of Pre-Historic Archaeology at the University of Edinburgh. The Director of Archaeology, London University.

দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কোন পথ নেই। অতএব মধ্য এশিয়ায় আর্যদের আদিম বাসস্থান নিরূপণ করা নিতান্তই কপোল-কল্পিত অনুমান।

ডাঃ আইজ্যাক টেলর (Dr. Isaac Taylor) তাঁর *Origin of the Aryans*—'আর্যজাতির উৎপত্তি'-নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন: "এক অর্ধ-যাযাবর জাতি, যেমন আদিম আর্যগণ, যাদের উপজীবিকা কৃষি ও পশু-পালন, তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, পশু চরাবার জন্য নিশ্চয়ই বিরাট এলাকার প্রয়োজন ছিল। মধ্য এশিয়ায় এক তাতার পরিবারের তিনশত গো-মহিষ চরাবার জন্য প্রয়োজন হয় ৩০০০ একর জমি। সুতরাং দশ হাজার মানুষ সম্বলিত একটি জাতিগোষ্ঠী নিশ্চয়ই ৪০০০ থেকে ৬০০০ বর্গমাইল দখল করে থাকে।" এই হিসাবে, তাঁর মতে, মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি—কাস্পিয়ান সাগর থেকে বলখাস হ্রদ অতিক্রম করে সহস্রাধিক মাইল জুড়ে যে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি আছে তাই আর্যদের আদিনিবাস হবার যোগ্যতা রাখে। ডাঃ টেলর-এর মতে, ইয়োরোপ আর্যদের আদিনিবাস হতে পারে না। নবাশ্মীয় যুগে, ইয়োরোপের সংস্কৃতি অতি নিম্নমানের ছিল ; এরা ছিল যাযাবর জাতি, অশ্বারোহী। মহিষ-টানা গাড়িতেও চড়ে বেড়াত। গ্রীষ্মকালে গাছের লতাপাতা দিয়ে তৈরি ঝুপড়িতে থাকত, শীতকালে থাকত মাটির নীচে গোলাকার গর্ত করে। গাছের গুঁড়ি দিয়ে নৌকা তৈরি করতে জানত। চট পরিধান করত, হাড়ের সূঁচ দিয়ে সেলাই করত। একশত পর্যন্ত গুণতে পারত, কৃষি জানা ছিল কিনা বলা যায় না—থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত আদিম স্তরের। সম্পত্তি বলতে ছিল গৃহপালিত পশু, জমি নয়। তাদের কোন দেবতা ছিল না, দেবমূর্তিও ছিল না। স্থানীয় তামা ছাড়া আর কোন ধাতুর কথা জানা ছিল না। ডাঃ টেলর দেখিয়েছেন—ইয়োরোপের লম্বা মাথাযুক্ত আদিম অসভ্যরা (Delico-cephalic Savages of the Kitchen Middens) অথবা লম্বা মাথাযুক্ত দক্ষিণ ও পশ্চিম ইয়োরোপের নরখাদকরা কখনো ইয়োরোপকে আর্যজাতিতে পরিণত করতে পারেনি। কোন সুদূর অতীতে এরা হিন্দু, রোমান, গ্রীকদের আর্য করেছে—পেলকা (Pelka) এর সাথে গলা মিলিয়ে বলেন, এরূপ ভাবার চাইতে, এইটে অনুমান করা বরং সহজ যে, বাল্টিক সাগরতীরের লম্বা মাথাযুক্ত আদিম অসভ্যরা, তাদের গোল মাথাযুক্ত (Brachy Cephalic) প্রতিবেশী লিথুয়ানিয়গণ থেকে আর্যভাষা শিখেছে।

ইয়োরোপই আর্যদের আদিম বাসভূমি—এই মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু ইয়োরোপীয় পণ্ডিতই মত প্রকাশ করেছেন।

মানবজাতির প্রথম বাসস্থল উত্তর মেরু অঞ্চল। এই মতবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট—ডাঃ ওয়ারেন (**Dr. Warren**)। ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এম্. ডি. সাপোর্টা (**M. D. Saporta**) ঐ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অধ্যাপক রাইস (**Rhys**) কেল্টিক ও টিউটন কিম্বদন্তীসমূহ বিচার করে এবং গ্রীক পুরুষানুক্রমিক উপকথা বিচার করে, আর্যদের আদি নিবাস উত্তর ইয়োরোপের জার্মানী ও স্কাণ্ডিনেভিয়ার কোন এক স্থলে—সম্ভবতঃ সুইডেনের দক্ষিণে ছিল বলে মত প্রকাশ করেন। তারও পূর্বে আর্যগণ ছিল উত্তর মেরুতে—ফিনল্যাণ্ড-এর উত্তরে—শ্বেতসাগর (**White Sea**)-এর নিকটে।

ভারতবর্ষের লোকমান্য তিলক তাঁর ***Artic Home in the Vedas*** 'আর্যদের আদি নিবাস—বেদ সমূহে' নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন যে আর্যদের আদি নিবাস উত্তর মেরুতেই ছিল। পারসীকগণের আবেস্তা ধর্মপুস্তকে প্রলয়কালে বরফ ও তুষারের আক্রমণে আর্যদের "আরিয়ানা বীজো" নামক আদি নিবাস পরিত্যাগ করবার কাহিনী, এই পুস্তক লেখার প্রথম সূত্র। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে—অথর্ববেদে, ব্রাহ্মণে, মনুসংহিতায়, মহাভারতে ও পুরাণে এক প্রলয়ের উল্লেখ আছে, তিনি এই প্রলয়কেও অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য ঋগ্বেদে কোন প্রলয়ের উল্লেখ নেই। তিনি নিজেই তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, আর্যদের আদিনিবাস মেরুদেশে ছিল এরূপ কোন স্পষ্ট উল্লেখ বেদে নেই। তবে, তিনি ঋগ্বেদের বহু ঋকের উল্লেখ করে, তাঁর ইচ্ছামত সেইসব ব্যাখ্যা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, ঋষিগণ মেরুদেশের কথা জানতেন। তাঁর ঋক সমূহের ব্যাখার সঙ্গে কোন প্রাচীন ভাষ্যকারের—যথা যাস্ক, শাকপূর্ণি, উর্ণনাভ, দুর্গাচার্য প্রভৃতির, এমনকি মধ্যযুগের সায়ন-এর ব্যাখ্যার কোন সংগতি বা সামঞ্জস্য নেই। অপর ঋক সমূহের ব্যাখ্যার সাথেও কোন সামঞ্জস্য নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, 'ঋগ্বেদিক ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকে ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস অষ্টম অধ্যায় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায়—৩৭২ পৃষ্ঠা থেকে ৫৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিলক মহাশয়ের ঋগ্বেদের ঋক সমূহের ব্যাখ্যার বিস্তৃত আলোচনা করে তাঁর ব্যাখ্যার ভুল দেখিয়েছেন ও তাঁর মতবাদ খণ্ডন করেছেন। ভারতীয় যে সকল গ্রন্থে তিনি (লোকমান্য তিলক) ঐ প্রলয়ের উল্লেখ দেখেছেন তার সাথে উত্তর মেরু প্রলয়ের বা বরফাচ্ছন্ন হবার ঘটনার ব্যবধান সহস্র সহস্র বৎসরের। ভারতে প্রলয় ঘটেছিল সাগর জল স্ফীত হয়ে—উত্তর গিরি অর্থাৎ হিমালয় স্পর্শ

করেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, মনুর নৌকা মৎস্য দ্বারা চালিত হয়ে "উত্তর গিরিতে" এসে ঠেকেছিল। উত্তর মেরু থেকে হিমালয় উত্তরে নয়, বরং দক্ষিণে। শতপথ ব্রাহ্মণ বা অবেস্তার প্রলয় আঞ্চলিক ঘটনা, উত্তর মেরুর মত বিশাল মহাদেশ জুড়ে নয়।

ভূতাত্ত্বিকগণের মতে, উত্তর মেরু সম্পূর্ণ বরফাচ্ছন্ন হয়েছে আনুমানিক পঞ্চাশ ষাট হাজার বৎসর পূর্বে। লোকমান্য তিলকের মতে, আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছে ৬০০০ খ্রীস্টপূর্বে, ঋগ্বেদ রচনা হয় ৪৫০০ খ্রীঃ পূঃ তে। আর্যরা ভারতে প্রবেশের পূর্বে সেই সুদীর্ঘকাল কোথায় আত্মগোপন করে ছিল?

লোকমান্য তিলকের এই গ্রন্থ যখন রচিত হয়, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা তখন শিশু অবস্থায় ছিল। পরবর্তী কালে যে সকল আবিষ্কার ঘটে তার ফলে, তাঁর মতবাদের যৌক্তিকতা একেবারে লোপ পেয়েছে।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আর্যদের আদি নিবাস নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, কত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কত নতুন নতুন স্থানের নাম প্রস্তাবিত হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশই এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, এশিয়া-ইয়োরোপের এতগুলো জাতির ভাষা যখন একই মূল থেকে উৎপন্ন, তখন তাদের আদিপুরুষগণ নিশ্চয়ই একত্র বসবাস করত—মূলে ছিল একটাই জাতি ও সেই জাতি আর্য।

এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে কোন এক আদিম বাসভূমিতে আর্য ভাষাভাষীগণের পূর্ব পুরুষগণ একত্রে বসবাস করত, এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন আচার্য ম্যাক্সম্যুলর মহাশয়। তিনি ১৮৯২ সালে, প্রাচ্যবিদ্গণের নবম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে এই সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। আর্যগণ কোন সময়কালের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন তারও একটা আনুমানিক হিসাব উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁর প্রণীত *Chips from a German Workshop* পুস্তকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর এই মতটাই ইয়োরোপের বহু পণ্ডিত সাধারণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতবাদের সারাংশ নিয়ে দেওয়া হলো :

"গ্রীক ও রোমান, কেল্ট ও জার্মান, স্লাভ, পারসীক ও ভারতীয়গণের পৃথক পৃথক ভাষায় কথা বলা ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হওয়া যতটা ঐতিহাসিক সত্য তেমনি আর একটি সত্য সমভাবে বাস্তব যে, এমন একটা সময় ছিল যখন উপরোক্ত ভাষাভাষী জাতি সমূহের পূর্বপুরুষগণ একত্রে একটা সুসংহত গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ছিল; একই ভাষায় কথা বলত এবং

সে ভাষা এতই বাস্তব ছিল যে, ঐ ভাষা ব্যতীত প্রকৃত গ্রীক, প্রকৃত ল্যাটিন ভাষা উৎপন্ন হতে পারত না ; গ্রীক প্রজাতন্ত্র, রোমান সাম্রাজ্য, প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা, বেদ, সংহিতা, অবেস্তা, প্লেটো, গ্রীক নিউ টেসটামেন্ট, কিছুই গড়ে উঠতে পারত না।"

পৃথিবীর কোন্ অংশে, কোন্ সময়কালে উপরোক্ত আদিম বাসস্থলের অস্তিত্ব ছিল, আদিম ভাষা গড়ে উঠেছিল, এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, সেই প্রাগৈতিহাসিক স্মরণাতীত কালের ঘটনার কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। সকল দিক বিবেচনা করে এটুকু বলতে পারা যায় যে, সেই আদিম বাসস্থল এশিয়া দেশেরই কোথাও ছিল, পূর্বাঞ্চলেই ছিল। এশিয়ার কোনখানে বললে, যতটা বিশাল ও অস্পষ্ট মনে হয়, কার্যতঃ কোন যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তি তা ভাববেন না ; কারণ, তাঁরা জানেন—উত্তরে সাইবেরিয়া, পূর্বে চীন ও দক্ষিণে ভারত, পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও আরব, এই দেশগুলোকে কখনো সম্ভাব্য আদিম বাসস্থল বলে কেউ ভাববেন না। আর্যদের আদিম নিবাস—পূর্বে, এ বিশ্বাস আমার শ্লথ হয়নি। অন্যান্য জনপদের সপক্ষে অনেক মতবাদ শুনেছি—স্কাণ্ডিনেভিয়া, রাশিয়া কিম্বা জার্মানী, কোনটিই ধোপে টেকে না। আর্য বলতে, এক প্রাচীন ভাষাভাষীকে বোঝায়। ভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য ভাষার কথা তুলতে গেলে, ভাষাভাষীর কথাও মনে জাগে। কিন্তু আমরা যখন 'আর্য' বলে পরিচয় দিই, তখন একটা বিশিষ্ট ভাষাভাষী ব্যতীত আর কিছুই ভাবি না। করোটি, চোখ, চুল, চর্ম—এই সকল কোন বৈশিষ্ট্যের বিচার করি না। যেমন—খ্রীস্টান, মুসলমান, ইংরেজ, আমেরিকান প্রভৃতি উল্লেখের বেলায় করি না।

সময় সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে আসা আরও দুরূহ। মোটামুটি একটা ধারণায় আসতে গেলে ধরে নিতে হয় আর্যভাষা সমূহের কয়েকটি, যথা—ভারতের সংস্কৃত, মিডিয়ার জেন্দ ২০০০ খ্রীস্টপূর্বের মধ্যেই আকার লাভ করেছিল এবং ছন্দাকারে ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তার কিছু পরে গ্রীকভাষা আকার লাভ করে। এই সকল রূপ পেল আদিম বাসস্থলে থাকতে থাকতেই, উচ্চারণ ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি থেকেই। ধীরে ধীরে আদিম আর্যভাষা টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙবার পূর্বে, আদিম আর্যভাষা একটা বিশেষ উন্নত ভাষায় পরিণত হয়েছিল। সেই উন্নত ভাষার নাম "প্রাক্-আর্য" (Proto-Aryan)। প্রাক্-আর্যভাষার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির পূর্বেই ঐ ভাষার ব্যাকরণ কাঠামো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে খুব কমই যুক্ত হয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব

দশ হাজার বৎসর সময়কাল, প্রাক্-আর্য ভাষার জন্মকাল বলে ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসর কালের মধ্যে ঐ ভাষা পূর্ণতা পেয়েছিল। ঐ প্রাক্-আর্যভাষা বিভিন্ন ভাষাতে পরিণত হতে কত শতাব্দী লেগেছিল বলা দুষ্কর। গ্রীক ও সংস্কৃত, গথিক ও ল্যাটিন—এত বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক হতে নিশ্চয়ই কয়েক হাজার বৎসর প্রয়োজন হয়েছিল। ইতালি থেকে ফরাসী ভাষার সামান্য পার্থক্য সৃষ্টি হতে যদি হাজার বৎসর প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর লেগেছিল উপরোক্ত তিনটি ভাষা সৃষ্টি হতে। প্রাক্-আর্যভাষা ক্রমে ক্রমে ছয়টি পৃথক ভাষায় পরিণত হয়—কেল্টিক, টিউটনিক, স্লাভনিক, গ্রীক, ল্যাটিন ও ইন্দো-ইরানীয়। ভাষার এই সকল নাম পরবর্তীকালে প্রদত্ত হয়েছিল।

"এক বিশিষ্ট মনুষ্য শাখা—পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষাভাষী বলে পরিচিত হয়েছিল—যাদের ভাষা প্রায় ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বে ভারতে প্রবেশ করে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ঘটে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তার পূর্বে বেদ-সংহিতা চতুষ্টয়, ব্রাহ্মণ সমূহ, আরণ্যক ও উপনিষদাদি রচিত হয়েছিল। ১২০০ খ্রীঃ পূঃ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্মকাল। ঋগ্বেদ রচনা, আর্যদের ভারতে প্রবেশের তিনশত বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল।"

আচার্য ম্যাক্সম্যুলর মহাশয়, সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব রূপ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে, তাঁর আনুমানিক সময়কালের পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন। আচার্য মহাশয়ের যুগে ধারণা জন্মানো হয়েছিল যে, শ্বেত চর্ম, নীল অক্ষি, স্বর্ণাভ কেশযুক্ত সুসভ্য আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে, বুনো অসভ্য অনার্যগণকে পরাজিত, নিহত ও বনে বিতাড়িত করে বসবাস স্থাপন করেছিল। বর্তমানে হিন্দুধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যা কিছু মহৎগুণ দেখতে পাওয়া যায়—সব কিছুই সেই বাহিরাগত আর্যদের দান। তখনো সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কৃত হয়নি।

"ভারত কখনো আর্যদের আদিনিবাস হতে পারে না", ম্যাক্সম্যুলর সাহেবের এই বদ্ধমূল ধারণা কোথা থেকে এল, কি কারণে হলো এ সম্পর্কে তিনি নীরব। যে-ঋগ্বেদ আলোচনা করে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সেই গ্রন্থ কিন্তু অন্য কথা বলে। বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে তাঁর মতবাদের মূল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যেমন ভাষাতত্ত্ব বিচারে—আর্যত্ব নিরূপণে অগ্রসর হয়েছিলেন, তেমনি নৃতত্ত্ববিদগণও মানুষের দৈহিক আকৃতি বিচারে—চোখ, মুখ, কান, করোটি, চোয়াল, দেহের রঙ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য বিচারেই এক

বিশিষ্ট জাতিগোষ্ঠী গঠিত—এই মতবাদ প্রচার করেন। নৃতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর মানুষকে কয়েকটি মাত্র জাতিগোষ্ঠীতে—যথা : নেগ্রিটো, মঙ্গোলীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, ব্রাকি সেফালিক, অস্ট্রেলয়েড, ককেশীয় বা নর্ডিক প্রভৃতি নামে বিভক্ত করেছিলেন। নর্ডিকগণই আর্য।

আর্যগণ একটা বিশিষ্ট জাতি বা race, এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক কাউন্ট অব গোবিনিয় (**Comte De Gobinean, 1816-1882**)। তিনি এই মতবাদও প্রচার করেছিলেন যে, একটা দেশের সভ্যতার ভাগ্য নির্ভর করে তার জাতিগত গঠনের উপর। আর্য-সভ্যতার ততদিনই বিকাশ, যতদিন সে তার জাতিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে, রক্তে মিশ্রণ ঘটাবে না; কালো বা হলুদ ছোপ পড়বে না। যদি কোন সভ্যতা তার জাতি-চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হারায়, তা হলে সে তার সজীবত্ব হারাবে, সৃজন শক্তি হারাবে, ভ্রষ্টাচার ও নৈতিক অবনতিতে ডুবে যাবে। তাঁর পুস্তক, *Essay on Unequality of Human Races*, 1853-55 এককালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জার্মান শিল্পী রিচার্ড ভাগনার ও তৎশিষ্য ইংলণ্ডের হাস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (**Houston Stewart Chamberlane**) এই মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। জার্মান ফুয়ার হিটলারও এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জার্মানদের খাঁটি আর্যত্বে বিশ্বাস করতেন। সেমেটিক ইহুদী জাতির ওপর তাঁর বিদ্বেষের কারণও ছিল এখানে।

এই মতবাদ, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নৃতত্ত্ববিদগণই বিশেষ করে খণ্ডন করেন।[১]

ভাষাতত্ত্ববিদগণের মতে, ইয়োরোপে প্রাচীনকালে আর্যগণের অভিযান হয়েছিল—যাদের সন্তান-সন্ততি হলো আর্যভাষাভাষী বর্তমান ইয়োরোপীয়গণ। কিন্তু জাতিতত্ত্ববিদগণের মতে, কেবলমাত্র ভাষা বাদে ইয়োরোপে প্রাচীন অধিবাসী-গণের মধ্যে আর্যগণের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। কেল্টগণ আর্যভাষা বলত বটে কিন্তু তারা তুরানিয়ান বা মঙ্গোলিয়ান পরিবারভুক্ত। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত-গণের মধ্যে এই সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। আর্যভাষা ওখানে কি করে পৌঁছল, যারা নিজেরা আর্য নয় তাদের মধ্যে?

১. **"Aryan (from Sanskrit Aryan—Noble) : During the 19th century there arose a notion, propagated most assidously by Comte De Gobinean and later by his disciple Houston Stewart Chamberlane of an Aryan race. This notion which had been repudiated by Anthropologists by the second quarter of the Twentieth Century."** ***Encyclopedia Britannica***, **1A, p. 566.**

ভাষার সাদৃশ্য থেকে, ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের জাতি-সাদৃশ্য নিরূপণকে নৃতত্ত্ব-বিদ্‌গণ সমর্থন করতে পারেননি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দেখা গেছে যে, ঐতিহাসিক যুগেই এক-একটা জাতি বা race, তাদের স্বকীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ না করেও নিজস্ব ভাষার পরিবর্তে অপর উন্নত ভাষা গ্রহণ করেছে। ফরাসী নৃতত্ত্ববিদগণ—বিশেষ করে ব্রোকা (Paul Broka, 1824-1880) প্রথম এই আপত্তিটি তুলেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, বিভিন্ন জাতি একটি ঐতিহাসিক সময়ের পরিসরে প্রায়শঃই তাদের ভাষার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, যদিও বাহ্যতঃ জাতি বা বর্ণের পরিবর্তন ঘটেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বেলজিয়ানরা নব্য ল্যাটিন ভাষায় কথা বলে। কিন্তু যত জাতি বেলজিয়ানগণের মধ্যে রক্ত মিশিয়েছে, তার মধ্যে রোমানদের (নব্য ল্যাটিনভাষী) সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা কম।

ব্রোকা এবং পিউচে (Puoche) উভয়েই মত প্রকাশ করেছেন যে, ইয়োরোপে আর্যভাষা সমূহ থাকতে পারে, আর্য জাতির কোন অস্তিত্ব নেই।

ডাঃ মর্টিলেট দেখিয়েছেন, ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের অধিকাংশই আফ্রিকা ও এশীয় জাতিসমূহের সংমিশ্রণে গঠিত। উত্তরের ডলিকো সেফালিক (লম্বা করোটিযুক্ত) জাতিসমূহের (টিউটন ও সুইড) দৈহিক গড়ন (করোটির আকৃতি, নাকের গড়ন, শরীরের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিচারে) আফ্রিকানদের মত। তারা আর্য বলে দাবী করতে পারে কেবলমাত্র ভাষার জন্যই—যে ভাষা তারা পেয়েছে প্রতিবেশী ব্রাকি সেফালিক (Brachey Cephalic)—লম্বা করোটিযুক্তদের কাছ থেকে।

নৃবিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন, আর্যভাষাভাষী গ্রীকগণ—ব্রাকি সেফালিক তুরানীয় জাতি ও উত্তর আফ্রিকার আইবিরিয়গণের সংমিশ্রিত জাতি। ইয়োরোপের প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে কেল্টরাও দেহের গঠনে, তুরানীয় (অধ্যাপক রথার্টন-এর মতে) বা মঙ্গোলীয় (অধ্যাপক প্রুনার বে-এর মতে)। ইয়োরোপের আর্যভাষাভাষী জাতিসমূহের অধিকাংশেরই দৈহিক গঠন, তুরানীয় বা মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

ব্রোকা-শিষ্য টপিনার্ড (Topinard) দেখিয়েছেন, ইয়োরোপের মানুষের নৃবিজ্ঞানসম্মত দৈহিক গঠনের ধাঁচ বা আদল সুপ্রাচীন কাল থেকেই অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক। আর্যগণ যদি এশিয়া থেকে এসে থাকেন, তাঁরা তাঁদের ভাষা, তাঁদের সভ্যতা ও ধাতুসম্পর্কিত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই দেননি। তাঁদের রক্তের মিশ্রণ হয়নি। তাঁদের রক্ত লোপ পেয়েছে।

ভাষাভিত্তিক মৌলিক জাতিতত্ত্ব নিয়ে আলোড়ন আজও চলছে। অবশ্য

আর্যভাষা শব্দটি আর ব্যবহৃত হয় না। তৎপরিবর্তে ভারত-ইয়োরোপীয় (Indo-European) ভাষা বলে বর্ণিত হচ্ছে।[১]

বর্তমান যুগের নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে—মানুষের দৈহিক ও আকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ মানবজাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপরই অধিকতরভাবে নির্ভর করে। জাতি নির্ধারণে তাই করোটি বা নাসিকার বৈশিষ্ট্য বিশেষ কার্যকর নয়।[২]

ইয়োরোপীয় গবেষকগণের মতে, আদিম আর্যনিবাস থেকে স্মরণাতীত কালে আর্যগণ যখন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল তখন তারা তাদের ভাষা সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল। সে ভাষা নিশ্চয়ই অনেকটা পূর্ণতা পেয়েছিল—কি শব্দ-সম্পদে, কি ক্রিয়াপদের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে। ঐ ভাষা থেকেই ভারতে বৈদিক ছান্দসী ও সংস্কৃত ভাষা, গ্রীসে গ্রীক ভাষা, ইটালিতে ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা উৎপন্ন হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। ভারতে বৈদিক ভাষার সূত্রপাত হয়েছিল, এক শ্রেণীর বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মতে—খ্রীস্টপূর্ব চার সহস্র বৎসর পূর্বে, আর গ্রীক ভাষা (ইয়োরোপের প্রাচীনতম ভাষা) খ্রীস্টজন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বেকারও নয়। ইতালির ল্যাটিন ভাষা খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের, কেল্টিক ভাষা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতক আর টিউটোনিক (জার্মান), স্লাভ প্রভৃতি ভাষা খ্রীস্টোত্তর যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল। (সপ্তসিন্ধু ও বহির্বিশ্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। একমাত্র প্রাচীন পারসী বা জেন্দ ভাষা খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর বা তারও পূর্বেকার বলে দাবী করতে পারে।

আর্যগণ, তথাকথিত আদি আর্যবাসভূমি থেকে সকলেই কি একই সময়কালের মধ্যে, কিছু অগ্রপশ্চাতে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল? যদি কিছু সংখ্যকও তাদের আদিম নিবাস আঁকড়ে পড়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই তারা তাদের আদিম ভাষার বিশুদ্ধতা বজায় রেখে কালক্রমে আরও উন্নত হয়েছিল—যার সঙ্গে বৈদিক ভাষার সাদৃশ্য আরও অধিকতরভাবে দৃষ্ট হবে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে

১. 'Aryan' a Sanskrit word meaning Noble was once commonly used to refer to the entire family of languages now known as "Indo-European". It was also used more restrictively as the name of the Indo-European subdivision of that family. "Even in the purely linguistic meaning common in the 19th century, it has been abandoned". —*Encyclopedia Britannica.*

২. Prof. Ridgeway : "Physical type depends far more on environment than on Race."

Prof. Hamersham Cox : "Neither cephalic nor nasal index is of much use in determining Race".

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চালিয়েও মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া বা দক্ষিণ রাশিয়ায় কোথাও কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সপ্তসিন্ধুর আর্যগণ ব্যতীত আর যে সকল আর্যগোষ্ঠী প্রায় একই সময়ে বেরিয়ে এসেছিল, তারা হাজার হাজার বৎসর ধরে কোথায় আত্মগোপন করে যাযাবর জীবন যাপন করেছিল? তাদের পরিচয় কোথায়? তারাই কি এশিয়া মহাদেশে প্রাচীন মিতান্নি, কাসাইট, হিত্তি, ফিনিসীয়-ক্রিজীয় প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী? সেই ধারণাও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে নির্মূল হয়ে গেছে।

আর্যগণের আদিম নিবাস তত্ত্বে বিশ্বাসী ইয়োরোপীয় গবেষকগণ অধিকাংশই ধরে নিয়েছিলেন যে, আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে সম্ভবত পনেরো শত থেকে বারশত খ্রীস্টপূর্ব কালে। সম্ভবত, এ তথ্য আর্যগণের ইয়োরোপ অভিমুখে অভিযাত্রার সময়কাল-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই ধারণার মূলে কোন যুক্তি নেই। অবশ্য প্রায় সকল ইয়োরোপীয় পাণ্ডিতই যে এই বিষয়ে একমত তা নয়। ইয়োরোপীয় গবেষকগণ প্রথমে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে, আর্যজাতিগোষ্ঠীর প্রথম অভিযান পশ্চিম থেকে পূর্বদিকেই হয়েছিল। (এই পুস্তক-লেখকের বাল্যকালে ধারণা ছিল—এশিয়া মাইনরই আর্যদের আদিনিবাস ছিল, তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাসে ওরূপই লিখিত হয়েছিল।) পরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালে সকল জাতিগোষ্ঠী পূর্ব থেকেই পশ্চিমে অভিযান করেছিল। কাসাইট, মিতান্নি, হিত্তি, ফিনিসীয়, ক্রিজীয় প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী পূর্ব থেকে পশ্চিমেই গিয়েছিল। আসিরিয়-র প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায় যে, সিথিয়গণই প্রথম মানবগোষ্ঠী, যারা পশ্চিম থেকে পূর্বে ৮০০ খ্রীস্টপূর্বে অভিযান করেছিল। ঐ গোষ্ঠী ভারত আক্রমণ করেছিল আনুমানিক ছয়শত খ্রীস্টপূর্বাব্দে।

মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া অথবা ইয়োরোপে কোন না কোন অঞ্চলে আর্যদের আদিম নিবাস ছিল, এরূপ দাবীর পশ্চাতে যে যুক্তি দেখান হতো বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে তা অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। মিসরের নীলনদের উপত্যকায় ও মেসোপটেমিয়ার ফুরাৎ ও দিজলহ (ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস) নদীর অন্তর্বেদীতে পুরাকালে যে মানবসভ্যতার পত্তন হয়েছিল, পূর্বে ধারণা ছিল যে, ঐ দুই সভ্যতাই প্রাচীনতম। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায়, রাজপুতানায়, গুজরাটে ও গঙ্গাতীরে প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে এ ধারণাতেও গুরুতর সন্দেহ জাগ্রত হয়েছে। হারাপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর, পণ্ডিতগণ প্রথমে মনে করেছিলেন, ঐ সভ্যতা নিশ্চয়ই আর্যগণের ভারতে অনুপ্রবেশের পূর্ববর্তী ঘটনা; আর্যগণ ভারত প্রবেশ কালে সেই সভ্যতার ধ্বংস-সাধন করে। কিন্তু পরবর্তী

খননের ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ, পূর্ববর্তী ধারণায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ, তাঁরা দেখেছেন: হারাপ্পা সভ্যতার যেখান থেকে শুরু মনে হয়েছিল, তারও পূর্বের আর একটি সভ্যতার নিদর্শন এটি। হারাপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কথা যে-সময় থেকে বলা হয়েছিল, তার পরেও সেই সভ্যতার নিদর্শন নানা স্থলে পাওয়া গেছে। হারাপ্পারও পূর্বের সভ্যতা, হারাপ্পা সভ্যতা এবং হারাপ্পা-পরবর্তী সভ্যতা এই তিনের মধ্যে একটা পূর্বাপর যোগসূত্র রয়েছে; পারম্পর্য এবং ধারা-বাহিকতাও রয়েছে। একটিকে ধ্বংস করে আর একটি গড়ে ওঠেনি। হারাপ্পা সভ্যতার প্রাপ্ত লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার একাল পর্যন্ত সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এই লিপি যে যে আর্য লিপি নয়—এরূপ প্রমাণও কিছু পাওয়া যায়নি। বৈদিক সভ্যতা ও হারাপ্পা-সংস্কৃতি অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আমি একটু বিশদ আলোচনা করেছি।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে, এশিয়া মাইনরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যে সকল নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়, তার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ঐ অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার ওপর ভারতীয় আর্য-সভ্যতার প্রভাব প্রমাণিত হয়। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব পনের শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে বৈদিক দেবগণ পূজিত হতেন—এই আবিষ্কার যুগান্তকারী। ১৯০৭ সালে এশিয়া মাইনরের ক্যাপাডোসিয়া অঞ্চলে খনন করে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হুগো উইঙ্কলার (Hugo Wincklar) ধ্বংসপ্রাপ্ত সুপ্রাচীন বোঘাসকই শহরে একটি মৃত্তিকা-ফলক আবিষ্কার করেন।[১]

এই ফলকে মিতান্নি রাজ কর্তৃক কৃত সন্ধির শর্তগুলির উল্লেখ আছে। শর্তের প্রথমে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য—(ইন্দর অর্থাৎ ইন্দ্র; উরু বনশিল অর্থাৎ বরুণ, মিত্রশ্ শীল অর্থাৎ মিত্র; নাসতিয়ন অর্থাৎ নাসত্যানাম্প) দেবগণের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। পরে ঐ অঞ্চলে প্রচুর মৃত্তিকা ফলক লেখ (বাণমুখ অক্ষরে—Cuniform কাদার টালির উপর) আবিষ্কৃত হয়েছে। হিত্তি রাজ সুপিলুল্যুমস্ ও মিতান্নি রাজা মতিবাজ—এই দুজনের পুত্রকন্যার বিবাহের কথাও উপরোক্ত সন্ধিপত্রে উল্লিখিত রয়েছে। সেখানেও দেবতা নাসত্যদ্বয়কে অভিভাবক ও কন্যার রক্ষক দেবতা রূপে আহ্বান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ঋগ্বেদে বর্ণিত নাসত্য বা অশ্বিনীদ্বয়, বিবাহের পর প্রথমবার বরের গৃহে যাবার সময় ছিলেন কন্যার রক্ষক দেবতা। পূর্বোক্ত চার দেবতা—যাদের উল্লেখ ঋগ্বেদে অসংখ্যবার আছে, সম্পূর্ণরূপেই ভারতের দেবতা। মিত্র

১. *Journal of the Royal Asiatic Society*, No. 25, 1909, pp. 723-727.

ও বরুণ, পারসীকগণেরও দেবতা ছিলেন বটে, কিন্তু ইন্দ্র তাদের কাছে অশুভ শক্তির প্রতীক ; নাসত্যের নাম তাঁরা জানতেন বটে কিন্তু রাক্ষসরূপে। পারস্য, কখনো এই দুজনকে দেবতারূপে স্বীকার করেনি। পারস্যে সেই প্রাচীন কালে স' কে 'হ' বলে সর্বদাই উচ্চারণ করা হতো। কিন্তু মিতান্নিদের ভাষায় 'স' কে 'হ' বলে কথনো লিখিত হয়নি। বোঘাসকইতে উল্লিখিত সন্ধিপত্রে যেখানে যেখানে বরুণ রাজার উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে বরুণ শব্দ বহুবচনে লিখিত হয়েছে। এতে মনে করিয়ে দেয়, ঋগ্বেদে প্রায়শঃ মিত্র-বরুণ একত্রে উল্লিখিত হয়েছে দ্বন্দ্ব-সমাস যুক্ত হয়ে। এই সকল দিক বিবেচনা করলে উপরোক্ত চার দেবতা যে ভারতীয় আর্যগণেরই দেবতা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর্যগণ যদি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে অনুপ্রবেশ করে থাকেন, তা হলে ভারতীয় আর্য দেবতা ওখানে পঞ্চদশ শতাব্দীতে উপস্থিত থাকেন কিরূপে! যাঁদের এই দেবতা চতুষ্টয়—সেই মিতান্নি ও হিত্তি, তাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় খ্রীঃ পূঃ বিংশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপস্থিত হন কি প্রকারে? এই প্রসঙ্গে আর্য বলে কথিত আর একটি মানব-গোষ্ঠীর নামও উল্লেখ্য।

কাসাইটগণ

খ্রীস্টপূর্ব ১৭৬০ সালের অগ্রপশ্চাতে কাসা বা কাসাইট নামে পরিচিত এক মানবগোষ্ঠী পূর্বদিক থেকে এসে ব্যাবিলোনিয়া জয় করে। এই গোষ্ঠী উত্তর মেসোপটেমিয়াতে প্রায় ছয়শত বৎসর, অর্থাৎ ১১৭১ খ্রীস্টপূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে এরা ভারত-ইরানীয় (অর্থাৎ আর্য) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের প্রধান দেবতা ছিলেন সুরীয়স্, অর্থাৎ সূর্য (সংস্কৃত উচ্চারণে), মরুতস (মরুৎ) ও বুরিয়া (বরুণ)। এ তিনজনই ঋগ্বেদীয় দেবতা। এই গোষ্ঠী ঘোড়ায় টানা রথ ব্যবহার করত। এরাই সর্বপ্রথমে, মেসোপটেমিয়ায় অশ্ব বা ঘোড়ার আমদানি ও প্রবর্তন করে। কথিত আছে, আর্য সেনাবলের সহায়তায় এই গোষ্ঠী সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কাসাইটগণ সিরিয়াতে (তৎকালীন মিসর-এর অন্তর্গত) প্রবেশ করে এবং মিসর সম্রাটগণের অধীনে সামন্ত রাজ্য গঠন করেছিল। সিরিয়ার সিনাই এলাকা খনন করে যে সকল প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে তার মধ্যে আছে - ব্যাবিলোনীয় ভাষায় মৃৎ ফলকে উৎকীর্ণ মিসর সম্রাটের নিকট লিখিত (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-১৪০০) সিরিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের কাসাইট সামন্ত রাজগণের পত্রাবলী। এই রাজগণের নাম অর্তমন্যু, অর্থবয়ত, যশদত্ত, সুতর্ন বা সুত্তর্ন, হাজির সামন্ত, শুবর্দেও

বা সুবর্দত্ত, সুবন্ধু, মুসিহমার প্রভৃতি ভারতীয় নাম। ঋগ্বেদে কেশী বা কেশীনগণের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এই আর্যগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়—যাদের রাজা যজ্ঞকার্য পরিচালনার অবসরে নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখার ফলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য গুরুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর ভাণ্ডারকর-এর মতে, এই কাসাইটগণ কেশীনগণের বংশধর হতে পারেন। মেসোপটেমিয়াতে প্রচলিত আখ্যান অনুসারে, কাসাইটগণ ইরানীয় মালভূমিতেই আফগানিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত বসবাস করতেন। ইরানের মালভূমিতে এদের কোন নগর গড়ে ওঠেনি, এদের কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। বৈদিককালে আফগানিস্তানের অধিকাংশই ছিল সপ্তসিন্ধুর অন্তর্গত।

ইতিপূর্বে যে মিতান্নিগণের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জাতিগোষ্ঠী, খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ থেকে ১৪০০ পর্যন্ত উত্তর মেসোপটেমিয়ার হুরগণের ওপর রাজত্ব করত। মিতান্নিগণের রাজ্য ছিল ব্যাবিলোনীয়ার উত্তর-পশ্চিমে, আসিরিয়ার পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যে। মিতান্নিগণের পূর্বনাম মার্যান্নি। (বৈদিক মার্য থেকে? ঋগ্বেদে অশ্বের অপর নাম মার্য—ঋ ৭. ৪৬. ১৬; ৯. ৯৭. ১৮; ১. ৯১. ১৩ প্রভৃতি)। মার্যান্নির অর্থ—অশ্বারোহী যোদ্ধা। রাজা প্ররত্ত-র সময়কালে এদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। এদের ভাষা—প্রাচীন ভারতীয়; এদের দেবতা—ভারতীয়।

মিতান্নি

বোঘাসকইতে প্রাপ্ত, মিতান্নি লেখক কিক্কুলির হিত্তি ভাষায় রচিত অশ্ববিদ্যা বিষয়ক পুথিতে, অইকবর্তন (সংস্কৃত একবর্তন; সংস্কৃত এক-এর প্রাচীন রূপ অইক), তেরা, পঞ্চা, সত্ত প্রভৃতি ভারতীয় সংখ্যাও দেখতে পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো মিতান্নির রাজসভার ভাষা থেকে হিত্তি (হিটাইট) ভাষায় গৃহীত। কিক্কুলির পুথির লেখা (বোঘাসকইতে প্রাপ্ত) এবং ঋগ্বেদীয় ভাষা, পারস্যের অবেস্তা অপেক্ষা পরস্পরের সঙ্গে অধিকতর নিকটবর্তী।[১] মিতান্নির রাজাদের নাম ভারতীয়, যথা: প্ররত্ত, শুবন্ধু (সুবন্ধু), তুশরত্ত (দুরথ), দশরত্ত, অর্তশ্শুমর (ঋতস্মর), অর্তমনিয় (ঋতমন্য), অর্ততম (ঋতধাম), মত্তিবজ বা মত্তিউজ প্রভৃতি। কতিপয় মিতান্নীয় রাজগণের সাথে মিসরীয় রাজগণের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। মিতান্নিগণ তাদের মৃতদেহ দাহ করত, তাদের কৃষ্ণবর্ণের কৌলালে (মৃত্তিকা নির্মিত তৈজসপত্রাদিতে) সাদা রঙ লাগাত। শ্বেতবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণ-লোহিত কৌলাল ভারতে খ্রীঃ পূঃ ১৭০০

১. *Archaeology of Soviet Central Asia and The Indian Borderlands* by S. P. Gupta, Vol. II, p. 246.

থেকে ৫০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

জ্যাকবি, জেনসন, স্টারটেবন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে মিতান্নিগণ সরসরি ভারতীয়।[১]

খ্রীঃ পূঃ ১৫নের শতাব্দীতে, মিতান্নি রাজ্য টইগ্রিস-এর পরপার থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্য মিসরীয় ফারোয়াদের কর্তৃত্বে বিপদ ডেকে আনতে পারত। নূতন সাম্রাজ্যের অধিকারী হিত্তিদের সঙ্গে সমান বলে লড়াই করতে পারত। মিতান্নিগণ তাদের ভ্রাতা কাসাইটগণের ও হারাপ্পা সভ্যতার ধ্বংসকারী আর্যগণের মত অর্ধবর্বর জাতি ছিল—যেসব রাজ্য তারা জয় করেছিল তাদের থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও তাদের মান ছিল অনেক নীচে। তারা অবশ্য আর্য দেবতাদের পূজার প্রবর্তন করেছিল। এশিয়া মাইনরে তারা প্রথম "অশ্ব আমদানী করে এবং তার প্রজননকেও করে লোকপ্রিয়।"[২]

হিত্তি নামক আর একটি ভারত-ইরানীয় (ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ভাষায়) ভাষাভাষী গোষ্ঠী, মিতান্নির উত্তর-পশ্চিমে ও ফিনিসিয়ার উত্তরে খ্রীঃ পূঃ ১৯৫০-এর কাছাকাছি সময় এশিয়া মাইনর-এ অনুপ্রবেশ করে। ১৯০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে এ জাতি ক্যাপ্পাকোশিয়া রাজ্য জয় করে। হিত্তিগণ ঐ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল না, তারা বহিরাগত—এর প্রমাণ আছে। পশ্চিম দিক থেকে এ জাতি আসেনি, কারণ পশ্চিম এশিয়া মাইনর-এ এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এদের রাজা অনিত্য অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। রাজা লবর্ণ এই সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। অপর রাজা প্রথম মুর্সিলিস ১৪৮৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলোন দখল ও ভস্মীভূত করেন। কাসাইটগণ পরাজিত হয়ে দক্ষিণে চলে যায়। হিত্তিগণ বহু দেবদেবীর পূজক ছিলেন। দেব-দেবীগণের আয়ুধ, মুদ্রা, পক্ষ ও বাহন ছিল। পৌরুষ-এর রাজা ইন্দর (ইন্দ্র), আবহ দেবতা বরুণ, বাহন বৃষযুগল, প্রাণ দেবতা সূর্য, অগনিশ (অগ্নি), আন্ট্রিস ও মা (বৈদিক অত্রি ও মিত্র), রুন্তাস (রুদ্র), বাহন হরিণ (ঋগ্বেদে রুদ্রপুত্রগণের বাহন পৃষতি বা হরিণ) প্রভৃতি। দেবদেবীগণের প্রতীক হিসাবেও বৃষ পূজিত হতো। প্রাচীন সিরিয়াতে, হিত্তিদের যেসকল মুদ্রা পাওয়া গেছে তার একটিতে আছে সিংহপৃষ্ঠে দেবী, অপর একটিতে আছে ষাঁড়ের পৃষ্ঠে দেবতা যেন হরগৌরী। যশিলিকয়া ও মালত্যাতে হিত্তি

হিত্তি

১. *Modi Memorial*, 1930, p. 81.
২. *History of Mankind*, Vol. I ; ***Pre-Historoy & Beginings of Mankind***, Sir Leonard Woolley, p. 389.

দেবদেবীগণকে প্রায়ই দেখা যায় ভারতীয় ধরনের পশুবাহিত রূপে। এটি হতে পারে যে, এই ধরনটি আর্য ধর্মের নিকট হতে গৃহীত হয়েছে।[১] যশিলিকয়া পর্বতের ওপর হিত্তিদের যে দেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর নাম ছিল সিবেল বা মা—সিংহের ওপর তিনি দণ্ডায়মানা।

সিরিয়ার ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে মিসর দেশের ফারোয়া—তৃতীয় তেহুতিমস ও সেত্তির সঙ্গে হিত্তিরাজ-এর প্রবল সংগ্রাম ঘটেছিল। পরে ফারোয়া দ্বিতীয় রামাসেস-এর সঙ্গেও যুদ্ধ বেধেছিল। সেই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয়-পরাজয় সুনিশ্চিত হয়নি। পরিশেষে, দ্বিতীয় রামাসেস-এর সঙ্গে খত্তি (ক্ষত্রী) রাজা খাটুশিল (সংস্কৃতে ক্ষত্রশ্রী) বা খাতাসারের (সংস্কৃত—ক্ষত্রেশ্বর) সন্ধি হয়। এই সন্ধির চুক্তিপত্র কর্নাক মন্দিরে খোদিত আকারে পাওয়া গেছে। সেই সন্ধিপত্রে খেতাদের (ক্ষত্রিয়দের) শ্রেষ্ঠ দেবতা সুতেখের নাম স্বর্গ-মর্ত্যের দেবতা বলে উল্লেখ আছে। সুতেখ খুব সম্ভবতঃ শতক্রতু (ইন্দ্র)। মিসরীয়গণ হিত্তিদের খতাস ও আসিরীয়গণ খটিস (ক্ষত্রী) বলত। হিত্তিরা পশ্চিম এশিয়ায় বিখ্যাত যোদ্ধা-জাতি ছিল। তারা বহু দেশ জয় করেছিল। হিত্তিরা জুতো পরত। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে হিত্তি ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। যথা: সংস্কৃত জানু, ওদের জেনু; কর=কেশার; পদ=পেদান; সে ঘুমায়=সপ্তারি (সংস্কৃত—স্বপীতি); হৃদয়=কার্দি (গ্রীকদের কার্দিয়া); পদি=পদতলে; পতা প্রভৃতি। হিত্তিদের বিশেষ্য পদের ছয়টি কারক (সপ্তম কারক—অধিকরণ নেই)। এই ভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি বিচার করে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ একে ভারত-ইরানীয় ভাষার পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

হিত্তি বা হিট্টাইট ভাষা, পূর্বদিকের ইন্দো-ইরানীয় ভাষা ও পশ্চিমের গ্রীক ভাষার সাথে ভাষাভিত্তিক তুলনায় খুব নিকটবর্তী। হিট্টাইট বা হিত্তি ভাষার নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার পর মূল আদিম আর্য ভাষার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে নূতন প্রশ্ন দেখা দিল। হিত্তি ভাষার প্রাচীনত্ব (ইয়োরোপীয় তথাকথিত আর্য ভাষাগুলো অপেক্ষা প্রাচীন) ও অন্যান্য ভাষা থেকে তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেছেন যে, হিত্তি ভাষা আদিম নিবাসের মূল ভাষা থেকে, গ্রীক-ল্যাটিন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোর তুলনায়, বহু পূর্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হিত্তি

১. *Ancient History of the Near East*, H. R. Hall, p. 331.

ভাষাকে, গ্রীক-ল্যাটিন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় আর্য ভাষার ভগিনী সম্পর্কিত ভাষা রূপে গণ্য করা যায় না। তার ফলে, মূল আদিম ভাষাকে 'ইন্দো-হিট্টাইট' নামে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে মূল ভাষাকে বলা হয় ইন্দো-হিট্টাইট বা আদি ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা।[১]

হিত্তিদের ভাষার মধ্যে বাইরের অনেক প্রভাব পড়েছে—মিশ্রণ ঘটেছে। এর মধ্যে আক্কাদীয় ও সুমেরীয় ভাষা থেকেও প্রচুর শব্দ চয়ন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এই ভাষা তার স্বকীয়তা একেবারে হারায়নি। হিত্তিভাষা ছিল হিট্টাইট সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা। হিত্তি প্রত্নলেখগুলো, খ্রীঃ পূঃ ঊনবিংশ থেকে খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী কালের মধ্যে রচিত। তারপর ক্রমান্বয়ে এই ভাষা লোপ পায়।

হিত্তিদের মধ্যে ঋগ্বেদে উল্লিখিত পাশাখেলা, শিশ্ন দেবতা, স্বর্ণমুদ্রা মিনাস (বৈদিক মানা) প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। হিত্তিদের মৃতদেহ অগ্নিদাহ হতো, অবশ্য মৃত্তিকা সমাধিও ছিল (ঋগ্বেদে দুটিরই উল্লেখ আছে)। হিত্তিগণ উত্তর সিরিয়ায় প্রথম অশ্বের প্রচলন করেন। হিত্তিগণের সাম্রাজ্য পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে, এশিয়া মাইনর-এর অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত ছিল—দক্ষিণে মিসরের সাম্রাজ্যসীমা অবধি। ১৪০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ থেকেই হিত্তি রাজ্য মেসোপটেমিয়া থেকে ভূমধ্য সাগর অবধি বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণ করত। খ্রীঃ পূঃ ১২৮৯-এ হিত্তিগণ মিসর সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, এর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। ১২২৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে হিত্তিরাজ অন্তরীশ সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন অন্তরীশ, (গ্রীক অনক্রস) ট্রয় নগর ধ্বংসকারী আগামেম্নন-এর পিতা ছিলেন। মিসরের বিবরণীতে আছে—ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলোর জনগণ হয় মিসরীয়দের, নয়তো হিত্তিদের ভাড়াটে সৈনিক হতো। ১২০০ খ্রীঃ পূঃ তে ফ্রিজীয়গণ হিত্তিরাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংস করে।

যে তিনটি মানবগোষ্ঠীর উল্লেখ এখানে করা হলো, হয়তো তাদের প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সপ্তসিন্ধু থেকেই। বৈদিক কালে, গান্ধার (বর্তমান পেশোয়ার থেকে কান্দাহার), বাহ্লিক (বর্তমান বলখাস), পাক্ত (পাখতুন), ভলানস (কাবুল) বিশানিন ও মহাবৃষদের বাসভূমি—এ সবই বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত, সপ্তসিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত ও তার প্রভাবাধীন

১. 'ভাষা-বিজ্ঞান পরিচয়', সদ্‌কুমার বিশ্বাস, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়।
'ভাষার ইতিবৃত্ত', ডঃ সুকুমার সেন।

ছিল। এটা হতে পারে যে, পূর্বোক্ত এই তিন গোষ্ঠী এই সকল অঞ্চল থেকেই গিয়েছিল কিন্তু তারা যে ধর্ম-সভ্যতা ও সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভারতীয়। ঋগ্বেদোক্ত দেবতাগণই ওদের দেবতা। আর্যগণের যে প্রাচীনতম পরিচয় আমরা ঋগ্বেদে পাই, তাতে আর্যগণের প্রাচীন নিবাস সপ্তসিন্ধুর বাইরে ছিল এমন ধারণা হয় না। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের অধিকাংশই, এই তিন গোষ্ঠীকে আর্য জাতীয় বলে স্বীকার করলেও ভারতের সঙ্গে এদের সংস্রব স্বীকার করেন না। আর্যগণ বাইরের থেকে এসেই যে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে, এই বিশ্বাস তাঁরা কিছুতেই বর্জন করতে প্রস্তুত নন। এদের মতে, সম্ভবতঃ ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবগণ আর্যদের আদি নিবাসেও দেবতা ছিলেন। এই পণ্ডিতগণের মতে, আর্যদের যে প্রাচীনতম শাখা, ভারত-ইরানীয় আদিম বাসস্থল—পামীর, রুশ-তুর্কিস্থান, কিরঘিজ তৃণভূমি বা কাস্পিয়ান সাগরতীর থেকে নির্গমন করেছিল (এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে), এই তিন মানবগোষ্ঠী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অনেক পণ্ডিত পূর্বে প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন, ঋগ্বেদ ভারতের বাইরেই রচিত। অবশ্য এমন পণ্ডিতও আছেন—যথা, উইলহেলম ব্রানডেনস্টেন, যিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, "এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ভারতীয়গণ (সম্ভবতঃ ভারতীয় আর্যগণ) দূর এশিয়ায় বাস করত।"

কাসাইট, মিতান্নি ও হিত্তি

কাসাইট, মিতান্নি ও হিত্তিদের সঙ্গে স্মরণাতীত কালের ভারতের যোগসূত্র প্রমাণিত হলে ভারতীয় আর্যগণের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাচীনতা অনুমান করা সম্ভবপর হয়। আর্যদের আদি নিবাস সম্পর্কিত কল্পনারও কিছুটা নিরসন হতে পারে। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নতুন নতুন আবিষ্কার সত্ত্বেও ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ তাদের পূর্ববর্তী মতবাদে অবিচল থেকে এটাই দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, এই তিনজাতি, ইরান ও ভারতীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষগণ, আদিম আর্য বাসভূমিতে অপরাপর আর্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করত ও সেখান থেকে দলবদ্ধভাবে কিছু অগ্র-পশ্চাতে বহির্গত হয়ে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ইরান ও ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে বর্তমান যুগের অধিকাংশ বিদেশী পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণের মতবাদ আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইউনেস্কো শাখার সৌজন্যে ও অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত "মানব জাতির ইতিহাস" (*History of Mankind*) নামক বিশাল পুস্তকের প্রথম খণ্ডের (১৯৬৯ সালে প্রকাশিত) অন্যতম লেখক-

ও প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার লিওনার্ড উলে মহাশয়ের মন্তব্যের মাধ্যমে জানতে পারি। উলে মহাশয়ের লেখার প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ নীচে প্রদত্ত হলো :

"খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে, ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর উপ-জাতীয়রা সম্ভবতঃ দক্ষিণ রুশীয় অঞ্চল থেকে বহির্গত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে অভিযান করে; একটি দল—কাসাইট, আকাদে প্রবেশ করে; একটি দল উত্তর পারস্যে ও একটি দল বেলুচিস্তান পার হয়ে ভারতে এবং অপর একটি দল (মিতান্নি) মধ্য হুরি অঞ্চলে প্রবেশ করে।"

"আর্য অভিযাত্রীগণের একটি তরঙ্গ, বেলুচিস্তানের পর্বতময় বাধা ভেঙে ফেলে ভারতে প্রবেশ করে। সেখানে তারা দেখতে পায়, তখনো (মোটামুটি ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ ধরে নেওয়া চলে) বর্তমান ছিল সিন্ধু উপত্যকার বড় বড় নগর সমূহ—যাদের বণিকগণ তখনো মেসোপটেমিয়ার সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছে। সেগুলোকে তারা পর্যুদস্ত করল। ঋগ্বেদ হলো প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের মহাকাব্য।" [*History of Mankind*, **Vol. I, p. 389**]

উপরোক্ত পুস্তকেরই ৪০৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "কিছু ভারততত্ত্ববিদ মত প্রকাশ করেন যে…যখন বোঘাসকইতে প্রাপ্ত মিতান্নি লেখ-এ ভারতীয় দেবতাদের এক মণ্ডলীকে তাদের বিশিষ্ট নামসহ পাওয়া গেছে, যা কেবল মাত্র বেদেই খুঁজে পাওয়া যায়, তখন এ যুক্তি দেখান চলে—(ক) তারা ভারতীয় বৈদিক দেবতা এবং (খ) মিতান্নি নেতাগণ ভারত থেকে আগন্তুক বসবাসকারী, যা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের বহু-পূর্বেই স্থিতি লাভ করেছে। পূর্ব আফগানিস্তানে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে, ঋগ্বেদীয় আর্যগণ প্রায় ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ থেকেই বসবাস করে আসছে। এই অতি বড় প্রমাণ সাপেক্ষে বলা চলে যে, হয় তাদের সভ্যতা বহুকাল ধরে হারাপ্পা সভ্যতার মত সমসাময়িক অথবা ঐ আর্যগণই হারাপ্পা সভ্যতাকে ধ্বংস করার পরিবর্তে কার্যতঃ গড়ে তুলেছে।"

গ্রন্থের এই খণ্ডে এ মতই গ্রহণ করা হয়েছে যে, "ঋগ্বেদীয় স্তুতিসমূহে আদি কথা (বিষয়বস্তু) ১২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যেই স্থান পেয়েছে। সম্ভবতঃ এরই মধ্যে আর্য অভিযান হয়েছিল ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। বৈদিক যুগ ঐ সময় থেকেই শুরু হয়েছে বলা চলে। বেদ রচনা হয় পরে। ঋগ্বেদীয় স্তুতিসমূহের প্রাথমিক স্তরে সাহিত্যের যে নমুনা পাওয়া যায়, তাতে কোন উন্নত বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় মেলে না। হারাপ্পা সভ্যতা অনার্যদের ছিল এবং আর্যগণ কর্তৃক

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বস্তুতঃ এই সভ্যতা ধ্বংসের আর কোন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা চলে না। আর্যগণ পৌর সভ্যতাহীন অর্ধবর্বর মানুষ।"

উক্ত গ্রন্থেরই ৪০৫-৬ পৃষ্ঠায় উলে মহাশয় কর্তৃক লিখিত টীকাতে বলা হয়েছে: "আদিকালের ঋগ্বেদীয় স্তুতিসমূহ প্রমাণ করে যে, যে-সময়কাল মধ্যে তারা সমুন্নত হয়েছিল তা নিশ্চয় অনেক অনেক শতাব্দী ব্যাপ্ত। প্রাচীনতম বৌদ্ধ সাহিত্য (যা বেদ রচনার পরবর্তী) পশ্চাতে রেখে, যে বিপুল সময় পার হতে হয়েছিল আদি স্তুতিসমূহের শ্রুতি ঐতিহ্য থেকে বেদবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থায় উন্নীত হতে এবং সংহিতাকারে সংকলিত হতে, কিম্বা ঋক সমূহ সংহতি হতে, তা নিঃসন্দেহে ১২০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের পূর্ববর্তী কালের বলে চিহ্নিত করা যায়।"

জাতিসঙ্ঘের নামের সঙ্গে জড়িত বলে গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই; সুতরাং তা উপেক্ষণীয় নয়। উলে মহাশয় তাঁর মন্তব্য প্রকাশের পশ্চাতে কোন যুক্তি প্রদর্শন করেননি, অর্থাৎ সবই তাঁর মতে স্বতঃসিদ্ধ; তাঁর ধারণায় ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট যে সত্যতা উপলব্ধির জন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী গবেষকদের মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। ভারততত্ত্ববিদগণ যে সকল যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তিনি তা যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করবার প্রয়োজন মনে করেন নি। অবশ্য একটি তথ্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আর্যগণের ঋগ্বেদ সম্পূর্ণভাবে ভারতেই রচিত হয়েছে এবং এর রচনাকাল বহু শতাব্দী জুড়ে ব্যাপ্ত। ঋগ্বেদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতাই প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বেদের গহনে প্রবেশ করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল।

তাঁর মতে—হিত্তি, মিতান্নি, কাসাইট পারসীকদের সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা সবই এসেছে আর্যদের আদি বাসভূমি থেকে। তাঁর মতে, এই আর্য জাতিরা তাদের আদি বাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল খ্রীস্ট পূর্ব দ্বিসহস্রাব্দের প্রথম ভাগে। তখন নিশ্চয়ই অর্ধবর্বর আর্যরা, যারা পাঁচশত বৎসর পরে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল, তারা আরও অধিকতর বর্বর ছিল।

অর্ধবর্বর যাযাবর আর্যরা, ভারত আক্রমণ করে হারাপ্পা সভ্যতার ধ্বংস সাধনে মেতে ওঠে ও নির্বিচারে ব্যাপক নরহত্যা চালায় বলে যে কাহিনী শ্যার উলে মহাশয় তুলে ধরেছেন, তার প্রতিবাদ আমরা প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের *Readings in Political History of India*-নামক পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় দেখতে পাই। তিনি উলে মহাশয়কে এক

প্রতিবাদ পত্রও পাঠিয়েছিলেন ভ্রম সংশোধনের আশায়; সে আশা ফলবতী হয়নি। মজুমদার মহাশয়ের লেখায় পাই, উলে মহাশয় এরূপ উক্তির প্রেরণা পেয়েছিলেন স্যার মর্টিমার হুইলার-এর কাছ থেকে। উলে মহাশয়ের বক্তব্যের পশ্চাতে তিনটি কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে। যথা : (১) ঋগ্বেদ দেখিয়েছে ভারতের প্রাচীন অধিবাসী উপজাতীয়দের প্রাচীর বেষ্টিত নগর সমূহের উপর নেমে আসে আর্য অভিযাত্রীদের প্রচণ্ড আক্রমণ, (২) প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে—হারাপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি প্রাচীর বেষ্টিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ; (৩) মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপে এমন কিছু নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে—যা দেখে অনুমান করা যায়, এটা ছিল পাইকারীভাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

তৃতীয় অনুমানের পশ্চাতে আছে—১৪, ৬ ও ৯টি করে নরকঙ্কালের তিনটি সমাধি। অবশ্য এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যা থেকে বলা যায় আর্যরা মাহেঞ্জোদারো আক্রমণ করেছিল বা সেখানে অন্য কিছু করেছিল কিংবা এই কঙ্কালগুলো (মোট ২৯টি) কোন ভয়াবহ যুদ্ধের অনিবার্য ফল। এমনও তো হতে পারে, যেমন কোন কোন প্রত্নতত্ত্ব খননকারী অনুমান করেছেন—এগুলো স্থানীয় কোন দাঙ্গার শেষ পরিণতি। যে কারণেই হোক, এ পর্যন্ত যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে তাতে ভারতীয় আর্যগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের যে অভিযোগ করা হয়েছে তার ন্যায্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সমর্থনের অবকাশ নেই। অথচ 'মানব জাতির ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডের পাঠকগণ, ভারতীয় আর্যদের সম্পর্কে এই একটি মাত্র বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, একটি বড় নগরের ২৯ জন নিহত হয়েছিল, তবে সেটি কি পাইকারী হত্যাকাণ্ড? এই ধরনের কথাই লিখেছেন ঐতিহাসিক মজুমদার মহাশয়। তিনি তাঁর প্রতিবাদপত্রে লিখেছিলেন—এটা স্মরণে রাখা ভালো যে, এই বর্বররাই ঋগ্বেদ রচনা করেছেন যা ইন্দো-ইয়োরোপীয়গণের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমেই "তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব" ও "তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব" এই দুই তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এই মন্তব্যও করেছেন যে, উলে এবং তাঁর সমগোত্রীয় অপরাপর প্রত্নতাত্ত্বিকগণের একটা বড় সুবিধা এই যে, তাঁরা ঋগ্বেদের ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এই পুস্তকের "বৈদিক ও হারাপ্পা সভ্যতা" অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদে যেসব দেবগণের ও তাঁদের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সপ্তসিন্ধুতেই বিকাশ লাভ করেছিল।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ সপ্তসিন্ধুরই সন্তান। তাঁদের সাধনা সপ্তসিন্ধুতেই ঘটেছিল। তাঁদের চেতনার ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়। যদি মননশক্তির এতটা বিকাশ তথাকথিত আর্যদের আদিম বাসভূমেই ঘটে থাকত তাহলে তার কিছু না কিছু নিদর্শন সেই অঞ্চলে থেকে যেত। স্মরণাতীত কালের এই সাধনার সাক্ষ্য, ভারত ছাড়া অপর কোন দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইন্দ্র, নাসত্য, বরুণ ও মিত্র—ঋগ্বেদের তথা সপ্তসিন্ধুরই দেবতা। ঋগ্বেদ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। মিতান্নি, কাসাইট ও হিত্তি ভাষায় ঋগ্বেদের তুল্য কোন ধর্মগ্রন্থ রচনার নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি। ঋগ্বেদীয় দেবদেবীগণ বাহনমুক্ত পশ্চিম এশিয়ায় দৃষ্ট হয়েছেন। হিত্তিগণ খত্তি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ছিল। ক্ষত্রিয় নামের উৎপত্তি সপ্তসিন্ধু তথা ভারতেই। ঋগ্বেদে বর্ণিত সভ্যতা-সংস্কৃতির যে সব নিদর্শন উপরোক্ত তিনটি জাতির মধ্যে দেখা গেছে তা নিশ্চয়ই সপ্তসিন্ধুর সাথে সম্পর্ক প্রমাণিত করে। স্যার উলের মতো বৈদেশিক পণ্ডিতগণের বক্তব্য কত অসার, কত অযৌক্তিক, এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

আর্য : প্রাচীন পারস্যে

পারস্যের আধুনিক নাম ইরান। এই ইরানের মধ্যে পারস্ বা পারস নামে একটি অঞ্চল ছিল। এই অঞ্চলের নামেই প্রাচীন কালে ঐ দেশের নাম হয়েছিল পারস্য। অধিবাসীগণ ছিল পারসীক। ইরান ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্য নামেই পরিচিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যখন পারসীকদের ধর্মগ্রন্থের প্রথম ভাগ 'গাথা' অংশ রচিত হয়, তখন ঐ অঞ্চলের বা দেশের কি নাম ছিল তা সঠিক-ভাবে জানা যায় না। সেকালের পারস্য ছিল সপ্তসিন্ধু তথা ভারতের প্রতিবেশী। আফগানিস্তানের অধিকাংশই তখন ছিল সপ্তসিন্ধুর অন্তর্গত। ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসে উভয় দেশই (পারস্য ও সপ্তসিন্ধু) ছিল এক গোত্রীয়, অর্থাৎ আর্য। এই দু-দেশের মধ্যে এরূপ বিপুল সাদৃশ্য দেখে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ইন্দো-পারসীকগণের পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয়ই অন্য কোন দেশ বা অঞ্চল থেকে এসে এই দুই দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। এবং খুব সম্ভবতঃ বর্তমান আফগানিস্তান ও ইরান-এর (পারস্য) উত্তরে উজবেকিস্তানের (বর্তমান রাশিয়ায়) এলাকায়, যেখানে আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া নামে দুটি নদী আরল হ্রদে গিয়ে পড়েছে, তার মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল (প্রাচীন এরানবেজ) সেই অঞ্চল। কারণ, প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যে কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল যে, তাদের পূর্বপুরুষগণ স্বর্গরাজ্য এরানবেজ থেকে এসেছিল। আর্যগণ একটা পৃথক জাতি, এরূপ ভ্রান্ত ও বদ্ধমূল ধারণা থেকেই সম্ভবতঃ এই মতবাদের উদ্ভব। পারস্যের আর্যগণের ভারতের বেদ-সংহিতার মতই অবেস্তা নামে ধর্মগ্রন্থ ছিল। তবে তা বেদ-সংহিতার মত তত প্রাচীন ছিল না। বেদ হলো একটা যুগের ঋষিগণ (আর্য) কর্তৃক শ্রুত, দৃষ্ট বা রচিত গ্রন্থ। কিন্তু অবেস্তার দুই ভাগের মধ্যে প্রথম প্রাচীন ভাগ 'গাথা' অংশ জরথুষ্ট্র কর্তৃক রচিত বলে কথিত আছে। অপর অংশ, কয়েক শতাব্দী পরে রচিত। বর্তমানে যে অবেস্তা দেখতে পাওয়া যায় তা সঙ্কলিত হয় অনেক পরে, সাসানীয়গণের পারস্যে রাজত্বকালে, খ্রীস্টিয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু তার পূর্বেই প্রাচীন অবেস্তা-সাহিত্যের অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। ইরানে অবেস্তার ভাষা ছিল—শাস্ত্রীয় ভাষা, ধর্মপুস্তক লেখার ভাষা। ঋগ্বেদের ভাষার সঙ্গে অবেস্তার শাখার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; প্রায় একই ভাষা এবং আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল এ দুই-এর ছন্দ-শব্দ ও ব্যাকরণ ব্যবহারে। উচ্চারণভঙ্গির মধ্যেই শুধু পার্থক্য ছিল। অপর অংশের

(গাথা ব্যতীত) ভাষা অনেক অর্বাচীন। এই অংশ (যস্ত, সিরোজা প্রভৃতি) যখন রচিত হয় তখন জরথুষ্ট্র কিম্বদন্তী পর্যায়ে পৌঁছে অর্ধ-ঈশ্বর বা অবতারে পরিণত হয়েছেন।

অবেস্তার এই অংশ প্রধানতঃ পৌরাণিক উপাখ্যান ও জরথুষ্ট্র সম্পর্কিত কিম্বদন্তীতে ভরা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বেদের সঙ্গে ছন্দ, ব্যাকরণ, শব্দবিন্যাস ও শব্দ গঠনে এই অংশেরও প্রচুর সাদৃশ্য বর্তমান। অবেস্তার গাথা অংশ হচ্ছে কয়েকটি স্তব বা গাথার টুকরো, যা জরথুষ্ট্র কর্তৃক রচিত। জরথুষ্ট্র ছিলেন পারসীক ধর্মের তথা অহুর ধর্মের প্রবর্তক; অবেস্তা সেই ধর্মেরই প্রথম পুস্তক। জরথুষ্ট্র ছিলেন 'অহুর মাজদা'-র উপাসক। বেদের দেবতা বা সুর এবং অবেস্তার অসুর সমার্থবাচক শব্দ। বেদের বহু স্থলেই দেবগণের শৌর্য ও বীর্যের প্রশংসার বিশেষণ স্বরূপ অসুর শব্দের ব্যবহার আছে। যথা: অসুর ইন্দ্র, অসুর বরুণ প্রভৃতি। ঋগ্বেদের প্রতি মণ্ডলে বহুবার দেব শব্দের বিশেষণ স্বরূপ অসুর শব্দের ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়। আবার একটা সম্পূর্ণ সূক্তই (৩।৫৫) 'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং'—অর্থাৎ দেবগণের মহৎ অসুরত্ব (মহৎ ঐশ্বর্যের প্রাবল্য একই) দেখান হয়েছে। অবেস্তায় অসুর বিশেষণ নয়, দেব বা দেবতা শব্দের পরিবর্ত। বেদের দেবতা মিত্র, ওদের অসুর মিথ্র; ভগ ওদের বগ; বিবস্বতপুত্র যম মৃত্যুর দেবতা, ওদের বিবনহান্ত পুত্র য়িমা স্বর্গের অসুর। গন্ধর্ব ওদের গন্দবেওয়া; যজ্ঞ—যশন্; মন্ত্র—মনথ্রন; আহুতি—আজুইতি; হস্ত—জস্ত। ভূমি—বুমি ইত্যাদি। বেদে প্রতিমা পূজার উল্লেখ নেই, অবেস্তাতেও নেই। বেদের তেত্রিশ সংখ্যক দেবতা ওদেরও তেত্রিশ জন অসুর। উপনয়ন, সোম উৎপাদন একই প্রকার। অগ্নি-যজ্ঞ দুয়েরই। পার্থক্য ছিল এই যে, বেদের ইন্দ্র—দেবশ্রেষ্ঠ, ওদের ইন্দ্র—অশুভ শক্তির প্রধান। বেদের দেবতা নাসত্য—ওদের কাছে অশুভ শক্তির প্রতীক। বেদের ত্রিতা—অবেস্তায় ত্রিতাওনা। ঋগ্বেদের ইন্দ্র, অহিহন্তা ওদের অজিহন্তা। ত্রিতা ও ত্রিতাওনা উভয়েই আপ্য, অর্থাৎ জলের—জলে বাসকারী। ঋগ্বেদের ত্রিতা আপ্যপুত্র, অর্থাৎ জলের পুত্র—সূর্যীয় দেবতা। ঋত-এ বিশ্বাস, মহৎ চিন্তা ও মহৎ কর্মে উভয় ধর্মেরই গুরুত্ব আরোপ, মন্ত্রের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস উভয় ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই ছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত নাম বা শব্দ অবেস্তাতে ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের পার্থক্য আছে, অর্থাৎ সমানার্থবাচক নয়। পারসীক বা অবেস্তা ধর্মের প্রবর্তক জরথুষ্ট্র-র একমাত্র উপাস্য দেবতা 'অহুর মাজদা'। এই মাজদা শব্দটি হয়তো ঋগ্বেদের মাধব বা মেধা শব্দ থেকে এসেছে। ঋগ্বেদে

ইন্দ্রকে ও অপর দেবগণকেও মাঘব বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সমূহেও মাঘব শব্দের উল্লেখ আছে। অহুর মাজদা হলেন অসুর মাঘব—অসুর মহান বা প্রধান। ঋগ্বেদে (ঋ ৮. ২০. ১৭) উল্লেখ আছে "অসুরস্য মেধসঃ"—অসুরের বিধাতা, এ থেকেও অসুর মাজদা নাম হতে পারে। ঐ ঋকের অর্থ এই—"রুদ্রের পুত্র, অসুরের বিধাতা নিত্য তরুণ মরুৎগণ, অন্তরীক্ষ থেকে এসে যাতে আমাদের কামনা করেন এ স্তোত্র সেরূপ হোক।"

ঋগ্বেদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসুর শব্দ—দেবগণের বিশেষণ। অবশ্য কোন কোন স্থলে, বিশেষ করে দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে কয়েকটি সূক্তে অসুর শব্দ দেবশত্রু অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা সামান্য কয়েকটি মাত্র।

ঋগ্বেদে দেব ও মনুষ্য-বিরোধী 'রাক্ষস' গণের উল্লেখ আছে, অবেস্তাতেও এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেদে ও অবেস্তায় নানা প্রকার সাদৃশ্য দেখে, প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর অধিবাসীগণের সঙ্গে পারসীকগণের যোগসূত্র ছিল এটা অনুমান করেই আচার্য ম্যাক্সম্যুলর তাঁর ভাষা-বিজ্ঞানে উল্লেখ করেছেন: জোরোয়াস্ট্রিয়ানপন্থীগণ (জরথুষ্ট্রের অনুগামীগণ) ভারতের উত্তরে বহুদিন ভারতীয় আর্যগণের সঙ্গে একত্রে বসবাস করত, যাদের গান বেদে সংরক্ষিত আছে। পরে ভেদ সৃষ্টি হয় এবং জরথুষ্ট্রপন্থীগণ পশ্চিমে আরাকোশিয়া ও পারস্যে (প্রকৃত প্রাচীন পারস্য, পারস্য উপসাগর তীরে, ব্যাবিলোন সাম্রাজ্যের নিকটে) গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।[১] ম্যাক্সম্যুলর সাহেব অন্যত্র লিখেছেন, "আরও বেশি চিত্তাকর্ষক হলো—ধর্ম ও পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ভারত ও পারস্যের মধ্যে সাদৃশ্যটি। দেবগণ অন্য কোন ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যে অজানা, কিন্তু একই নামে সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষায় (প্রাচীনতম পারসীকগণের ভাষা) পূজিত। সংস্কৃত ভাষায় যা অত্যন্ত পবিত্র বলে উল্লিখিত, জেন্দ ভাষায় তা অনিষ্টকারী শক্তি রূপে বর্ণিত। এরূপ দৃষ্টান্ত এই ধারণাই বদ্ধমূল করে দেয় যে, এককালে যে সম্প্রদায় একত্র ছিল তাদের পৃথক করে যে ভেদবুদ্ধি, সেই ভেদের চিহ্নই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি"।[২]

ডাঃ হগ (Dr. Haug) মহাশয়ও অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন তাঁর *Introduction to the Aitareya Brahman* নামক গ্রন্থে (পৃ. ২-৩)।

১. *Science of Languages* by Prof. Max Muller, Vol II, p. 279, (Fifth Edition).

২. ঐ।

"ব্রাহ্মণগণের ও পারসীকগণের পূর্বপুরুষগণ একত্রে ভ্রাতৃগোষ্ঠীভাবে শান্তিতে বসবাস করত। সেই সময়টা ছিল—দেবগণ ও অসুরগণের যে-সংগ্রামের কথা আমরা ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে প্রায়শই দেখতে পাই, তার পূর্বে। দেবগণ হিন্দুদের ও অপরটি ইরানীয়দের প্রতিনিধিত্ব করত।"

ম্যাক্সমূলর সাহেব অবেস্তার অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন: "অবেস্তার গাথাগুলোর রচনা (জরথুষ্ট্র কর্তৃক) হয়েছে উত্তর-পূর্ব পারস্যে। জরথুষ্ট্র সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভারতীয় ও ইরানী আর্যগণ সম্ভবতঃ একই অঞ্চলে বসবাস করতেন। পরে দু' ভাগ হয়ে, দু' দেশে সরে যান।" অনেক পাশ্চাত্য গবেষক এবং তাঁদের অনুকরণে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন। অথচ ম্যাক্সম্যুলর সাহেবই স্বীকার করেছেন, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশটি অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ 'গাথা' অপেক্ষা অনেক পুরাতন। এই মতবাদ মানতে হলে এটা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয় যে, আর্যগণ একটা জাতি এবং তাঁরা খ্রীস্ট পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী থেকে দলে দলে ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। আর বেদ রচনা উত্তর-পূর্ব ইরান অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল এবং বৈদিক দেবগণ, বৈদিক যাগযজ্ঞ, সোমলতা (হাওম), দেহে উপবীত ধারণ (যজ্ঞসূত্র, পৈতা), বৃত্রবধ প্রভৃতি সব কিছুরই সূত্রপাত যে ইরান অঞ্চলেই হয়েছিল—তাও স্বীকার করে নিতে হয়। যদি একথা সত্য হয়, তাহলে কি ঋগ্বেদে তার কোন উল্লেখ ঘুণাক্ষরেও থাকত না? জরথুষ্ট্র-র নামের উল্লেখ শুধু বেদে নয়, কোন বৈদিক সাহিত্যেও নেই। ঋগ্বেদের সোমস্তুতি ও সোমযজ্ঞ বলতে গেলে প্রাচীনতম, ইন্দ্র অপেক্ষাও প্রাচীন। কারণ, ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করে প্রথমেই সোমরস পান করেছিলেন। এই সোমলতা হিমালয়ের মুজাবন্ত পাহাড়ে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল। এটা হিমালয়েরই লতা। বৈদিক সাহিত্যে এর উল্লেখ আছে। আর যে কয়টি নদী ও সরোবরে তা পাওয়া যেত তাদের অবস্থানও ছিল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে। যে-ঋষি বা ঋষিগণ যজ্ঞের সৃষ্টি ও প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের নামও ঋগ্বেদে পাই, সপ্তসিন্ধুরই ঋষি ছিলেন তাঁরা। 'পূর্ব পিতাগণ' বলে পূর্বপুরুষ ঋষিগণের যেসব নাম আমরা পাই—তাঁরাও সকলেই সপ্তসিন্ধুর, অবেস্তায় তাঁদের নামগন্ধ নেই। বেদ-সংহিতার কোথাও পারস্য বা ইরানের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু অবেস্তায় সপ্তসিন্ধুর (হপ্ত হিন্দু) স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ 'গাথা'গুলির নানা স্থলে জরথুষ্ট্রপন্থীদের সঙ্গে, বৈদিক দেবতাবাদীদের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। "গাথা উষ্টানবৈতি"-তে

(৪. ৪৬. ১) আছে, "পুরোহিতগণের ও মূর্তি পূজার সন্তগণের হাতে অবাধ অধিকার দেওয়া হলো ; তাঁরা তাঁদের নৃশংস কর্মদ্বারা মানুষের জীবন নাশে সচেষ্ট হয়েছিল।" এই উল্লেখটি ভারতীয় আর্যগণের সম্পর্কেই। মূর্তি পূজা ঋগ্বেদের কালে ছিল না, সুতরাং এটা ঐ যুগের পরের ঘটনা। "গাথা অহুনাবৈতি" (যস্ত ৩২)-তে আছে : "ঐ দেবগণ অশুভ শক্তি থেকে উদ্ভূত। ওরা সোমরসের মাদকতায় তোমাদের অভিভূত করে, তোমাদের আয়ত্ত করে, আর শিক্ষা দেয় প্রতারণা করার ও মানুষকে বিনাশ করবার নানা বিদ্যা, যে সকল কার্য করবার জন্য তোমরা (ভারতীয় আর্যরা) সর্বত্র কুখ্যাত।" এই বিরোধের কথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরিয় সংহিতায় অস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় ; সম্ভবতঃ উল্লিখিত "অরু মাঘব" অসুর মাঘব-এরই সংক্ষিপ্ত নাম। একথা হয়তো অসুর মাজদার উপাসকদের উদ্দেশেই বলা হয়েছে। অরু মাঘবদের ইন্দ্র নিহত করেছিলেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ওরা থাকত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল অসুর পূজক। এই কাজের জন্য ইন্দ্র নিন্দিত হয়েছিলেন। এ সবই ঋগ্বেদের পরবর্তী ঘটনা।

অবেস্তা (যস্ন ১২)-তে জরথুষ্ট্র-র নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "আমি আর দেব-উপাসক নই, আমি জোরোয়াষ্ট্রীয়ান মাজদায়াম্না উপাসক··· আমি দেবগণকে ত্যাগ করেছি—যে দেবগণ ধ্বংসাত্মক ও নিকৃষ্টতম। আমি মাজদায়াম্না।"

জরথুষ্ট্র পূর্বে দেবোপাসক ছিলেন, পরে দেবগণকে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় সনাতন ধর্মের বিদ্রোহী সন্তান ছিলেন। ঋগ্বেদে দেবগণকেও বিশিষ্ট বলশালী অসুর আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। অবেস্তার 'গাথা'-গুলোতে দেবতারা ছিলেন অশুভ শক্তির প্রতীক। অসুর ছিলেন উপাস্য ও দেবগণের স্থলাভিষিক্ত। অবেস্তার 'গাথা' অংশ পড়লে মনে হয়, সপ্তসিন্ধুর আর্যদের সঙ্গে জরথুষ্ট্র-র বিরোধ ছিল প্রধানতঃ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। জরথুষ্ট্র ইন্দ্রকে অস্বীকার করেছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র—দেবতাশ্রেষ্ঠ। সেকালে চিন্তার ও মননশক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মতভেদ ঋগ্বেদের কালেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত স্তুতিগুলি দ্রষ্টব্য : ২.১২.৫ ; ৮.১০০.৩ ; ৫.৩৩.৩ ; ৪.৩০.১৮ ; ১০.৩৮.৩ ; ৬.৭৫.১৭ প্রভৃতি। কিন্তু এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও সেই ঋগ্বেদের যুগে কোন বিরোধী সংঘর্ষে পর্যবসিত হয়নি। জরথুষ্ট্র সম্ভবতঃ ইন্দ্রকে বরুণ ও অগ্নির উপরে স্থান দিতে চাননি। বিরোধ চরমে উঠলে, জরথুষ্ট্রপন্থীদের কাছে ইন্দ্র অশুভ শক্তির

প্রতীক রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের বৃত্রঘ্ন নামে আপত্তি ছিল না। ঋষিগণের সোমরস পান ও মাংস ভক্ষণ নিয়েও জরথুষ্ট্রের বিরোধ ছিল। জরথুষ্ট্র কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন ও কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে সপ্তসিন্ধুর আর্যদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, অবেস্তার 'গাথা' অংশে বহু স্থলেই বিরোধ ও নৃশংস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উল্লেখ আছে, বৈদিক আর্যদের উপাস্য দেবগণের নিন্দাও আছে। অবেস্তার যস্ন ১২-তে উল্লেখ আছে যে, "দেবতাগণ থেকে জরথুষ্ট্র পৃথক হয়ে গেলেন, তাঁদের আশ্রয় বা কর্তৃত্ব থেকে সরে গেলেন।" যস্ন ১৩-তে আছে: "দেবতাগণকে তাড়না করা হচ্ছে বা অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে।" যস্ন ১২।১৫-এ আছে, "দেবতারা রাক্ষসদের মত কাজ করে।" যস্ন ৯।২৪-এ আছে, জরথুষ্ট্র-র সাথে 'হাওম' (সোম) নিয়ে আলোচনা। হাওম জরথুষ্ট্রের কাছ থেকে স্তুতি দাবী করে। হাওম, কেরেশানিকে (ঋগ্বেদের কৃশানু—অগ্নি অথবা অর্ধদেবতা ধানুকী সোমরসের রক্ষক) সিংহাসনচ্যুত করতে এসেছে, কারণ "কেরেশানি (কৃশানু) এত মদমত্ত হয়েছিল যে, সে বিশ্বাসহন্তার মত বলেছিল, কোন পুরোহিত যেন হাওমকে পরামর্শ দেবার জন্য জমিতে এগিয়ে না আসে। সে উন্নতির সবটাই আত্মসাৎ করত ও সকলের পুষ্টি দমন করত।" এখানে হয়তো ইন্দ্রকে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র দুষ্টগ্রহ, সোমরসে আসক্ত, ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের নাম জড়িত। সুতরাং সোমকে পুনরায় জরথুষ্ট্রের প্রিয় হতে হলে ইন্দ্রকে ত্যাগ করতে হবে। হাওম ওকথা বলার পর (জরথুষ্ট্রের) স্তুতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী কয়েকটি যস্ন হাওম স্তুতিতে ভরা। এ যস্ন জরথুষ্ট্রের তিরোধানের পরবর্তী বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন। হয়তো তাঁর শিষ্যবর্গ হাওমকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন জনগণের অত্যাসক্তি দেখে। এই হাওম পার্বত্য হর্বানিপত লতা, হয়তো কম মাদকতাপূর্ণ। হাওম, অসুর মাজদা কর্তৃক সৃষ্ট। ঋগ্বেদের বর্ণনার মতই হাওম লতা (যস্ন-১১) মেয়েরা আঁটি করে বাঁধতো। ভারতীয় আর্যগণের মতই যজ্ঞে অগ্নিকে আহ্বান করা হতো। যজ্ঞের পুরোহিত 'অর্থবান' (যস্ন-১৩) সংস্কৃত শব্দ। ভারতীয় আর্যদের মতই গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা হতো। জরথুষ্ট্রের গাথাগুলো পড়লে মনে হয়, সপ্তসিন্ধুর আর্যগণের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। গাথাগুলো ছিল উগ্র ও প্রচারধর্মী। যস্ন ৩২।৫-এ আছে: "কিন্তু হে দেবগণ, তোমরা সব অশুভ মনের বীজ। যে তোমাদের হোম করে, সে বড়জোর 'দ্রাই' দৈত্যের এবং বিকৃত রুচির সন্তান। তোমাদের কপটতা প্রকট, যা সপ্তভাগ বিশিষ্ট পৃথিবীতে

বিখ্যাত।[১] গাথা উশ্‌তাবৈতি ৪৬-এ আছে : "কোন্ দেশের দিকে আমি মুখ ফেরাব! কোন্ দিকে ঘুরে আমি যাব। রাজপুত্র এবং অভিজাতগণ, এদের কেহ যে আমাকে আশ্বাস দিয়ে আমার কার্যে সাহায্য করে না। শ্রমিকদল সমূহ কিংবা সংখ্যাল্প প্রদেশের উৎপীড়কগণ কেহ না। এ হলে আমি কি করে আপনার প্রতি বিশ্বাস সকলের মধ্যে স্থাপন করব, কেমন করে আপনার করুণা অর্জন করতে পারব; —হে ঈশ্বর···আমার দলবলের সংখ্যা কেন এত হ্রাস পাচ্ছে, আর আমার অনুরাগীগণ কেন নীরব হয়ে যাচ্ছে?"

বিবাদ-বিসম্বাদ রক্তাক্ত সংঘর্ষে পরিণত হলে জরথুষ্ট্র সম্ভবতঃ দৈবী উপাসক আর্য-অধ্যুষিত সপ্তসিন্ধু অঞ্চল পরিত্যাগ করে তাঁর শিষ্যবর্গসহ আশ্রয় লাভের জন্য বহুস্থানেই ঘুরেছিলেন। পরে তিনি নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছিলেন-- 'অরিয়ানা বীজো'তে। ভেন্দিদার্দ ফারগার্দের প্রথমভাগে এর বর্ণনা আছে। এই অঞ্চল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। স্পিজেল (Spiegel)-এর মতে ইরানীয় মালভূমির পূর্বদিকের শেষ প্রান্তে—আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া নদীর উৎপত্তিস্থলের মধ্যভাগেই অবস্থিত এই আরিয়ানা বীজো। ব্যরন ফন বুনসেন (Baron Von Bunsen)-এর মতে এই অঞ্চলটির অবস্থান পামীর ও খোকন্দ-এর মালভূমিতে। আরিয়ানা বীজোর অর্থ—আর্যগণের বীজ। এরপরে আরিয়ানা বীজোতে নৈসর্গিক পরিবর্তনের ফলে দারুণ শীত পড়লে এবং সব কিছু বরফে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে জরথুষ্ট্র-শিষ্যগণ ঐ অঞ্চল ত্যাগ করে আরকোশিয়াতে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেন। এই নৈসর্গিক পরিবর্তন সম্পর্কে পারসীকগণের পরবর্তী রচনা (অবেস্তার পর) ভেন্দিদার্দ-এর দ্বিতীয় ফারগারদে অহুর মাজদা ও স্বর্গের অসুর য়িম (যম)-এর মধ্যে কথোপকথনের ছলে নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে : "এই সুখের দেশে মৃত্যুরূপী শীত দেখা দিল; তুষার ও বরফে সব আচ্ছন্ন হলো ও মনুষ্যবাসের অনুপযোগী করল।" অঞ্চলের দেবতা য়িম, অহুর মাজদার নিকট থেকে পূর্বেই এই অবস্থা হবে বলে সাবধান বাণী পেয়েছিলেন। অহুর মাজদা উপদেশ দিয়েছিলেন—ঘোড়া, গরু, মানুষ, কুকুর, পক্ষীর বীজ ও জ্বলন্ত লাল অগ্নিসহ অন্যত্র সরে যেতে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারা বাঁধতে। আরিয়ানা বীজোতে দুই ঋতু ছিল—সাত মাস গরম ও পাঁচ মাস শীত। পরে বরফ পড়লে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে এবং দেখা দেয় দশ মাস শীত ও দুই মাস গরম। ঋগ্বেদে ভারতের ছয় ঋতুর উল্লেখ আছে।

১ ভারতীয় আর্যগণের সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। ঋগ্বেদে পৃথিবীর এরূপ ভাগের কোন নেই, সুতরাং তা পরবর্তী কালের কথা।

ভেন্দিদার্দ হলো বহু শতাব্দীকাল পরের রচনা। জরথুষ্ট্রপন্থীগণ ব্যাকট্রিয়ানা হয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে মিডিয়াতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী-কালে রাঘা-ই হয়েছিল তাদের কেন্দ্র। ভেন্দিদার্দ-এ যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায়, পারসীকগণের বাসস্থলের বিস্তৃতি ছিল উত্তর পারস্যের মধ্য ভাগ বাকট্রিয়া সহ পূর্ব দিকে এবং পশ্চিমে রাঘা পর্যন্ত। সপ্তসিন্ধুও ছিল তাদের পরিচিত অঞ্চল।

আর্য জাতির প্রাচীন বাসভূমি কোথাও একটিমাত্র স্থলেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখান থেকেই পরে তারা পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের এক-দল ভারতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে, এই ভ্রান্ত অথচ বদ্ধমূল ধারণার বশ-বর্তী হয়েই আরিয়ানা বীজোই আর্যদের আদিম বাসভূমি—এরূপ মতবাদ বহু গবেষকের মনে শিকড় গেড়ে বসে। আরিয়ানা বীজো নামটিও মনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ ঘটলে বেদে তার কিছু-না-কিছু আভাস থাকত। কিন্তু চতুর্বেদে, ব্রাহ্মণ সমূহে বা কোন বৈদিক সাহিত্যে আমরা জর-থুষ্ট্র-র নাম পাই না। খুব সম্ভব তিনি পরবর্তীকালের লোক। তিনি যে অহুর ধর্ম প্রবর্তন করেছেন, তার উল্লেখ আমরা অবেস্তাতেই পাই। পারসীকদের বুন্দাহিদ-এ আছে, আলেকজাণ্ডার-এর তিনশত বৎসর পূর্বেই জরথুষ্ট্র-র আবির্ভাব ঘটেছিল, অর্থাৎ তিনি আবির্ভূত হন ৬৬০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের নিকটবর্তী সময়ে। এই তথ্য ভ্রমাত্মক হতে পারে কিন্তু কোন গবেষকই জরথুষ্ট্রকে খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর আগের বলে মনে করেন না। বেদ রচনা হয় তার বহু পূর্বেই। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে। যাহোক, বেদ-সমর্থক আর্যগণ যদি জরথুষ্ট্রপন্থাদের সঙ্গে বিরোধিতার দরুন পারস্য ছেড়ে সপ্তসিন্ধুতে প্রস্থান করতেন তাহলে পারস্যের দেবগণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতেন, কিন্তু তা হয় নি। জরথুষ্ট্র একমাত্র অহুর মাজদার উপাসক ছিলেন। জরথুষ্ট্রের তিরোধানের বহু শতাব্দী পরে অবেস্তার গাথা ব্যতীত অপর অংশ সমূহ (যস্ত, সিরোজা ন্যায়িস) রচিত হয়। জরথুষ্ট্রের গাথাগুলিতে আর্যদেবগণের স্থান ছিল না। কিন্তু অবেস্তার পরবর্তী অংশ সমূহে দেখা গেল—সোম (হাওম) মিত্র—মিথ্র, অগ্নি (অহুর মাজদার পুত্র), যম (য়িম), ত্রিত—ত্রৈতন, থেতন,—(ত্রিতাওনা), াববস্বত (বিবন ঘবন্ত) জাতে উঠেছেন এবং স্তুতি লাভ করছেন। অহুর মাজ-দার পরেই ছিল মিথ-র স্থান। অনুমান করা যায়, জরথুষ্ট্রের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই সপ্তসিন্ধুর আর্যগণের পারস্যে যাতায়াত শুরু হয়েছিল—আর্য ধর্মের প্রচারও হয়েছিল। ঋগ্বেদে দ্রুহ্যু গোষ্ঠীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। পুরাণে দ্রুহ্যু হলেন রাজা যযাতির পঞ্চপুত্রের একজন। বৈদিককালে দ্রুহ্যুগণ রাজত্ব

করতেন উত্তর পাঞ্জাবে, তুর্বাসাগণের রাজত্বের উত্তরদিকে। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা গান্ধারে (বর্তমান পেশোয়ার থেকে কান্দাহার) গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেন। সেখান থেকে পারস্যে যাওয়া কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। বাণিজ্যে ব্যাপৃত পনিগণও হয়তো পারস্যে আর্যসভ্যতা বিস্তারে সহায়ক হয়েছিলেন। জরথুষ্ট্রের দেব-বিদ্বেষী প্রচার আর্য সনাতন ধর্মকে পারস্য থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে পারেনি। এর প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে জরথুষ্ট্রপন্থী পারস্য সম্রাট জারকসেস্ তাঁর শিলালিপিতে দেবপূজা নিষিদ্ধ করে ফরমান জারীর মাধ্যমে দৈব উপাসনাকে বলপূর্বক দমন করেছিলেন। জরথুষ্ট্রের তিরোধানের কয়েক শতাব্দী পরেও কোন কোন আর্য দেবতা অবেস্তাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। যদিও তখনো দেব-বিদ্বেষ অব্যাহতই ছিল। অহুর মাজদার উপাসক পারসীক ধর্ম খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮ থেকে ৩৩১ সালের মধ্যে পারস্যের আকামেনিড সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করে। আকামেনীয়-গণই অহুর মাজদার উপাসক ছিলেন। দরায়ুস-এর শিলালিপিতে কেবলমাত্র অহুর মাজদা-র নামই পাওয়া যায়, তাঁর পৌত্রের রাজত্বের শিলালিপিতে তিন উপাস্যের অর্থাৎ অহুর মাজদা, অনহিত ও মিথ্র-র নাম উল্লিখিত হয়েছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই সাম্রাজ্যের অনেক বিবরণই রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন সমসাময়িক মানুষ, অথচ তাঁর লেখায় জরথুষ্ট্রের নামগন্ধও নেই। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন, অবেস্তার গাথা অংশের থেকে 'যস্ন' অংশই তখন অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছিল। 'মগিগণ' ছিলেন ইরানের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তারা পশ্চিম ইরান বা মিডিয়াতে বাস করতেন। হেরোডোটাস-এর মত অনুসারে, মগিগণ মিডিয়ার ছয় আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্যতম। পারসীকগণ কোন যজ্ঞ করতে গেলে, মগিগণ মন্ত্র পাঠ করতেন। মগি ব্যতীত কোন যজ্ঞ হতো না। মগিগণ শুধু অবেস্তার অগ্নি উৎপাদক 'অর্থবান' ছিলেন না, একটি পুরুষানুক্রমিক পুরোহিতগোষ্ঠী ছিলেন। তাঁরা রাজগণের ধর্মীয় ও বৈষয়িক উপদেষ্টাও ছিলেন। গ্রীক লেখকদের মতে, মগিগণ পারস্যের অধি-বাসী। জরথুষ্ট্র নিজে মগি ছিলেন বলেও অনেকে মনে করেন। গাথার একটি অংশে (যস্ন ৩৩.৬) জরথুষ্ট্র নিজেকে পুরোহিত জাওতার (সংস্কৃত হোতার—হোতৃ) বলেছেন। রাজা ক্যামাবিসেস (৫২৮-৫২১ খ্রীঃ পূঃ)-এর সময়ে মগি গৌমাতা বিদ্রোহ করেছিলেন। ৫২১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে দরায়ুস মগি গৌমাতাকে হত্যা করেন। মগিদের সম্পর্কে হেরোডোটাস-এর বর্ণনায় অসামঞ্জস্য আছে। আকামেনিড সাম্রাজ্যের পতনের পরে, পারস্য সেলুসিড (গ্রীক)

ও পার্থিয়ান (তুরানীয়ান) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে, ২১৪ খ্রীস্টাব্দে, অহুর মাজদার উপাসক সাসানীয়গণ পারস্যে অধিকার ফিরে পান। এই রাজত্বকালেই পারসীকগণের অবেস্তার ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থাদির সঙ্কলন হয়। এই সময়ে পারসীক ধর্ম পুনরায় রাজধর্মে পরিণত হয়। প্রাচীন ইরানীয় ভাষার নিদর্শন অবেস্তাও প্রাচীন পারসীক অনুশাসনে রক্ষিত হয়েছিল। অবেস্তার ভাষায় প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন (গাথা ও পংবর্তী অবেস্তা)—এই দুইটি স্তর দেখা যায়। অবেস্তার অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অংশ অধিকাংশই যে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেই রচিত হয়েছিল, এমন অনুমান করা যায়। অবেস্তার শাস্ত্রীয় ভাষা ছাড়া ইরান বা পারস্যে আর একটি ভাষা ছিল, তাকে বলা হতো প্রাচীন পারসীক ভাষা। এটি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা। আকামেনীয় বংশের সম্রাটদের কার্যাবলী ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনী শিলালিপি ও ধাতুলিপিতে প্রচার করা হয়েছিল। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে দরায়ুস (ধারয়বসু) ও তৎপুত্র জারক্সেস (বা ক্ষয়ার্ষন) প্রমুখ সম্রাটগণের শিলালিপি ও ধাতুলিপি থেকে এই ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। আকামেনীয় বা হখামনীয় রাজবংশ খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন পারসীকদের ভাষা অবেস্তার মত জটিল ছিল না। অবেস্তার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য —বৈদিক ভাষার মত। কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃতে বৈদিক ভাষার জটিলতা যেমন বহুল পরিমাণে সরলীকৃত হয়েছে, তেমনি প্রাচীন পারসীক ভাষাতেও অবেস্তার মত ভাষাগত জটিলতা নেই। এ জন্যেই দরায়ুস-এর অনুশাসন পড়তে গেলে মনে হয়, এই ভাষা বুঝিবা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অতি নিকটবর্তী উপভাষা মাত্র। প্রাচীন পারসীক ভাষার বিবর্তনের ফলে, প্রাকৃত স্থানীয় পহলবী ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে। মধ্য ইরানে শক ভাষাও উল্লেখযোগ্য। এই ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। পহলবী ভাষাই মধ্য পারসীক ভাষা—ফারসী বা আধুনিক পারসীক ভাষার জননী। আনুমানিক খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান রাজত্বকালে ফারসী ভাষার উৎপত্তি ঘটে। এতে আরবী ভাষার শব্দের প্রাচুর্য এত বেশি ঘটেছে যে আপাতদৃষ্টিতে একে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর বলে প্রতীয়মান হয় না।

৬৩৭-৬৪১ খ্রীস্টাব্দে আরবীয় মুসলমানগণ পারস্য অধিকার করেন ও ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। অধিকাংশ পারসীকই ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হন, আর কিছু পারসীক ভারতে চলে আসেন। বর্তমানে ইরানে পার্সী ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দশ-বার হাজার মাত্র; আর ভারতে লক্ষাধিক। পারসীকগণের মধ্যে মৃতদেহ

অগ্নিসংকার না করে অথবা সমাধি না দিয়ে ডাকমাতে ফেলে আসার রীতি আছে। এই রীতি হখামেনীয় বা আকামেনিড রাজগণ মান্য করেননি। জরথুষ্ট্র অগ্নিসংকার ও সমাধি—দুই নীতিই উল্লেখ করেছিলেন। আকামেনিড রাজগণকে সমাধি দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে মিডিয়গণের সংস্পর্শে এসে এই রীতি অবেস্তায় স্থান পায়। ঋগ্বেদে এই তিন প্রকার প্রথারই উল্লেখ আছে।

পারসীকগণের ধর্মে সপ্তসিন্ধুর আর্যসভ্যতার ভাষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির প্রভাব থাকলেও পার্থক্যও বিস্তর। একই ধর্ম দু'দেশে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। আকামেনিড (দরায়ুস, জারাক্সেস প্রভৃতির কালে), গ্রীক, ব্যাকট্রিয়ান ও শকদের সাম্রাজ্যে, পারস্য ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ একই সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন আত্মিক যোগ ছিল না ; এরা ছিল একে অন্যের সম্পূর্ণ অপরিচিত জাতি। ভারত থেকে ইরানে আর্য-সভ্যতার বিস্তার লাভ ঘটলেও কোন যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না।

এখানে উল্লেখ্য যে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে হিত্তি ও মিতান্নিদের মধ্যে যে-সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে সাক্ষী মানা হয়েছিল চার দেবতাকে, এর মধ্যে ইন্দ্র ও নাসত্য দুই দেবতাই ছিলেন, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। এই ঘটনাটি নিশ্চয় জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বেই ঘটেছিল, কারণ জরথুষ্ট্র এই দুই দেবতাকে অস্বীকার করেছিলেন। "আমি ইন্দ্রকে, সৌরুকে ও দেব নওনহৈথ্যকে (ঋগ্বেদের নাসত্য) এই গৃহ হতে, এই পল্লী হতে, এই নগর হতে, এই দেশ হতে, এই পবিত্র অখণ্ড জগৎ থেকে দূর করে দেই", (অবেস্তা, দশম ফারগার্দ)। প্রায় ১৯৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে হিত্তিগণ পূর্ব এশিয়া মাইনরে অভিযান করে। এরা ইয়োরোপ থেকে আসেনি, কারণ ওদিক থেকে আসতে হলে প্রথমে পশ্চিম এশিয়া মাইনর দখল করতে হতো, এ ক্ষেত্রে তা ঘটেনি।

সুতরাং বলা যায়, আর্য-সভ্যতা সপ্তসিন্ধু থেকেই পারস্যে বিস্তার লাভ করেছিল, পারস্য থেকে সপ্তসিন্ধুতে নয়।

পূর্বে উল্লিখিত তথ্যসমূহ বিবেচনা করলে, ঋগ্বেদ যে অবেস্তার পূর্ববর্তী রচনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ঋগ্বেদ রচিত হয় সপ্তসিন্ধুতেই, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ একথা মেনে নিয়েছেন। ঋগ্বেদ রচয়িতাগণ আর্য। জরথুষ্ট্র ও তাঁর শিষ্যবর্গও আর্য। অবেস্তা গ্রন্থে অহুর মাজদার উপাসকগণকে আর্য (আইর্যির) সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বহু রক্তস্রাবী সংঘাত ও সংঘর্ষের পর, দেব-বিদ্বেষী জরথুষ্ট্র শিষ্যবর্গসহ যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন তারও নাম দেওয়া হয়েছিল আইর্যান বীজো। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সপ্তসিন্ধুর

আর্যগণের বিরুদ্ধেই ছিল জরথুষ্ট্র-র বিদ্রোহ। সুতরাং আরিয়ানা বীজোতে জরথুষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণের বহু পূর্বেই আর্যগণ সপ্তসিন্ধুতে বসবাস করছিলেন। আরিয়ানা বীজো তাই উভয় আর্যদলের আদিম বাসস্থল হতে পারে না। উভয় মতাবলম্বী দলের সংঘর্ষে জরথুষ্ট্রপন্থীদের সরে যাবার ইঙ্গিত আছে। এমন এক সময় ছিল যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করতেন, ঋগ্বেদ রচিত হয়েছে ইরান দেশেই। ঋগ্বেদে উল্লিখিত সরস্বতী নদী হচ্ছে ইরানের অক্সাস (গ্রীক নাম), অর্থাৎ আমুদরিয়া নদী। কেউ কেউ হারাবতী নদীকেই সরস্বতী নদী বলে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদে সরস্বতীর দুই বড় উপনদীর কথাও আছে—দৃষদ্বতী ও আপয়া। এই তিন নদীর সপ্তসিন্ধুবক্ষে অবস্থানের প্রমাণও আমরা ভারতে পাই। এ ছাড়া সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি যে সব নদীর নাম আমরা ঋগ্বেদে পাই সে সবই ভারতের নদী। ঋগ্বেদে যেসব জনপদের উল্লেখ আছে কিংবা তাদের অবস্থানের উল্লেখ আছে, তারা সবই ভারতের বুকে বিরাজ করছে। সকল দিক বিবেচনা করেই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদ যে ভারতীয় আর্যগণেরই গ্রন্থ, এই তথ্য স্বীকার করে নিয়েছেন। বেদের ভাষার সঙ্গে পারস্যের অবেস্তার ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। জরথুষ্ট্র সপ্তসিন্ধু বা তার পার্শ্ববর্তী একই সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষ ছিলেন; সুতরাং তাঁর পক্ষে বৈদিক ভাষা জানা অসম্ভব ছিল না। বৈদিক ভাষা হলো ধর্মশাস্ত্রীয় ভাষা, হয়তো সেই কারণেই তিনি তাঁর গাথাসমূহ উক্ত ভাষায় লিখে থাকবেন। একই ভাষা হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রচলিত ছিল, এই নজির ভারতের বুকেই পাওয়া যায়, যথা—সংস্কৃত। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে? তাই বৈদিক ভাষায় লেখা হয়েছে বলে অবেস্তা বৈদিক যুগেই রচিত হয়েছে, এরূপ ধারণা করা ভুল।

খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আসিরিয়া দেশে, অসুর বানিপাল-এর রাজত্বকালে মন্দির সমূহে যেসব দেবতা পূজিত হতেন, তার কিছু চিত্র উক্ত রাজার পুস্তকাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে 'অসসর মাজাস' নামটি পাওয়া যায়। এই দেবতার পশ্চাতে আছে সাতজন শুভ পরী ও সাতজন অশুভ আত্মা। এই চিত্র যে 'অসুর মাজদা'-র, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। পশ্চাতের সাতজন 'আমেসা স্পেণ্টা' ও অপর সাতজন মন্দ দৈব। এখানে এটাই আশ্চর্য যে, অবেস্তার অহুর-এর পরিবর্তে সংস্কৃত অসুর লেখা। অনুমান, পারস্য নিকটবর্তী হলেও এই দেবতা পারস্য বা ইরান থেকে সরাসরি ওখানে পৌঁছায় নি। এই চিত্র এটিও প্রমাণ করেছে যে, জরথুষ্ট্র খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রাচীন পারস্যের ইতিবৃত্ত

আর্য-সভ্যতার আদি উৎস সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে হলে প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা সেই ইতিবৃত্ত অতি সংক্ষেপে এবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন পারস্যের বর্তমান ইরান নামটি শাহ কর্তৃক ১৯৩৫ সালে প্রদত্ত হয়েছে। ইরান শব্দটি এসেছে—আইরানা বেইজো বা সংক্ষেপে ইরানা বীজো (আর্যদের বীজ) শব্দটি থেকে।

প্রাচীনতম কালে, পারস্যে কাসাইট ও মিতান্নি নামে দুই আর্য মানব-গোষ্ঠীর নাম আমরা পাই—যারা বাইরে থেকে এসে পারস্য হয়ে ব্যাবিলোন ও মেসোপটেমিয়া অভিযান ও জয় করে। এদের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই দুই গোষ্ঠী খুব বেশি সংখ্যায় পারস্যে প্রবেশ করেনি, সেইজন্য এদের কোন চিহ্ন পারস্যে নেই। কথিত আছে, কাসাইটগণ পারস্যের জাগ্রস-এ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কাসাইটগণ ১১৭১ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বৎসর ব্যাবিলোনিয়াতে রাজত্ব করলেও এটি আশ্চর্য যে, সেখানে কিংবা পারস্যে তারা জনগণের মনের ওপর কোন স্থায়ী ছাপ রেখে যায় নি। এর কারণ হয়তো ব্যাবিলোনীয়দের মধ্যে তারা একেবারে মিশে গিয়েছিল। মিতান্নিরা ১৪০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়া দখল করে।

পারস্যে পারসীক ধর্মগুরু জরথুস্ত্রের নামই সর্ব প্রাচীন। কোথায় কোন্ সময়ে তিনি জন্মেছিলেন, কোথায় কোথায় তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন, তার কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও প্রচণ্ড মতভেদ আছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবাদ অনুসারে তার জন্ম ৬৬০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এবং মৃত্যু ৫৮৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। বহু পারসীক পণ্ডিতের মতে, জরথুস্ত্র ১০৮০ খ্রীঃ পূঃ সময়ে অবেস্তার 'গাথা' অংশ রচনা করেন[১] এবং ৪০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে তা লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়। এক শ্রেণীর মতে, তিনি আজারবাইজানে জন্মেছিলেন। সেই প্রদেশ পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে। আর ভারতবর্ষ হলো পারস্যের দক্ষিণ-পূর্বে। ভারতীয় আর্যগণের সঙ্গেই তাঁর বিবাদ চরমে উঠেছিল। যেটুকু জানা যায় তাতে মনে হয়, তিনি পূর্ব পারস্য পরিভ্রমণ করেছিলেন; কথিত আছে, খোরাসান প্রদেশের কিসমার অঞ্চলের

---

১. *History of Persian Literature*: Edited by Yunus Jaffery. p. 18.

রাজা বিষ্টাস্প-র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। প্রথমে রানী ও উজিরের দুই পুত্র, পরে রাজা স্বয়ং প্রজাগণসহ তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেন। জরথুস্ট্রের মতবাদ প্রচারের ভাষা ছিল বলখি অর্থাৎ প্রাচীন বাহ্লিকদের ভাষা (বর্তমান বদক্ষাণ বা বলখ)। এই ভাষার আর একটি নাম ছিল জান্দ (জান্দ, সংস্কৃত জ্ঞান বা জানা থেকে এসেছে)। পারসীক পণ্ডিতগণের মতে, পূর্ব ইরানীয় ভাষা হচ্ছে অবেস্তার ভাষা। পূর্ব ইরানীয় ভাষা ছিল বৈদিক ভাষার অনুরূপ। এই সব কারণেই মনে হয় যে, জরথুস্ট্র পূর্বপারস্য বা তার নিকটবর্তী কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ এক হাজার বৎসর পূর্বের পারস্য বা ইরান দেশের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন, এর কোন কিছুই জানা যায় না। অতি প্রাচীনকালে পারস্যেরই পশ্চিম প্রান্তে পারসা বা ফারস-এর পাশে, বর্তমান খুজিস্তান প্রদেশে এলাম নামে এক রাজ্য ছিল। পারস্যের অন্তর্গত হলেও সেই রাজ্যের জনগণ ভাষায় ও সংস্কৃতিতে আসিরীয়-ব্যাবলোনীয় ঘেঁষা বা তার প্রভাবাধীন ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বিখ্যাত সুসানগরী, আর প্রধান নগরী ছিল পার্শিপোলিশ। আসিরিয়ার পরাক্রান্ত নরপতি, অসুর বানিপাল ৬৪৫ খ্রীস্টপূর্বে সুসা নগরী আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন। ফলে, এলাম রাজ্যের পতন ঘটে। আসিরিয়া ছিল সেমেটিক জাতীয়।

এলাম রাজ্য

ঐতিহাসিকগণের মতে, প্রকৃত ইরানের প্রথম আর্য-রাজগণ মিডিয়া অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই মিডিয়া রাজ্যের পত্তন থেকেই পারস্য দেশের সৃষ্টি। মেসোপটেমিয়া থেকে পারস্যের বা ইরানের মালভূমিতে যেতে হলে জাগ্রস পর্বতমালার মধ্যভাগ দিয়ে যে-গিরিপথ ছিল তাই অবলম্বন করতে হতো। প্রাচীনতম কালে এই গিরিপথ দিয়ে নানা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এই গিরিপথ অতিক্রম করলে পারসা দেশের পার্শ্বে যে-ভূখণ্ড পড়ে তারই নাম মিডিয়া। ইরানীয় মালভূমির মধ্যে এ অঞ্চলই ছিল সুজলা ও সর্বাধিক উর্বরা। পাঁচশত বৎসর ধরে এই অঞ্চল ছিল পার্শ্ববর্তী আসিরীয় রাষ্ট্রের রাজগণের শিকারভূমি। এই মিডিয়া কতকগুলো গোষ্ঠী-সর্দারগণ কর্তৃক শাসিত হতো। এদের মধ্যে কোন একতা ছিল না, প্রত্যেকেই ছিল স্ব স্ব প্রধান। সেমেটিক তৃতীয় খাল্ডির (ক্যাল্ডির) সাম্রাজ্যের পতনের পর আনুমানিক ৭০৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এই দেশের ছয়টি গোষ্ঠী-সর্দার একত্রিত হয়ে একটি রাজ্য

মিডিয়া: ৬০৬-৫৫০ খ্রীঃ পূঃ

স্থাপন করেন। হেরোডোটাস্-এর গ্রন্থে পাওয়া যায়, সর্দার ফ্রায়ার টেস-এর পুত্র দেইওকেশ ছয় সর্দারকে একত্রিত করে ভোটের মাধ্যমে নিজে রাজা রূপে নির্বাচিত হয়ে একটি রাজ্য স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। বর্তমান হামাদান শহর যেখানে অবস্থিত অতীতে তার নাম ছিল মোমাদানা, পারস্য ভাষায় বলা হতো হাগমাটানা (বহু রাজপথের মিলনস্থল) এবং গ্রীক ভাষায় এগবাটানা। এখানেই নতুন রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করা হয়। এই শহর গড়ে উঠেছিল ব্যাবিলোন ও আসিরিয়া যাতায়াতের রাস্তাগুলির সংযোগস্থলে। প্রথমে এই নয়া রাজ্য করদ ছিল। ৬৪৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বাসনায় এই রাজ্য আসিরিয়া আক্রমণ করে, কিন্তু পরাস্ত হয়। পরে ৬০৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মিডিয়া রাজ সায়াকসারেশ, অপর করদরাজ্য ব্যাবিলোনের রাজা নেবুজান্দনেজার-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে আসিরিয়া আক্রমণ করে। এই আক্রমণে রাজধানী নিনেভ ধ্বংস হয় এবং আসিরিয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এইভাবে মিডিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। মিডিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, উত্তর-পশ্চিমে আজারবাইজান প্রদেশ, পূর্বে লুট অঞ্চল ও পশ্চিম-দক্ষিণে আসিরিয়া পর্যন্ত জয় করে নেয়। রাঘিয়ানাও (বর্তমান তেহেরান ও তার চতুস্পার্শ্ব) পদানত হয়। উত্তরের সীমারেখা বোধহয় ছিল আরাস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নদী বর্তমানে ইরানেরও সীমারেখা।

মেডেসের জনগণ ছিল আর্য। তার পার্শ্ববর্তী জনপদ পারস ছিল আর্যগণের শৈশবের দোলনা। মিডিয়গণ হলো পারস দেশের অধিবাসী পার্সীগণেরই গোষ্ঠীভুক্ত এবং একই সংস্কৃতিসম্পন্ন। স্ট্র্যাবোর মতে এদের ভাষা ছিল পার্সী, ব্যাকট্রিয়া ও সগডিয়ানা (ব্যাকট্রিয়ার দক্ষিণ প্রদেশ, মিডিয়ার উত্তর) ভাষার সংমিশ্রণ। দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত এই ভাষার কোন লেখা, শিলালিপি বা মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি। মিডীয় ভাষা কি শুধুই কথ্য ভাষা ছিল ? কোন পুস্তক কেন এ ভাষায় রচিত হয়নি, এর উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। মিডীয়দের ভাষা ছিল—অবেস্তা থেকে উদ্ভূত প্রাচীন পারসীক ভাষারই অনুরূপ। এই রাজ্যের পতন ঘটে ৫৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে, পারস-এর সাইরাস দি গ্রেট-এর সঙ্গে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। সাইরাস, পূর্ববর্তী নাম কুরষ-ই বর্গ ছিলেন পার্শ্ববর্তী পারস দেশের আনসান-এর রাজা।

হখামনীয় সাম্রাজ্য : ৫৫০-৩৩০ খ্রীঃ পূঃ

হখামনীয় (সংস্কৃত সখামনা-র অপভ্রংশ) বা গ্রীকভাষায় কথিত আকামেনীয় রাজা কুরষ-ই বর্গ (সাইরাস দি গ্রেট) মিডিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া জয় করে ৫৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ইরানে (পারস্যে) বিখ্যাত হখামনীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সাইরাস কালক্রমে বহু দেশ জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কৃষ্ণসাগর থেকে আফ্রিকার ইথিওপিয়া এবং ভারতের সিন্ধুতীর থেকে লিবিয়া পর্যন্ত তাঁর পদানত হয়েছিল। তিনি শুধুমাত্র বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন না, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দয়াবান সম্রাটের প্রয়োজনীয় গুণাবলীও তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি ক্রীতদাস প্রথা তুলে দেন ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতই মহান একজন বিখ্যাত নরপতি। যেসব শিলালিপি পাওয়া গেছে তার থেকে তখনকার চিত্র পাওয়া যায়। হখামনীয়গণ ছিলেন খাটি জরথুষ্ট্রপন্থী। তাঁর পুত্র ক্যাম্বিশেষ-এর রাজত্বকালে ৫২৯ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মিশর পদানত হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী দয়ায়ুস (৫২৬ খ্রীঃ পূঃ) বিক্ষোভ-বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন ও ভারতের সিন্ধুদেশ জয় করেন (৫১২ খ্রীঃ পূঃ)। এশিয়া মাইনরে যেসব ছোট ছোট গ্রীক রাজ্য ছিল তার সবগুলি এবং ম্যাসিডোনিয়া সহ থ্রেসও জয় করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সুসা নগরীতে; পার্শিপোলিশ ছিল সাংস্কৃতিক মহাকেন্দ্র; আর এগবাটানা ছিল গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। দয়ায়ুস বহু শিলালিপি রেখে গেছেন। শিলালিপি সমূহ ব্যতীত, এই হখামনীয়দের সম্পর্কে হেরোডোটাস, টেসিয়াস, জেনোফোন প্রভৃতি গ্রীক লেখকদের লেখা থেকে আরও বহুকিছু জানতে পারা যায়। এই সময়কার ভাস্কর্য এবং শিল্পেরও বহু নিদর্শন সুসা, পার্শিপোলিশ, এগবাটানা প্রভৃতি নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বংশের রাজত্বকালে যে বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, গ্রীক রাজত্বকালে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পূর্বে উল্লিখিত সম্রাট দয়ায়ুস সর্ব প্রথম সুয়েজখাল খনন করে লোহিত সাগরের সঙ্গে নীলনদের সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছিলেন। ৪৯০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে দয়ায়ুস সাগর অতিক্রম করে গ্রীস দেশও আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু তিনি পরাজিত হন। ৪৮৫ খ্রীস্ট পূর্বে দয়ায়ুস দেহ রক্ষা করলে জারক্সেস সম্রাট হন। গ্রীস আক্রমণ করে তিনি সাময়িকভাবে অ্যাথেন্স জয় করেন কিন্তু থার্মাপোলি ও সালামিস-এর নৌযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হন।

সাইরাস, দয়ায়ুস প্রভৃতি ছিলেন গোঁড়া একেশ্বরবাদী ও অহুর মাজদার উপাসক। তাঁরা রাজ্যে দেবপূজা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। রাজ-আনুকূল্য লাভ করে জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম সমগ্র ইরানে বিস্তৃতি লাভ করে। কথিত আছে যে, দয়ায়ুসই প্রথম ১২০০০ গোচর্মের উপর একহাজার অধ্যায়ে অবেস্তা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। অবেস্তার সর্ব পুরাতন অংশ ছিল যস্ন—৪২টি হস বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে ১৭টি অধ্যায়ে ছিল স্বয়ং জরথুষ্ট্র রচিত গাথা বা স্বর্গীয় সংগীত। গাথা

সমূহের সংখ্যা পাঁচ : অহুনাবৈতি, উষ্টাবৈতি, স্পেণ্টামৈন্যু, বহু ক্ষত্র ও বহিষ্টাইষ্টি। যস্নের অপর অংশসমূহে আছে—ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিধি, কিছু ছোট ছোট প্রার্থনামন্ত্র এবং আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে উপদেশ ও সতর্কীকরণ। গাথাসমূহ ও যস্নের বিশিষ্ট অংশ গদ্যে রচিত। যস্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং প্রায় এর সম্পূরক অংশ হচ্ছে বিশপারাদ—২৩টি কর্দে বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

পরবর্তী অংশ বা পুস্তক ভেন্দিদার্দ (ভি বা বি—দৈব—দাতা) দৈব বিরোধী নিয়মাবলী—২২টি ফ্রাগাদ বা অধ্যায়ে বিভক্ত ও গদ্যে রচিত। সম্ভবতঃ এগুলি সাসানীয় রাজত্বকালে রচিত হয় কিন্তু এর অধিকাংশই প্রাচীন বিশ্বাসের উপর রচিত। এই তিন নিয়েই অবেস্তা। খোরদে অবেস্তা (ক্ষুদ্র অবেস্তা) নিত্য ব্যবহারের জন্য। এই পুস্তকে সংগৃহীত হয়েছে নানা প্রার্থনামন্ত্র। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে যস্ত বা গুণগান।

হেরোডোটাস লিখে গিয়েছেন যে, পারসীকগণ সর্বোচ্চ পর্বতে আরোহণ করে, জ্যুস (zeus সংস্কৃত দ্যোঃ দ্যোয়, গ্রীক জিয়ুস)-এর কাছে অর্ঘ্য দান করত। তারা সমস্ত আকাশমণ্ডলকে জ্যুস আখ্যা দিয়েছিল। অধিকিন্তু, তারা, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ুর নিকট নৈবেদ্য নিবেদত করত। একমাত্র এভাবেই তারা প্রথমতঃ ত্যাগব্রতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

হেরোডোটাস বর্ণিত এই প্রকৃতি পূজাই সকল পারসীক আর্যগণের বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতীয় ও ইরানীয়দের মধ্যে একই ধর্ম ও সংস্কৃতি বহুকাল ধরে বর্তমান ছিল। হেরোডোটাস-এর মতে হখামনীয়দের রাজত্বকালে বহুকাল ধরে পারসীক ধর্ম 'গাথা'-মতাবলম্বী ছিল না বরং বৈদিক ধর্মের অনুরূপ ছিল।

এটি সুস্পষ্ট যে, যেসব ধর্মীয় প্রথা, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা জরথুষ্ট্র করেছিলেন, সেগুলো ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক। বেদ ও অবেস্তায় ধর্ম-সংক্রান্ত যেসব পারিভাষিক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে উভয় ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে দারুণ সাদৃশ্যই প্রমাণিত হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের প্রচলন ছিল, তা একই সূত্র থেকে উদ্ভূত বলা চলে। জরথুষ্ট্র কতকগুলো বিষয়ের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ধর্মের নামে পশুহত্যা, সোমরস (হাওম) পান প্রভৃতি তিনি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হাওম পানে বিরতি আনতে পারেন নি। জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই এই রস পানে পারস্যের জনগণ অভ্যস্ত ছিল। উপনয়ন প্রথাও উভয় বেদ এবং অবেস্তায় প্রায় একই প্রকার। উভয় ধর্মেই দেবতারূপে ৩৩ জন স্বীকৃত। এই দুই ধর্মপুস্তক প্রায় একই ছন্দে লিখিত হয়েছে। উভয় ধর্মের

দেবগণই ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে সংগ্রামের দেবতা বলে পূজিত হতেন। ধর্মের দেবতার মধ্যে এরকম সাদৃশ্য প্রচুর। এইসব সাদৃশ্য বিচার করলে মনে হয়, জরথুষ্ট্র অতীতকে একেবারে অস্বীকার করে একটি ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কতকগুলো সংস্কার। তিনি দেবগণকে বাদ দিয়ে অসুর পূজা প্রবর্তন করেছিলেন একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই। জরথুষ্ট্র প্রচারের যুগ শেষ হওয়ার পর, অবেস্তার অপর যস্ন সমূহ রচিত হয়েছিল। এই পরবর্তী অংশে দেখা যায়, যস্নতে যে সংস্কৃতি বর্ণিত হয়েছে তা বৈদিক সংস্কৃতি থেকে বিশেষ পৃথক নয়। জরথুষ্ট্রের পরেও হাওম যজ্ঞ চলেছিল।[১]

বৈদিক দেবতা বরুণই হলেন পারসীক ওয়ারুণ, গ্রীক ওয়ারণস এবং সকলের পূজ্য অসুর। প্রকৃতপক্ষে, বরুণই যে পারসীকদের অসুর মাজদা, একথা অনেকে অনুমান করেন। বরুণ আকাশের দেবতা, রাত্রির দেবতা; মিত্র দিবসের, উভয়েই একই সূর্যের পৃথক রূপ। মিত্র পারসীক মিথ্র, বরুণের সঙ্গে একাত্ম। পারসীকগণের কাছেও মিথ্র-র মর্যাদা অহুর মাজদার পরেই। হথামনীয় রাজত্বকালের মধ্য ভাগে মিথ্র বিশেষ মর্যাদার আসন পান। এরই সঙ্গে অনাহিতও (শুক্র গ্রহ, প্রেমের দেবতা) পূজা পেতে থাকেন। মৈন্য—ঋগ্বেদীয় দেবতা, ক্রোধের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; পারসীক ধর্মে এই মৈন্য বা মাইন্যু দুজন, একজন অহুর মাজদার পুত্র স্পেণ্টা মাইন্যু—সত্য ন্যায় ও জীবনের সঙ্গে জড়িত ও মঙ্গলময়। দ্বিতীয়জন অঙ্গ্র মাইন্যু হলো—মিথ্যা ও অমঙ্গলের সঙ্গী, শক্তির ধ্বংস, অন্যায় ও মৃত্যু।

জারক্সেস-এর রাজত্বকালের এক শিলালিপিতে দেখা যায়, হথামনীয় সাম্রাজ্যে দৈব উপাসনা বলপূর্বক দমন করা হচ্ছে। সে সময়েও জনগণের মধ্যে দেব-উপাসনা ছিল। সম্রাট আরটা জারক্সেস-এর সময়েই (৪০৪-৩৫৮ খ্রীঃ পূঃ) মিথ্র পূজা বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং অনাহিত পূজা প্রবর্তিত হয়। তৃতীয় আরটা জারক্সেস-এর সময়ে ৩৪২ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মিসর পুনরাধিকৃত হয়। শেষ সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস-এর সময়েই ৩৩০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। একে একে সুসা পার্শিপোলিশ একবাটনা প্রভৃতির পতন ঘটে। ৩২৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ব্যাকট্রিয়ার পতন হয়। পার্শিপোলিশ নগরী জয়ের সময় গ্রীকগণ ঐ নগরীকে

১. *History of Persian Literature* : Edited by Yunus Jaffery, pp. 62-63.

অগ্নিতে ভস্মসাৎ করে। পারসীকগণ কর্তৃক তৃতীয় দরায়ুস নিহত হন। সমগ্র পারসীক সাম্রাজ্য গ্রীকগণের অধিকারে আসে। আলেকজাণ্ডার সুসাতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি পারস্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং প্রাচীন আর্যদের কিছুকালের জন্য তা অভিভূত করে। গ্রীক অভিযানের ফলে, হখামনীয় রাজত্বকালে পারস্যে যে বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল এবং যেসব ধর্মগ্রন্থের প্রচার হয়েছিল তা সবই বিনষ্ট হয়।

গ্রীক রাজগণ :
৩৩০-২২৬ খ্রীঃ পূঃ

পার্শিপোলিশ-এ অবস্থিত বিশাল রাজকীয় গ্রন্থাগার ভস্মসাৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অবেস্তাগ্রন্থ লোপ পায়। প্লিনি লিখে গেছেন যে, অবেস্তা ২১টি খণ্ডে, এক লক্ষ চরণ বা স্তবকে লিখিত ছিল। সাসানীয় রাজত্বকালে বিখ্যাত জরথুষ্ট্রীয় যাজক তানসার দুঃখ করে বলেছেন, আলেকজাণ্ডার ২০,০০০ গো-চর্মের উপর লিখিত ১০০০ অধ্যায়ের অবেস্তা ভস্মীভূত করান। এই অবেস্তার একটি নকল রাজকীয় অর্থভাণ্ডার সাপিগান (সমরখন্দ)-এ রক্ষিত ছিল। সেটি গ্রীকরা স্বদেশে নিয়ে যায় এবং তাদের ভাষায় রূপান্তরিত করে। তিনি সম্ভবত এই অনুবাদ সম্পর্কেই লিখে গেছেন যে, হারমিপ্পাস (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) জরথুষ্ট্রের ২০ লক্ষ শ্লোকের উপর টীকা রচনা করেছিলেন।

এই দুটি অনুলিপি হারাবার পর, অবেস্তা পার্সীধর্মের যাজকদের মুখে মুখেই প্রথমত রক্ষা পায়। হয়তো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল কিছু কিছু লেখাও। প্রধানতঃ পার্শিপোলিশ-এর রাজ-যাজকগণই গ্রীক আক্রমণের পর পাঁচশত বৎসর ধরে এই প্রাচীন বিশ্বাস ও ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

পারস্য দেশের বর্তমান খোরাসান ও অষ্ট্রাবাদ প্রদেশের মধ্যে মিডিয়ার পূর্বে—পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা পার্থিয়া (গ্রীক শব্দ, সংস্কৃত নাম পার্থব) নামে একটি অঞ্চল ছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকেই পার্থভগণ ছিল যোদ্ধা ও যাযাবর জাতি। পার্থভ বা পহ্লভ নামে এই জাতি প্রাচীন ভারতেও পরিচিত

পার্থভ রাজগণ :
২২৬-২২০ খ্রীঃ পূঃ

ছিল, প্রাচীন পুস্তকেও এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পার্থিয়গণ দৃষ্টিভঙ্গিতে ও সহানুভূতিতে প্রথমে গ্রীকগণের সহায়ক ছিল, পরে গ্রীকদের হাত থেকে এরাই পারস্যকে উদ্ধার করে এবং জরথুষ্ট্রীয় ঐতিহ্যকে পুনঃস্থাপিত করে। পার্থভদের প্রথম যিনি রাজা হলেন, তিনি নিজেকে হখামনীয় বংশের বলে দাবী করেছিলেন। ২৫৯-২৪৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এই জাতি, আরসাসেস-এর নেতৃত্বে একটি

রাজ্য স্থাপন করে। তার ভ্রাতা তিরিদাতেস গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন; তিনি (আরসাসেস) গ্রীকদের পরাস্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অল্পকালের মধ্যে আরসাসেস-এর মৃত্যু হলে তিনিই ২২৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে পার্থিয়ার স্বাধীন রাজা রূপে ঘোষিত হন। এই বংশের বিশিষ্ট রাজা ছিলেন মিথ্রডাটেস (১৭০-১৩৮ খ্রীঃ পূঃ)। এই রাজা পার্থিয়ান সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন—পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোকে গ্রীকদের হাত থেকে মুক্ত করে। ৫১-৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সিরিয়া এই রাজ্য আক্রমণ ও জয় করে। সেই সময়ে এই সাম্রাজ্য ব্যাকট্রিয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদী এবং কাস্পিয়ান থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পার্থিয়দের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রায় ৩০০ বৎসর রাজত্ব করলেও এই রাজবংশ কোন সাহিত্য রেখে যায় নি। যোদ্ধা জাতি রূপে এরা যুদ্ধটাই ভালো জানত। হথামনীয়দের কাছ থেকে এই জাতি জরথুস্ত্রিয় ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সূর্য পূজার সঙ্গে মিথ্র ছিলেন তাদের প্রিয় দেবতা। পার্থিয়গণের রাজত্বকালেই রোম পরাক্রান্ত হয়ে গ্রীস জয় করে এবং পার্থিয়গণের সঙ্গে নানা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই পার্থিয়গণের রাজা ভলখাস (৫১-৭৮ খ্রীস্টাব্দ) সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করে-ছিলেন অবেস্তা পুনরুদ্ধার করে জরথুস্ত্র ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে। প্রায় দুই শতাব্দী পরে সাসানীয় বংশের প্রথম দুই রাজা সেই কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। পার্থিয়গণের শেষ রাজা আর্টাবানাস রোমানগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে ২১৭ খ্রীস্টাব্দে বিপুল অর্থ আদায় করে সন্ধি করতে বাধ্য করান। ২২০ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের এক করদ রাজা আরটা জারক্সেস বিদ্রোহ করে এবং কয়েকটা যুদ্ধের পর হরমুজ-এ আর্টাবানাসকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিহত করে।

আরটা জারক্সেস হথামনীয়গণের বংশধর ছিলেন বলে দাবী করেন। তিনি আরদেশির নামেই পরিচিত ছিলেন। এই নামেই তিনি পারস্যের সম্রাট হয়েছিলেন। তাঁর পিতা সাসান-এর নামানুসারেই রাজবংশের নাম হয় সাসানীয়। আরদেশির ও তৎপুত্র প্রথম সাপুর বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টাতেই গ্রীকগণ কর্তৃক বিনষ্ট অবেস্তার পুনরুদ্ধার হয়। আবেস্তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ রাজ-আদেশে সংগৃহীত হয়েছিল। ধর্ম-যাজকদের মুখে মুখে যে সকল শ্লোক ছিল তাহাও লিখিত হয়। এ ভাবেই অবেস্তা ও জান্দ পুনঃসংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়। সাসানীয়গণের ভাষা ছিল পহ্লভী। এই ভাষা পার্থভগণের শেষ দিককার ভাষা; পার্থভ থেকে পহ্লভ নামের উৎপত্তি। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে এই ভাষার প্রচলন ঘটে।

সাসানীয় রাজবংশ ঃ
২২০-৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ

এই ভাষা সেমেটিক ভাষার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এর বর্ণমালা ছিল সেমেটিক কিন্তু ব্যাকরণে এবং শব্দসম্ভারে ছিল আর্য। পার্থিয়গণের প্রাচীন রাজধানী ছিল টেসিফোন-এ, ব্যাবিলোনিয়ার সেমেটিক সংস্কৃতির পীঠস্থানের নিকটে। সুতরাং পহ্লভী ভাষায় সেমেটিক প্রভাব এসে পড়ে। অবেস্তার একটি নূতন সংস্করণ আর্তক্ষীর, পপকালের সময়ে ২২৬-২৪০ খ্রীস্টাব্দে পহ্লভী ভাষায় তানসার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পহ্লভী ভাষা হলো প্রাচীন পারসীক ভাষারই সাক্ষাৎ বংশধর।

সাসানীয় রাজত্বকালের শিলালেখ, মুদ্রা এবং মূল্যবান রত্ন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে, এর থেকে তৎকালীন ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তৎকালীন সাহিত্যও কিছু বেঁচে আছে। এই ভাষায় আর্য ও সেমেটীয় আরামাইক ভাষার মিশ্রণ লক্ষিত হয়।

পহ্লভী ভাষায়, সেমেটীয় আরামাইক ভাষা মিশ্রণকে হুজভারিস বলা হতো। পহ্লভী ভাষা থেকে হুজভারিস অংশ বাদ দিয়ে ঐ ভাষাকে সরলীকৃত করে এর নামকরণ হয় 'পাজান্দ'। সাধারণতঃ পহ্লভী ভাষাই ছিল রাজভাষা, লেখ্য ও কথ্যভাষা। অবেস্তা যখন পহ্লভী ভাষায় অনূদিত হয়, ভাষাসহ সেই অনুবাদকে বলা হতো জন্দ। কোরানে ব্যবহৃত আরবী অক্ষরে পহ্লভী লিখে পার্সী ভাষার সৃষ্টি।

ধর্মে, ভাষায়, সংস্কৃতিতেও পারসীকগণ যদিও প্রারম্ভে ছিল সপ্তসিন্ধুর (ভারতের) সাক্ষাৎ প্রতিবেশী, কিন্তু রাজধানী পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় আদান-প্রদান, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমের সঙ্গেই (ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, সিরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি) তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজকুলে গ্রীসের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হতে থাকে। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রথমাবধিই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ধর্মীয় বিবাদের ফলে। অবশ্য সাসানীয় রাজত্বকালে, বিদ্যাপ্রচারে বা শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়গণের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়।

সাসানীয়গণের রাজত্বকালে সাহিত্য, বিশেষ করে অনুবাদ সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। এই সময় সংস্কৃত ও গ্রীক সাহিত্যের প্রচুর অনুবাদ হয়েছিল। রাজা নসিরবান (৫৩১-৫৭৯ খ্রীস্টাব্দ) বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গুণ্ডি-ই-সাপুর-এ সাহিত্য একাডেমি স্থাপন করেন। ভারত, গ্রীস ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান থেকেও বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতেন। রাজা জাস্টিনিয়ান যখন এথেন্সে দার্শনিক বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ করে দেন ও দার্শনিকদের বিতাড়িত করেন, রাজা নসিরবান তখন তাঁর একাডেমিতে তাঁদের আশ্রয় দেন। তাঁর

আজার প্লেটো, আরিস্টটল প্রভৃতির পুস্তকসমূহ পহ্লভী ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদ থেকেই সিরিয়াক, হিব্রু এবং পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে এগুলি স্পেন ও ইয়োরোপে যায়। বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' এবং অন্যান্য বহু ভারতীয় পুস্তক এভাবেই অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কিত একটি পুস্তকও অনূদিত হয়েছিল। এই পুস্তকখানি 'বারলাম ও জোয়াসফত' নামে সমগ্র পারস্য ও সিরিয়ার মুসলিম ধর্মজগতে এবং সেখান থেকে ইয়োরোপেও পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম রাজত্বের সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয় বাগদাদে।

সাসানীয়গণ জরথুস্ট্রীয় মতাবলম্বী ছিলেন। অবেস্তার পুনরুদ্ধার ব্যতীত ঐ ধর্মাবলম্বনে আরও বহু পুস্তক রচিত হয়েছিল। পূর্বে অবেস্তার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা এই যুগেরই অবেস্তা। ভেন্দিদাদ ঐ সময়েরই রচনা। পার্সী ধর্মের প্রসিদ্ধ সংস্কারক মনি বা মানি সাসানীয় রাজত্বের প্রথমভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি এই ধর্মের মধ্যে খ্রীস্টীয় ধর্মের প্রভাব আনয়নের চেষ্টা করেন। তাঁর সম্প্রদায় মানিকীয় সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

পারস্যদেশ আরবগণ কর্তৃক বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই ধর্মবিশ্বাস চলে এসেছিল। ৮১৩-৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে খালিফা আল মামুন-এর সময় পর্যন্ত অবেস্তা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ৮৪৭-৮৬১ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আল মুতাবাক্কিল-এর রাজত্বকালে শুরু হয় বিধর্মীদের উপর নানা রকম অত্যাচার। ধর্মপুস্তক বিনষ্ট করাও শুরু হয়ে যায়। ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে মোগল আক্রমণকালে অবস্থা চরমে ওঠে এবং সমগ্র দেশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। এই সময় অবেস্তা ও অন্যান্য ধর্মপুস্তক সমূলে ধ্বংস করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে, প্রায় ৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে, একদল পার্সী তাদের ধর্মপুস্তকের কিছু অংশ সঙ্গে নিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে সমর্থ হন।

প্রথম থেকেই রোমের সঙ্গে যুদ্ধে সাসানীয় রাজগণ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরে শ্বেত হুনদের বারংবার আক্রমণে তারা একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। ৬৫২ খ্রীস্টাব্দে আরব আক্রমণে তারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত পহ্লভী ভাষা বেঁচে ছিল।

আর্য : ঋগ্বেদে

আর্যদের পূর্ববাসভূমি—ভারতের বাইরে অন্য কোন দেশে ছিল, সমগ্র বেদ পর্যালোচনা করলে এমন কোন আভাস পাওয়া যায় না। কোন এক জাতি এক দেশ থেকে অপর দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করলে অনেক পুরুষ ধরে পরিত্যক্ত দেশের স্মৃতি যেমন তাদের মনে জাগরূক থাকে, তেমনি পরিত্যক্ত দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিরও কিছু-না-কিছু তারা বহন করে আনে। কিন্তু এর কোন নিদর্শনই বেদ-চতুষ্টয়ে নেই। পুরাতন বাসভূমির কথা অন্ততঃ কিম্বদন্তী হিসাবেও মনে থাকার কথা। প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয়, ফিনিসীয়, রেড ইণ্ডিয়ান ও ইহুদী প্রমুখ জাতির (race) পূর্বপুরুষগণ যে বহিরাগত ছিলেন, সেই স্মৃতি তাঁদের মনে জাগরূক ছিল। বৈদিক বা ভারতীয় আর্যগণের মনে এমন কোন চেতনা দুর্লক্ষ্য। পক্ষান্তরে, সিন্ধু-সরস্বতী বিধৌত দেবকৃত যোনি (দেব নির্মিত দেশ —যোনি=জননেন্দ্রিয়) ঈশ্বর আর্যদের প্রাচীনতম বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, ঋগ্বেদে তেমন বর্ণনাই পাই (ঋগ্বেদ ৩. ৩৩.৪)।

বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ—ভারতীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ। এটি সত্যিই এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার, মহাসাগর তুল্য ; ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-সাহিত্য ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সনাতন উৎস। চারিটি বেদ-সংহিতাকে অবলম্বন করে সেই প্রাচীনতম কালেই বিশাল বেদ-সাহিত্য রচিত হয়েছিল। সংহিতা সমূহে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে ও সাহিত্যে 'আর্য' শব্দ অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই উৎস থেকেই পৃথিবী 'আর্য' শব্দের পরিচিতি লাভ করে। খ্রীস্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে, আচার্য যাস্ক ঋগ্বেদে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অর্থ সম্বলিত যে-নিরুক্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে 'আর্য' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন--অর্য থেকে আর্য। অর্য শব্দের অর্থ—ঈশ্বর বা প্রভু, আর্য—তৎপুত্র।

ঋষিগণের প্রবর্তিত ধর্মে, গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা ও অগ্নি হোম করা অবশ্য-কর্তব্য ছিল। ঋষিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম যাঁরা গ্রহণ করেছেন, যজ্ঞবিধি যাঁরা মেনে চলেছেন, তাঁরাই ঈশ্বরপুত্র বা আর্য। মহৎগুণ সম্পন্ন রাজাকেও আর্য বলা হয়েছে। যথা : "পুরুকুৎসের পুত্র এসদস্যুই দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর্য এবং সৎপতি (ঋ. ৮. ১৯. ৩৬)।" এখানে আর্য শব্দ নিশ্চয়ই জাতি বা ভাষাবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ঋ. ৮.১. ৩৪-এ শশ্বতী তাঁর স্বামীকে 'আর্য' সম্বোধন করেছেন। ঋ. ১০. ১১. ৪-এ আছে : "যখন আর্য মনুষ্যগণ সৌম্যমূর্তি দেবতাদের

আহ্বানকারী অগ্নিকে বেষ্টন করে অবস্থিত হন, তখনই স্তব উঠতে থাকে। অর্য অগ্নির পুত্রগণ—আর্য। আর্যের সঙ্গে যজ্ঞের নিকট সম্পর্ক। যজ্ঞের যজমানগণ আর্য" (ঋ. ১. ১৩. ৮)। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দেবতাদের নামের পূর্বে যেমন অসুর শব্দের ব্যবহার (বিশেষণ রূপে) দৃষ্ট হয়, তেমনি অর্য শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। বহু সূক্তে ইন্দ্রকে 'অর্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যথা: ঋ. ৮. ৬৩. ৭; ১. ৩৩. ৩; ৮.৫৪.৭; ৪.৩৪.৬; ৭.৪৮.৩, ৭.৩১.৫ প্রভৃতি। অর্য বরুণ ও মিত্র (ঋ. ৭.৬৫.২); অর্য বরুণ (৭.৮৬.৭); অর্য সবিতা (৬.২৪.৫); অর্য-বিশ্বদেব (১.১২২.১৪); অর্যপত্নী উষা (৭.৬.৫); অর্য বিভ্বা, ঋভুক্ষ, বাজ (৭.৪৮.৩) প্রভৃতি। সূর্যের অপর নাম হলো অর্যমন। ঋগ্বেদের ৫.৪.৬ ঋকে আছে: "হে অগ্নি, তুমি আর্যরূপ স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করে দস্যুকে বিনাশ করো।" অর্য অগ্নির পুত্র—আর্য। ঋগ্বেদের দেবগণের সন্তানগণ, অর্থাৎ উপাসকগণই আর্য। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়ণাচার্যের মতে—বুদ্ধি বা জ্ঞানালোকপ্রাপ্তির জন্য যার কাছে যেতে হয় তিনিই আর্য।

প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে আর্য শব্দের অর্থ করা হয়েছে—যারা গমনশীল বা জ্ঞানপ্রাপ্ত (ঋ+য) সুপ্রতিষ্ঠিত, সজ্জন, সাধু, কুলীন, মান্য, শ্রেষ্ঠ, সুসভ্য, উচ্চগুণশালী। সংস্কৃত অমরকোষ ব্যাখ্যা করেছেন—"মহাকুল, কুলীনার্য, সভ্য সজ্জন সাধবঃ।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমূহে, 'আর্য' শব্দ জাতিবাচক নয়, ধর্মাবলম্বী বাচক। আর্য বাক্ বা বাক্যের উল্লেখ ঐতরেয় ও সাংখ্যায়ন আরণ্যকে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের যুগে ধর্ম (যজ্ঞকর্মসহ) খুব সম্ভব সকল জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা, প্রতিদিন নিয়মিত হোম করা, নানা প্রকার নিয়ম পালন করা হয়তো সকলের পক্ষে সম্ভবপর হতো না। এই

দাস ও দস্যু

কারণে এইসব জনগণ আর্য আখ্যার অধিকারী ছিলেন না, সুতরাং অনার্য। ঋষিগণ ও পুরোহিতগণ অনার্যগণকে সহ্য করতে পারতেন না। অনার্যগণের মধ্যে যারা দেববিদ্বেষী ও অপর ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের দাস ও দস্যু আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে—দাস ও দস্যুগণ তারাই, যারা 'অন্যব্রত' 'অমানুষ' 'যজ্ঞ-রহিত' ও দেবদ্বেষী (ঋ. ৮.৭০.১০-১১, ১০.২২.৮, ১.৩৩.৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। অন্যব্রত-র অর্থ হলো বেদবিরোধী ব্রত, অর্থাৎ অপর ধর্মাবলম্বী। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে দাস ও দস্যুদের মধ্যে পার্থক্য করা দুষ্কর। হয়তো তারাই দস্যু, যারা সক্রিয় ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করত। কিকট, নিষাদ প্রভৃতি পার্বত্য জাতিগণ অনার্য ছিল।

পনিগণ (ঋগ্বেদের কালে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকগণ) সমাজে অর্থবলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেও যজ্ঞ করত না, গৃহে অগ্নি রক্ষা ও হোম করত না, অর্থগৃধ্নুতা ও কৃপণতার দরুন ঋষিগণ এদের পছন্দ করতেন না, তাই তাদের দাস ও দস্যু আখ্যা দিয়েছিলেন (ঋ. ৭.৬.৩)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনু-সংহিতায় এমন উল্লেখ আছে যে, আর্যগণ ধর্মভ্রষ্ট হলেও তাদের দাস বা দস্যু আখ্যা দেওয়া হতো।

ঋগ্বেদে কোথাও অনার্যগণকে ভিন্ন জাতি রূপে বর্ণনা করা হয় নি। যদু ও তুর্বাসাগোষ্ঠী কখনো আর্য কখনো অনার্য (ঋ ১০.৬২.১০, ঋ ৮.৬.৪৮ দ্রষ্টব্য) রূপে বর্ণিত হয়েছে। 'আর্য'-কে ঋগ্বেদে কখনো জাতি হিসাবে বর্ণনা না করে সর্বদাই আর্য বর্ণ বলা হয়েছে। আর্য, দাস, দস্যু—এ সবই হলো বর্ণ, জাতি নয়।[১] বৈদিক যুগে গুণ ও কর্ম হিসাবে 'বর্ণ' নির্ধারিত হতো। (বর্ণাবৃনোতে : নিরুক্ত)। 'বর্ণ' শব্দ এই জন্য প্রয়োগ করা হয় যে, যার যেরূপ গুণ ও কর্ম তাকে তদনুযায়ী অধিকার দেওয়া কর্তব্য। ঋগ্বেদের কালে জাতি শব্দ অজানা ছিল না; এর ব্যবহারও আমরা নানা সূক্তে পাই। জন্মসূত্রেই জাতি। দাসরাও বর্ণ, জাতি নয় (ঋ ২. ১২. ৪, ১০. ২২. ৮ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। (···যো দাসং বর্ণ মধুরং গুহাকঃ ২. ১২. ৪)। যারা আর্য নয় তারাই অনার্য। দাস ও দস্যুর ব্যাখ্যা ঋগ্বেদে আছে। আবার, আর্য-স্বার্থবিরোধী যারা, তাদেরও দাস বা দস্যু আখ্যা দেওয়া হয়েছে রূপক হিসাবে। রূপক অর্থে, উপমা হিসাবে—বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, নমুচি, শম্বর প্রভৃতিকে, যেহেতু তারা ঘন কালো মেঘে লুক্কায়িত থেকে বৃষ্টিপাত অবরোধ করত সেইহেতু ঋগ্বেদের বহু সূক্তে তাদের দাস ও দস্যু আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

বর্ণ ও জাতি

আর্যগণের সঙ্গে দাস ও দস্যুগণের যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। ইন্দ্র ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও পরাক্রমের দেবতা, সংগ্রামের দেবতা। আর্য রাজগণ

১. ঋগ্বেদ ৩।৩৪।৯ : "হত্বী দস্যূন আর্যং বর্ণং আবৎ।" হে ইন্দ্র, আপনি দস্যুগণকে হনন করে আর্যবর্ণকে রক্ষা করুন।

ঋ ১।১০৪।২ : "দেবগণ, দাসদের ক্রোধ বিনাশ করুন এবং আমাদের সুখের জন্য আমাদের বর্ণকে (বর্ণম) বৃদ্ধি করুন।"

অথর্ববেদ (১৯ কাণ্ড ৭ম অনুবাক, ৮ম সূক্ত) : 'হে জগদীশ্বর, দেবগণের মধ্যেই প্রিয় বিধান করিও না ; রাজন্যবর্গেই যেন তোমার প্রীতি আবদ্ধ না থাকে' প্রত্যুতঃ সকলের প্রতিই সমভাবে প্রীতি দৃষ্টি কর়ো—কি শূদ্র বর্ণকে, কি আর্য বর্ণকে (শূদ্র উতার্যে)।"

—দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক অনূদিত।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বে জয়লাভের কামনায় যজ্ঞ করে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। রাজগুরু, ঋষি ও পুরোহিতেরা সময়ে সময়ে যুদ্ধযাত্রায় রাজার অনুগামী হতেন।

ইন্দ্র কেবলমাত্র সংগ্রামের দেবতা ছিলেন না; তিনি ধনপতি, ঐশ্বর্যের এবং বৃষ্টিরও দেবতা। সপ্তসিন্ধু ছিল কৃষিপ্রধান, বৃষ্টিনির্ভর দেশ। ধন-দৌলত ও বারি বর্ষণ প্রর্থনা করে ইন্দ্রের কাছে স্তব করা হতো, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। সেই কারণে দেখা যায়, ঋগ্বেদে দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের নামেই সর্বাপেক্ষা অধিক মন্ত্র নিবেদিত হয়েছে।

আর্যগণ যে পৃথক জাতি নয়, দাস ও দস্যুর সঙ্গে তাদের যে জাতিগত পার্থক্য ছিল না, ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত কতিপয় সূক্ত ও ঋক থেকেই তা প্রতীয়মান হবে। উক্ত ঋক সমূহের কয়েকটির বাংলা অনুবাদ নিয়ে দেওয়া হলো:

ঋ ১.৫১.৮-৯: "কারা আর্য, কারা দস্যু অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদের শাসন করে বশীভূত করো। যজ্ঞ-বিমুখদের, যজ্ঞপ্রিয় যজমানদের বশীভূত করো। হে জীব তুমি আর্য, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; দস্যু অর্থাৎ দুষ্টস্বভাবযুক্ত চোর-তস্করাদিরূপ প্রসিদ্ধ নামধারী মনুষ্যগণের যে ভেদ আছে তাহা জ্ঞাত হও।"

(দয়ানন্দ-শঙ্করানন্দ কর্তৃক অনূদিত)

ঋ ৯. ৬৩. ৫.: "ইন্দ্রের মহিমাকে বৃদ্ধি করো। বিশ্বকে আর্য কর।" (কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্)।

ঋ ১০. ৮৬. ১৯: "এই আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে আসছি। দাস ও আর্য অন্বেষণ করছি। যারা যজ্ঞান্ন পাক করে অথবা সোমরস প্রস্তুত করে, তাদের নিকট সোমরস পান করছি। সুবুদ্ধি কে তা আমি ঠিক করেছি। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।"

ঋ ১০. ৪৯. ৩: "…আমি দস্যুদের আর্য নাম হতে বঞ্চিত রেখেছি।"

ঋ ১০. ২২. ৮.: "আমাদের চতুর্দিকে দস্যুরা আছে; তারা যজ্ঞকর্ম করে না, তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মানুষের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী, তাদের নিধন করো। সেই দাস বর্ণকে হিংসা করো।" দাস ও দস্যুগণ—"অন্যব্রতম্, অমানুষম্, অযজ্বানম্, অদেবায়ুম্"।

ঋ ৮. ৭০. ১০-১১: "হে ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞাভিলাষী, যে তোমার নিন্দা করে তার ধন অপহরণ করে তুমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করো। হে তর্পণীয়, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র, তুমি উরুদ্বয়ের মধ্যে আমাদের আচ্ছাদিত কর এবং অস্ত্র দ্বারা দাসকে মেরে ফেল। হে ইন্দ্র, তোমার সখা পর্বত অন্যরূপ ব্রতধারী, অমানুষ,

যজ্ঞরহিত, দেবদ্বেষী ব্যক্তিকে স্বর্গ হতে নিম্নে নিক্ষেপ করেন, তিনি দস্যুকে মৃত্যুর হস্তে প্রেরণ করেন।"

ঋ ৭. ৮২. ১ : "যে শত্রু দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা দুরভিসন্ধি বিশিষ্ট সেই শত্রুগণকে যুদ্ধে জয় করব।"

ঋ ১. ৩৩. ৫ : "হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞরহিত ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধীগণ মস্তক ফিরিয়ে পালিয়েছে।"

আর্যগণ যদি ভিন্ন জাতি হতো, অর্থাৎ তাদের শারীরিক গঠন ও আকৃতি অন্যরূপ হতো, ভাষা পৃথক হতো, তাহলে কে আর্য, কে অনার্য, দাস বা দস্যু, তা ঠিক করতে চারিদিকে এত নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হতো না। দেখা যাচ্ছে যে, যারা যজ্ঞান্ন পাক করে অথবা সোমরস প্রস্তুত করে, অর্থাৎ আর্য কর্মাদি অনুষ্ঠান করে, তারা দাস-দস্যু হলেও ইন্দ্র তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে পারতেন, অর্থাৎ দস্যু আর তখন দস্যু থাকত না—আর্য হয়ে যেত। 'আর্য' যদি পৃথক জাতি হয়, বিশ্বের সকলকে তবে আর্য করা যায় কিরূপে? গুণ ও কর্মানুসারে আর্যত্ব অর্জন করা যায় বলেই এই গুণ ও কর্ম যার থাকে না সে আর্য নাম থেকে বঞ্চিত হয়। দাস ও দস্যুরা তাই এই নাম থেকে বঞ্চিত। দাস ও দস্যুদের বিরাগভাজন ও বধার্হ হবার কারণই হচ্ছে তারা যজ্ঞ করে না, দেবতা মানে না, ঋষিগণ প্রবর্তিত কর্ম করে না বরং বিরোধিতা করে, তাই তারা মানুষ নয়। যজ্ঞহীন যারা তাদের দিয়ে যজ্ঞকর্ম করাতে পারলেই, বশীভূত করাতে পারলেই সে আর দস্যু থাকে না। দেখা যায়, আর্যগণ দস্যুদের ভয় করত, ইন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা করত, দস্যুদের বিনাশ কামনা করত।

ঋ ৮. ৫১. ৯ : এই ঋকে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক অনার্যই আর্যদের দ্বারা ক্রমে বশীভূত ও শিক্ষিত হয়ে আর্যধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল ও ইন্দ্র প্রভৃতিকে স্তুতি করত।

ঋ ১. ১৩০. ৮ : "ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য যজমানকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মানুষের জন্য ব্রতরহিত ব্যক্তিদের শাসন করেন।"

ঋ ৫. ৩৪. ৬ : "বিশ্বের দমনকারী ভীষণ অর্য ইন্দ্র, দাসকে বংশের ন্যায় নত করেন।"

ঋ ৬. ১৮. ৩ : "হে ইন্দ্র, তুমি দস্যুদের শীঘ্র স্ববশে এনেছ।"

ঋ ৬. : "হে অগ্নি, যেসকল ব্যক্তি সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে তোমাকে হব্য প্রদান করে না তারা নিরতিশয় বলশূন্য হয়, আর যারা অন্যরূপ (অবৈদিক) ব্রত অনুষ্ঠান করে তারা তোমার বিদ্বেষভাজন ও তোমার দণ্ডনীয় হয়।"

উক্ত ঋকগুলিতে উচ্চারিত—শাসন করা, নত করা, স্ববশে আনা, নিস্তেজ করা প্রভৃতি কথায় যজ্ঞবিহীনদের যজ্ঞরত করাই অনুমিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকগণ অর্থাৎ পনিগণ, ঋগ্বেদের যুগে অর্থবলে সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থান করলেও যজ্ঞাদি কর্ম করত না বলে অনার্য, দাস ও দস্যু পর্যায়ভুক্ত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি মাত্র ঋক নিয়ে উদ্ধৃত হলো, যদিও ঋগ্বেদের বহুস্থলে পনিদের উল্লেখ আছে :

ঋ ১.১৮২.৩ : "হব্যশূন্য যে ব্যক্তি পূজনীয় হয়েছে, তাকে পরাভূত করো। পনির প্রাণ বিনাশ করো।"

ঋ ৪. ২৫. ৭ : "অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্র, সোমাভিষব কর্মরহিত ধনবান পনির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন না। তিনি তাঁর বিফল ধন হ্রাস করেন ও নাশ করেন।"

ঋ ৭. ৬. ৩ : "হে অগ্নি, যজ্ঞরহিত, জল্পক, হিংসিত বাক্, শ্রদ্ধারহিত, বৃদ্ধি-শূন্য, পনি নামক যজ্ঞহীন সেই দস্যুদের বিদূরিত করুন।"

ঋ ৬. ৫১. ১০ : "তুমি ভোজনপটু পনিকে সংহার করো ; কারণ সে প্রকৃতই বৃক।"

ঋ ৬. ১৩. ৩ : "পনির শক্তি হরণ করো।"

ঋ ১০. ৬০. ৬ : "যে সকল ব্যবসায়ী (পনীন্‌অক্রমি) নিতান্ত কৃপণ, কখনো দান করে না, তাদের সকলকে পরাভূত করো।"

উপরোক্ত সূক্ত সমূহে পনিগণ দাস ও দস্যু পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু বৃবু নামক পনি (ঋ. ৬. ৪৫) দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে ঋষিগণের স্তুতিভাজন হয়েছিলেন। তাই অনুমিত হয়, সকল পনিই অনার্য ছিলেন না। ৮. ৪৫. ১৪ ঋকে স্বয়ং ইন্দ্রকে পনি বলা হয়েছে।

সেকালে অনার্যদের সঙ্গে, দাস ও দস্যুদের সঙ্গেই যে আর্যদের যুদ্ধ হতো তা নয়, আর্যে-আর্যে যুদ্ধেরও উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ দশরাজ্ঞ যুদ্ধ এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তৃৎসু রাজ সুদাস দশজন রাজার মিলিত শক্তিকে পরাজিত করেছিলেন। এই দশ রাজার মধ্যে পুরু বংশের রাজা সহ অন্ততঃ পাঁচজন ছিলেন আর্য রাজা। সুদাসের পক্ষে ঋষি ছিলেন বশিষ্ঠদেব এবং বিরুদ্ধ পক্ষে ঋষি ছিলেন বিশ্বামিত্র, উভয় ঋষিই সেকালে বিখ্যাত ছিলেন। উভয়েরই জয় কামনায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনামূলক মন্ত্র ঋগ্বেদে শোনা যাচ্ছে। আর্যে-আর্যে এরূপ সংগ্রাম হরিওপিয়া-তেও (হারাপ্পা ?) হয়েছিল—সম্রাট অভ্যবর্তী এবং বরশিখ বংশের বৃচিবানদের মধ্যে। সুশ্রব নামক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ২০ জন রাজা, ৬০,০০৯ জন সৈন্যসহ এসেছিলেন (ঋ ১. ৫৩. ৯)।

এই সব রাজারা সম্ভবতঃ আর্যই ছিলেন।

ঋগ্বেদের ৬. ৩৩. ৩-এ আছে: "হে বীর ইন্দ্র, তুমি কি-দস্যু কি-আর্য, উভয়বিধ শত্রুই সংহার করেছ।"

ঋ ১০. ৮৩. ১: "হে মন্যু...যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্যা করে, সে সর্বদা সর্ব প্রকার তেজ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহায় পেয়ে আমরা যেন দাস ও আর্য উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারি।"

ঋ ১০. ১০২. ৩: "দাস হোক—আর্য হোক, উহাকে অপ্রকাশ রূপে বধ করো।" এই সূক্ত ইন্দ্রের নিকট যুদ্ধজয়ের প্রার্থনা মাত্র। যে অনিষ্টকারী, সে দাস হোক আর আর্য হোক—বধার্হ। প্রার্থনাকারীর মাধ্যমে ইন্দ্র নিজেই যেন যুদ্ধ করছেন।

দেবরাজ ইন্দ্র শুধু শৌর্য-বীর্যের দেবতা নন, রণক্ষেত্রে জয়ের দেবতা নন, তিনি বৃষ্টি দানের দেবতা, ধনৈশ্বর্যেরও দেবতা, এর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

মেঘরূপী দাস ও দস্যু

বৈদিক ভারতে নদীর প্রবাহ, ভূমির উর্বরতা, ধান, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্যের উৎপাদন, মানুষের জীবন ও সুখ-সমৃদ্ধি, সবই প্রায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করত। মেঘপুরকে বিদারিত করে, বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে ভূমি উর্বরা ও শস্যশ্যামলা করানো এবং নদীতে জলরাশি প্রবাহ রূপে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ জন্যেই তিনি ছিলেন আর্যদের প্রিয় দেবতা। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির সব চাইতে বড় অংশ, তাঁরই প্রশস্তিতে নিবেদিত হয়েছে। ইন্দ্র-স্তুতির অধিকাংশ সূক্তে এই ভূমিকার উল্লেখ কোন-না-কোন প্রকারে আছে। এই ভূমিকা পালনেই ইন্দ্রকে দাস, দস্যু, অসুর, দানব প্রভৃতি অনার্যগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বারংবার অবতীর্ণ হতে হয়েছে। যে-শক্তি মেঘের মধ্যে বারিকে অবরুদ্ধ করে রাখে, তাকেই ঋষিগণ দাস-দস্যু-অসুর বা দানব রূপে কল্পনা করে নিয়েছেন। তাদের মানব-কল্যাণের শত্রু রূপে কল্পনা করেই ঐরূপ আখ্যা দিয়েছেন। মেঘের মধ্যে বারিধারা পুষ্ট হলে, এই অশুভ শক্তিই বর্ষণ বন্ধ করে নদীগুলোকে প্রবাহিত হতে দেয় না। মেঘ স্তূপগুলো কালো কালো প্রস্তর-বেষ্টিত যেন এক-একটি পুর। এইসব পুরে দাস-দস্যু-অসুর ও দানবগণ লুক্কায়িত থাকে। এখানে ইন্দ্রকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। অপরাপর সংগ্রামে ইন্দ্রের ভূমিকা থাকত অপ্রত্যক্ষ। এইরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হতো একটি দুটি নয়, অসংখ্য। একা ইন্দ্র হয়তো পেরে উঠতেন না, তাই ঋগ্বেদে দেখতে পাই—অগ্নি, বরুণ, বৃহস্পতিও ঐসব দানব বধ করছেন; এক-একটি দানব-দস্যুকে একবার হত্যা করলে চলত না, বারে

বারেই নিহত করবার প্রয়োজন হতো। দনুপুত্র বৃত্র ছিলেন মহাদানব। তার জল অবরোধকারী মেঘরূপী পুর সমূহ দেবরাজ ইন্দ্র বিদীর্ণ করে, বৃত্রকে বজ্র নিক্ষেপে (আকাশে মেঘ-গর্জন যেন বজ্রপাত) নিহত করে, সপ্তসিন্ধু (সিন্ধুনদী, তার বড় বড় উপনদী, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা) বইয়ে দিয়েছিলেন। এই সপ্তসিন্ধু-অঞ্চলেই মানবগণের প্রথম বাস। বৃত্র আর্যগণের শত্রু, তাই দাস ও দস্যু রূপে চিত্রিত হয়েছে (ঋ ১০. ৬৯. ৬, ১. ৩৩., ৫. ৩০. ৫, ৫. ৩২, ২. ১১. ২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। বৃত্রকে হনন করেই ইন্দ্র বৃত্রহা বৃত্রহান বৃত্রঘ্ন নামে পরিচিত হয়েছেন। বৃত্র জল অবরোধকারী মেঘ মাত্র (যাস্কের নিরুক্ত, সায়ণের টীকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। আধ্যাত্মিক দিক থেকে বৃত্র বধের অর্থ—তমঃ হরণ, অন্ধকার নাশ। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবগণের নামের পরেই বৃত্র নামের বহুল প্রচার; অগণিত সূক্তে এই নাম ছড়িয়ে আছে। বৃ ধাতু থেকে বৃত্র, আবরণার্থে; লোক সমূহের অতিশয় আবরক অন্ধকার রূপ বৃত্র বা মেঘ—প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়ণ এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। ঋগ্বেদে এরূপ রূপক ও উপমা ঘটিত গল্পের ছড়াছড়ি। যথা: ১. বল নামক অসুর, সব গাভীকে পর্বতে অপহরণ করে রেখেছিলেন। ইন্দ্র সেই অসুরকে বধ করে গাভীগণকে মুক্ত করে। এখানে গাভী অর্থে মেঘ বা জল। ২. পনি দস্যু কর্তৃক গাভী অপহরণ, কুক্কুরী সরমাকে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্তিকরণ, মরুৎগণের সহায়তায় গাভীগণের উদ্ধার (ঋক ১. ৬. ৫)—এটি একটি প্রাতঃকালীন প্রকৃতি সম্পর্কিত উপমা মাত্র। এখানে গাভীগণ হচ্ছে সূর্যরশ্মি, সরমা—উষা। ৩. অশ্বিনীদ্বয় কর্তৃক বৃক-এর মুখ থেকে বর্তিকা পক্ষীর উদ্ধার, অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে আলোর প্রকাশ। উষার পূর্বেই অশ্বিনীদ্বয়ের উদয় হয়। ৪. দুটি পক্ষী বন্ধুভাবে এক বৃক্ষে বাস করে, তাদের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে—অন্যটি করে না, কেবলমাত্র অবলোকন করে (ঋ ১. ১৬৪. ২০)—এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুই পক্ষী বলা হয়েছে।

ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্র প্রভৃতি দাস-দস্যু-দানবগণের নিধন সম্পর্কিত কয়েকটি মাত্র ঋকের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো:

ঋ ৩. ৫৩. ১১: ইন্দ্র বৃত্রকে এক স্থলে নয়, উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে বধ করেছিলেন। ঋ ১. ৮৪. ১৩.: নবনবতিবার বৃত্র সংহার করেছিলেন, অর্থাৎ বর্ষাকালের নবনবতি দিবস (৯৯ দিন) মেঘ থেকে জল বর্ষণ করিয়েছিলেন। ঋ ১. ৩৩. ১৩: ইন্দ্র বৃত্রের পুর সমূহ বিবিধ রূপে ভেদ করেছিলেন। এই সব থেকে অনুমতি হয় যে, বৃত্র একজন ছিলেন না, বৃত্র বহুজন।

তার পুর সমূহও ছিল অসংখ্য।

ঋ ৫. ৩২. ৩ : বৃত্রের ক্রোধ হতেই অধিকতর বলশালী শুষ্ণ দানবের জন্ম। শুষ্ণং ভূতানাং ক্লেশ হেতু এতন্নামকং অসুরং—ইতি সায়ণ। শুষ্ণং জগত শোষকং বৃত্রং—ইতি যাস্ক। ঋ ১. ৫১. ১১ : "ইন্দ্র শুষ্ণের বিস্তীর্ণ পুর সমূহ ধ্বংস করেছিলেন।" শুষ্ণ—জলশূন্য মেঘ ও অনাবৃষ্টির দানব। ঋ ১.৩২.১ : ইন্দ্র, অহিকেও বিদীর্ণ করেছিলেন 'অহিম্ অহন'। (অহিং মেঘং—ইতি সায়ণ)। তৎ-পর বারিরাশি ভূমিতে পাতিত করেন, পর্বত ভেদ করে নদী পথসমূহকে প্রবাহিত করেন। (বৃত্র ও অহি একই, এই স্থক্তেরই ৫ম ঋক দ্রষ্টব্য)। ঋগ্বেদের ১. ৩৩. ১০ ঋকে উল্লেখ আছে : "যখন জল পৃথিবীর প্রাপ্ত হলো না এবং ধনপ্রদ ভূমিকে উপকারী দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করল না, তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র হাতে বজ্র ধারণ করলেন এবং দ্যুতিমান বজ্র দ্বারা অন্ধকার রূপ মেঘ হতে পতনশীল জল নিঃশেষিত রূপে দোহন করলেন।" ঐ স্থক্তেরই ১২ ঋকে পাই—ইন্দ্র ইলীবিশ-এর প্রবল সৈন্য বিদ্ধ করেছিলেন এবং শৃঙ্গযুক্ত শুষ্ণকে বিবিধ প্রকারে তাড়না করেছিলেন। টীকাকার সায়ণ, ইলীবিশ ও শুষ্ণ এ দুটিকেই বৃত্রের বিশেষণ রূপে বর্ণনা করেছেন। "ইলীবিশস্য ইলায়া ভূমের্বিলে শয়ানস্য বৃত্রস্য।" (অন্ন হচ্ছে বিল-এর নির্গমন পথ। অন্নের হেতুভূত জলের নির্গমন পথ রোধ করে যে শুয়ে থাকে, সেই ইলীবিশ)। বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, ইলীবিশ—এই ধরনের দাস, দস্যু ও দানবের নাম ঋগ্বেদে আরও দেখতে পাই, যথা : নমুচি (জলহারা মেঘ), পিপ্রু, শম্বর, চুমুরী ধুনি, উরণ, কুযব, বর্চি, অর্বুদ প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এইসব নাম মেঘের, দাস-দস্যুর নয়। ঋগ্বেদের বৃত্র, শম্বর, নমুচি প্রভৃতি উপমা অবলম্বন করেই পৌরাণিক নানা উপাখ্যান রচিত হয়েছিল। পুরাণ সমূহে, মহাভারতে ও বিভিন্ন কাব্যে এইসব অসুর বা দানব অমর হয়ে রয়েছেন। মানুষের শত্রু, জলনিরোধক পূর্বোক্ত অসুররূপী মেঘের উল্লেখ আমরা সামবেদের বহুস্থলেই পাই। সামবেদের ২০৭, ২১১, ২৩৪, ২৫৪, ৩১৫ প্রভৃতি মন্ত্রগুলির এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষরূপী দাস, দস্যু, অসুর ও দানব নামের উল্লেখ ঋগ্বেদে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

আর্যগণ ছিল একটা জাতি এবং কোন এক সুদূর অতীতে তাদের আদিম নিবাস থেকে তারা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল—এই মতবাদ ও বদ্ধমূল ধারণা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেককেই ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই কারণেই কল্পিত জল অবরোধক অশুভ শক্তি, রূপক হিসাবে ব্যবহৃত মেঘপুর নিবাসী বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, নমুচি, শম্বর প্রভৃতিকে উপরোক্ত

পণ্ডিতগণ প্রকৃত মনুষ্যরূপে (প্রথমে ভারতের আদিম মানুষ—অনার্য, দাস-দস্যু, রাজা বা দানব রূপে, পরে হারাপ্পা-সভ্যতা আবিষ্কারের পর ঐ সভ্যতার ধারক ও বাহক মানুষ রূপে) এবং পুর সমূহকে প্রকৃত প্রাচীর বেষ্টিত ইষ্টক, প্রস্তর নির্মিত সুরক্ষিত নগরী রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এই ব্যাখ্যাই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই কারণেই বর্তমান অধ্যায়ে এই সম্পর্কিত আলোচনাটি একটু বিশদভাবে করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মনীষী শ্রী অরবিন্দ বলেছেন : "বেদ রহস্যময়। ভাষা, কথার ভঙ্গী, চিন্তার গতি, অন্য যুগের সৃষ্টি, অন্য ধরনের মনুষ্যবুদ্ধি সম্ভূত। এই ভাষার অর্থ এমনি সন্দিগ্ধ যে, মূল চিন্তা ও ছত্রে ছত্রে ব্যবহৃত সামান্য কথা লইয়াও প্রাচীন কাল হইতে তর্ক ও মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।"

পৃথিবীতে প্রতি বৎসর এমন সময় বা ঋতু আসে, যখন বৃত্র নিজ নামে অথবা শুষ্ণ, শম্বর প্রভৃতি আখ্যায় অতিশয় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সূর্য, সূর্যরশ্মি ও উষাকে অবরুদ্ধ করে রাখে; ফলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, জীব-জগৎকেও অত্যন্ত বিপন্ন করে তোলে। ঐ সময়ে ইন্দ্রকে ও তাঁর সাহায্যকারী-গণকে (বিষ্ণু, অগ্নি, বৃহস্পতি, মরুৎ প্রভৃতি) ঐগুলো মুক্ত করবার জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য, বৃত্রের সঙ্গে কঠিন ও কষ্টসাধ্য সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। ইন্দ্রাদিকে এইসব যুদ্ধে লিপ্ত করাবার জন্য আর্যগণ বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ—নবগ্র সত্র, রাত্রি সত্র প্রভৃতি সযতনে অনুষ্ঠান করতেন। যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে আছে (নিরুক্ত নৈগমাকাণ্ডম ২. ১৬) : "কে বৃত্র ?" নৈরুক্তকারগণ বলেন—মেঘ। ঐতিহাসিক-গণ বলেন, ত্বষ্টা পুত্র (ত্বষ্টা—সৃষ্টি কর্তা) এক অসুর। বৃষ্টিপাত শুরু হয় জল ও আলোকের সংমিশ্রণে। এটিকেই রূপকাকারে সংগ্রাম বলে কল্পিত হয়। এই সংগ্রাম সংঘটিত হতো বর্ষাকালে। বর্ষা শরতে বিলীন হয়। বৃত্রের দুর্গগুলিকে এই জন্য শারদী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বর্ষার দিনগুলি সংখ্যায় ৯০, ৯৯, ১০০ প্রভৃতি যেন মেঘপুর ; মেঘে আচ্ছন্ন।

ঋগ্বেদের বহু সূক্তে মেঘগুলোকে অন্ধকার রূপে অভিহিত করা হয়েছে। যথা : ঋ ১.৩৩.১০ : তমসো গঃ অদৃক্ষাৎ ; ঋ ১.৫৪.১০ : অন্ধকার বৃষ্টির ধারা রোধ করেছিল, বৃত্রের জঠরের ভিতর মেঘ ছিল ; ঋ ১.৫৬.৪-৫-৬ ও ১.৩৮.৯ : মরুৎগণ, উদকধারী পর্জন্য, মেঘ দ্বারা দিবালোককেও অন্ধকার করছেন, পৃথিবী জলে সিক্ত করছেন ; ঋ ৫. ৩২ : অপূর্ব অমোদি ; ঋ ৫.৩২.৪ : শুষ্ণ অন্ধকারে বিচরণ করত ; ঋ ৫.৭২.৫ : অন্ধকার মধ্যে যুদ্ধপ্রদানে উদ্যত বৃত্রকে...; ৫.৩২.৬ :

বৃত্র জল মধ্যে শয়ন করে প্রগাঢ় অন্ধকারে উদ্ভাসিত ছিল ; ঋ ৫. ৩২. ৮ : বৃত্র সকল জগৎ আচ্ছন্ন করে যৎকালে অবস্থান করেছিল।

ইন্দ্র কর্তৃক মেঘপুর নিবাসী দস্যুদানব বৃত্র প্রভৃতি নিহত করার কাহিনী ঋগ্বেদের অগণিত সূক্তে ছড়িয়ে আছে। এই সব দস্যুদানব যে কল্পনাপ্রসূত, পূর্বে দু'চারটি সূক্তের উল্লেখ করে তা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিয়ে আরও কয়েকটি সূক্তের প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো :

ঋ ৫. ৩২. ১ : হে ইন্দ্র, তুমি মেঘকে বিদীর্ণ করে জল নির্গমন মার্গ উন্মুক্ত করেছ, তুমি রুদ্ধ জলসমূহকে মুক্ত করেছ, তুমি প্রকাণ্ড মেঘের দ্বার উদ্ঘাটিত করে বৃষ্টিধারা পাতিত করেছ এবং দনুর পুত্র বৃত্রকে সংহার করেছ।

বৃত্র হননের পূর্ণ বর্ণনা আমরা ১. ৩২ সূক্তে পাই। ইন্দ্র, বৃত্র ও অহিকে (একই দানব বা দস্যু) হনন করে 'সপ্তসিন্ধুতে প্রবাহ ছেড়ে দিয়েছেন', (১২ ঋক : সর্তবে সপ্তসিন্ধুন)।

ঋ ১. ৩৩. ৭ : "হে ইন্দ্র, এই সকল পলায়নপর বৃষ্টিপ্রদানরূপ রোদনকারী মেঘগর্জনরূপ হাস্যকারী মেঘবাসীদের দিগন্তে যুদ্ধের দ্বারা নিহত করেছ। উচ্চে অবস্থিত মেঘকে (দস্যুমচ্চা) আকাশের মধ্যে চূর্ণিত করলে এবং তাহার দ্বারা সোম অভিষবকারী স্তোতার কামনা উত্তমরূপে রক্ষা করলে।"

ঋ ২. ১৪. ২ : হে অধ্বর্যুগণ, যে ইন্দ্র জল আবরণকারী বৃত্রকে অশনি দ্বারা বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ করেছিলেন…৩ : দৃভিককে বিনাশ করেছিলেন, যিনি বলপূর্বক অবরুদ্ধ গাভী সকলকে (গো=জল) উদ্ধার করে তাকে বধ করেছিলেন…৪ : যে ইন্দ্র, নবনবতি বাহু প্রদর্শনকারী উরণকে বিনাশ করেছিলেন এবং অর্বুদকে অধোমুখ করে বিনাশ করেছিলেন…৫ : যে ইন্দ্র, স্বশ্নকে বিনাশ করেছিলেন, যিনি অশোষণীয় শুষ্ণকে স্কন্ধহীন করে হত্যা করেছিলেন, যিনি পিপ্রু, নমুচি ও রুধিক্রাকে বিনাশ করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য অন্ন প্রদান কর…৬ : হে অধ্বর্যুগণ, যে ইন্দ্র প্রস্তরের ন্যায় বজ্র দ্বারা শম্বরের অতি পুরাতন একশত পুরী (শতং শম্বরস্য পুরো) ভেদ করেছিলেন এবং যিনি বর্চির শত সহস্র পুত্রকে ভূমিতে পাতিত করেছিলেন…ইত্যাদি।

এই ১৪ সূক্তেই দশটি জল অবরোধকারী মেঘপুর নিবাসী দস্যুর নাম পাওয়া যাচ্ছে।

ঋ ১. ৫৯. ৬ : "…বৈশ্বানর অগ্নি দস্যুকে হনন করেছেন, বৃষ্টির জন্য নিম্নে প্রেরণ করেছেন এবং শম্বরকে ভেদ করেছেন।" এখানে ইন্দ্রকে বৈশ্বানর অগ্নি বলা হয়েছে।

ঋ ১০. ১০১. ২ : "যে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ কোপের সঙ্গে বিগত ভুজ বৃত্রকে হত করেছিলেন, যিনি শম্বরকে ও যজ্ঞরহিত পিপ্রুকে বধ করেছিলেন, যিনি দুর্জয় শুষ্ণকে সমূলে হত করেছিলেন…।"

ঋ ১. ১৩০. ৭ : হে যুদ্ধকালে নৃত্যকারী ইন্দ্র, তুমি হবিপ্রদায়ী পুরু অতিথিজ্ঞ রাজার জন্য নবনবতি সংখ্যক পুর নষ্ট করেছিলে। হে নৃত্যশীল ইন্দ্র, বজ্র দ্বারা নষ্ট করেছিলে। হে উগ্র ইন্দ্র, অতিথি সেবক দিবোদাস রাজার জন্য পর্বত হতে শম্বরকে নিয়ে নিক্ষেপ করেছিলে এবং রাজা দিবোদাসকে স্বীয় শক্তি দ্বারা অগাধ ধন দান করেছিলে, এমনকি সমস্ত ধন দান করেছিলে।

ইয়োরোপীয় বহু পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের মতে, শম্বর নামে একজন অনার্য দস্যু বা দাস রাজা ছিলেন। তিনি অসুর রূপেও খ্যাত ছিলেন। আর্যদের দেবতা ইন্দ্র, এই অনার্য রাজাকে সংগ্রামে নিহত করে তার নিরানব্বইটি নগর দখল করেন। ইন্দ্র আর্য নরপতি দিবোদাস বা অতিথিজ্ঞ রাজাকে সেই নগরগুলো দান করে ভারতে আর্যদের উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

রহস্যময় বেদের ভাষা, কথার ভঙ্গী, চিন্তার গতি, বৈদেশিক পণ্ডিতগণ সম্যক ধারণা করতে পারেন নি বলেই এরূপ অপব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে।

এই শম্বরের পুর সমূহ ইন্দ্র কর্তৃক বজ্র হেনে ধ্বংস করার বৃত্তান্ত ঋগ্বেদের বহু সূক্তে, যথা—১০. ১৩০. ৭, ২. ১৪. ৬, ২. ১৯. ৬, ৭. ৩১. ৪, ৮. ৯৩. ২ প্রভৃতিতে আছে।

ঋগ্বেদের বহু সূক্তেই মেঘকে পুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে গিরি ও পর্বতকেও মেঘ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গো-র অর্থ জল বা সূর্যরশ্মি। শম্বর শব্দের অর্থ হচ্ছে—শম=জল ; বর=লুক্কায়নকারী, অর্থাৎ যে লুকিয়ে থাকে। শম্বর হলো জল বা মেঘমধ্যে লুক্কায়নকারী অশুভ শক্তি। শম্বরকে নিহত করার সহজ অর্থ—মেঘমধ্যে অবরুদ্ধ জলকে ছেড়ে দেওয়া। এই শম্বর বর্ষাকালে নিহত হয়েছিল এবং তাকে পর্বত থেকে নিয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। নিক্ষেপ করার সহজ অর্থ—মেঘমধ্যে অবরুদ্ধ জলকে মুক্ত করা, ছেড়ে দেওয়া। রাজা দিবোদাসকে অগাধ ধন দান করার অর্থ, সময়মত বৃষ্টিপাত হওয়ায় প্রচুর শস্যসম্পদ উৎপন্ন হওয়া। এই সূক্তেরই তৃতীয় (১. ১৩০. ৩) ঋকের শেষের দিকের অর্থ—ইন্দ্র চতুর্দিকে মেঘাবৃত ও অন্নের হেতুভূত (বারি, জলের) দ্বার সমূহ উদঘাটন করে চারিদিকে অন্ন বিস্তার করলেন।

এই সূক্তেরই অষ্টম ঋকের (১.১৩০.৮) শেষাংশে আছে : "তিনি কৃষ্ণের

কৃষ্ণত্বককে উন্মোচন করে, তাকে বধ করেন।" এরই পূর্ব সূক্তের (১. ১২৯. ৩) তৃতীয় ঋকে আছে : "হে ইন্দ্র, তুমি শত্রু ক্ষয়কারক। তুমি বৃষ্টিপূর্ণ ত্বক রূপ মেঘকে ভেদ করে জল সেচন কর এবং মর্তের ন্যায় গমনশীল মেঘকে ধরে বৃষ্টিশূন্য করে ছেড়ে দাও।" কৃষ্ণত্বক=মেঘ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ঋ ৪. ২৬. ১৩ : "তুমি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বিনাশ করেছিলে, তুমি সকলকে বিদথির পুত্র ঋজিশ্বায়কে বশীভূত করেছিলে। তুমি পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছিলে। জরা যেভাবে রূপ বিনাশ করে, তুমি সেরূপ শম্বরের নগর সমূহ বিনাশ করেছিলে।"

এখানে উপমাটি প্রণিধান যোগ্য। বলা বাহুল্য, মৃগয়, পিপ্রু, শম্বর এবং ৫০,০০০ কৃষ্ণবর্ণ শত্রু—এ সবই হলো জলভরা মেঘ। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যেখানেই কৃষ্ণত্বকের উল্লেখ পেয়েছেন সেখানেই ধরে নিয়েছেন যে, নিশ্চয় তারা অনার্য অথবা পর্বত-অরণ্যবাসী আদিবাসী হবে।

শম্বরের পুরগুলো ছিল "অশ্মন্ময়ীনাম্" অর্থাৎ মেঘময়ী (ঋ ৪. ৩০. ২০)। অশ্নতে ব্যাপ্নোতি অন্তরীক্ষম্—ইতি সায়ণ। ১৪ ঋকে আছে—হে ইন্দ্র, তুমি কুলিতর-এর অপত্য, দাস শম্বরকে বৃহৎ পর্বতের উপরে নিম্নমুখ করে প্রবাহিত করেছিলে। 'অবাহন্নিন্দ্র শম্বরম্'। শম্বরের বাসস্থল পর্বতে। ইন্দ্র তাকে পর্বতের উপর ধরে নিম্নমুখ করে প্রবাহিত করে দিয়েছিল। শম্বর মনুষ্য হলে তাকে পাহাড়ের উপর ধরে মাথা নিচুদিক করে জল প্রবাহিত করে দেয় কিরূপে? সুতরাং এর প্রকৃত অর্থ হলো—শম্বররূপী মেঘময়ী পুর সমূহকে পর্বতের উপর ধরে নিম্নমুখ করে প্রবাহিত করা। ঋগ্বেদের বহু সূক্তে মেঘকে পর্বত বলা হয়েছে। এর পরের ঋকেই আছে (৪. ৩০. ১৫): হে ইন্দ্র, চক্রের চতুর্দিকস্থ শঙ্কুর ন্যায় দাস বর্চির চতুর্দিকস্থিত পঞ্চশত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক অনুচরদের তুমি বিশেষরূপে বধ করেছিলে (বলা বাহুল্য, বর্চিও ছিল—বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, শম্বর প্রভৃতির ন্যায় মেঘমধ্যে লুক্কায়িত অশুভ শক্তি, দাস পদবাচ্য বৃত্রের বিশেষণ—বিভিন্ন মেঘের কল্পিত নাম। এই সকল দাস-দস্যু-অসুর-দানবদের পুর ধ্বংস করেই ইন্দ্র 'পুরন্দর' আখ্যা পেয়েছিলেন। পুরন্দরৌ অসুর পুরানাং দারয়িতারৌ—ইতি সায়ণ।

১০. ১০৪. ৮ ঋকে আছে : "তুমি দেব-মনুষ্যের উপকারার্থে নবনবতি নদীর পথ পরিষ্কার করে দিয়েছ। তুমি জল সমূহের আচ্ছাদন খুলে দিয়েছ, তুমি একাকী উল্লিখিত জল আনয়নের জন্য মনোযোগী হয়েছিলে। হে ইন্দ্র,

বৃত্রবধ উপলক্ষে তুমি যে সকল কার্য করেছ, তা দিয়ে সকল সংসারের শরীর পোষণ করেছ।" ঋগ্বেদের নানাস্থলে নবনবতি নদীর উল্লেখ আছে, যথা: ১. ৩২. ১৪, ১. ১১২. ১৩, ১.১৯১.১৩, ১০.১০৪.৮ প্রভৃতি। এই সকল নদীর উৎস মুখে (বৃত্র যেমন সপ্ত নদীর মুখ আবৃত করেছিল) শম্বর অসুর আবরক রূপে অবস্থিত ছিল, তাকে নিহত করেই দিবোদাস বা অতিথিগ্ব রাজার রাজ্যের কল্যাণের জন্য ইন্দ্র নবনবতি নদীর পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আবার ৩.৪৭.৪ ঋকে আছে: "হে মঘবা ইন্দ্র, যাঁরা বৃত্র বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, যাঁরা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, যাঁরা শম্বর বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, সেই মরুৎগণের সঙ্গে সোমপান কর।" ঋগ্বেদে ধেনুর এক অর্থ—জল। মেঘপুর সমূহের সঙ্গে যুদ্ধের দরুন মরুৎগণের প্রয়োজন হয়েছিল।

৫.২৯.২ ঋকে, ইন্দ্রের বৃত্রকে সংহার করা ও প্রচণ্ড জলরাশিকে স্বেচ্ছানুসারে প্রবাহিত করার উল্লেখ আছে। ঐ সূক্তেরই ৬ষ্ঠ ঋকে বলা হয়েছে: "যখন ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র, বজ্রদ্বারা একবারে সেই শম্বরের নবনবতি পুর নষ্ট করলেন (নবনবতি কোথাও নদী, কোথাও পুর) তখন মরুৎগণ রণভূমিস্থ ইন্দ্রের ত্রিষ্টুপ ছন্দে স্তব করায় তিনি ঐ উদ্দীপ্ত অসুরকে পীড়িত করলেন।" আবার নবম ঋকে বলা হয়েছে, "তুমিই শুষ্ণকে বধ করেছিলে।"

৮.৩২. ২-৩-২৫ ও ২৬ ঋকে আছে: 'উগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ করে সৃবিন্দ, অর্শনি, পিপ্রু, অহিসুবকে বধ করেছেন।' 'হে ইন্দ্র, বৃহৎ মেঘের আবরক স্থল বিদ্ধ কর, ঐ বীরকর্ম সম্পাদন কর।' 'তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ করেছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করেছেন।' 'দীপ্তপ্রতিম ইন্দ্র, বৃত্র, ঊর্ণনাভ ও অহিসুবকে বধ করেছেন, তিনি হিমজলে মেঘ বিদ্ধ করেছেন।'

ঋ ৬.২০.৭ ও ১২: "হে বজ্রধর, তুমি দুরন্ত মায়াবী পিপ্রুর সুদৃঢ় নগরী সকল বলদ্বারা বিদারিত করেছ। হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুগণের কম্পন বিধায়ী, তুমি ধুনি কর্তৃক বারিরাশিকে বেগবতী নদী সমূহের ন্যায় প্রবাহিত করিয়েছ।"

ঋ ১০. ৬৯. ৬: "হে অগ্নি, পর্বতের যে সকল উত্তম উত্তম জঙ্গমধন আছে তা তুমি বৃত্র দাসগণের নিকট থেকে জয় করে আর্যদের দিয়েছ।" এখানে জঙ্গমধন হচ্ছে বনানী সঞ্চিত জল।

ঋগ্বেদে অগ্নিকেও 'পুরন্দর' বলা হয়েছে (ঋ ৭.৬.২)। বরুণকে বলা হয়েছে—দ্যৌঃ-এর দেবতা, জলের দেবতা। বরুণ এই দিক সকল ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তিনি শত্রুগণের ব্যাপ্ত সমস্ত পুর বিনাশ করেন (ঋ ৮.৪১.৭)।

বৃহস্পতি সম্পর্কে বলা হয়েছে (৬.৭৩.২): যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি বৃত্রগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন···এবং পুর সকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন (ঘ্নণ বৃত্রানি বি পুরো দর্দরীতি)। ৮.৮০.৭ ঋকেও ইন্দ্রকে পুরের মত মঙ্গলময় বলা হয়েছে। এখানেও পুর-এর অর্থ হলো মেঘ এবং নিশ্চয় তা মনুষ্য-নির্মিত ইট-কাঠের পুর নয়।

ঋ ৭.৯৯.৪ ও ৫-এ বলা হয়েছে : ইন্দ্র ও বিষ্ণু একত্রে সূর্য, উষা ও অগ্নি সৃষ্টি করেছেন। শম্বরের নবনবতি পুর ধ্বংস করেছেন।

ঋ ২.২৪.২-তে আছে : যে ব্রহ্মণস্পতি স্বীয় বলে অবমান যোগ্য গণকে অবমানিত করেছিলেন, তিনি ক্রোধ পরবশ হয়ে শম্বরকে বিদারিত করেছেন, নিশ্চল জলকে চালিত করেছিলেন এবং গোধনপূর্ণ পর্বতে প্রবেশ করেছিলেন।

ঋ ১.৫৯.৬ : ···বৈশ্বানর অগ্নি দস্যুকে হনন করেছেন, বৃষ্টির জল নীচে প্রেরণ করেছেন এবং শম্বরকে ভেদ (শম্বরম্ ভেদ) করেছেন।

দেখা যাচ্ছে যে, ইন্দ্র একা নন, শম্বরকে বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি এবং অগ্নিও নিহত করেছিলেন। বৃত্রের ন্যায় শম্বরও বহু। শম্বর শুধু নবনবতি পুর নয়, নবনবতি নদীরও কর্তা ছিলেন। বৈশ্বানর অগ্নি, শম্বরকে ছিদ্র (ভেদ) করে দিয়েছিলেন।

ঋগ্বেদের ১০/৯৮ সূক্ত হলো, শান্তনু রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ঋষি দেবাপির প্রার্থনামন্ত্র। তিনি বৃহস্পতি দেবকে দূত স্বরূপ দেবগণের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, শান্তনু রাজার জন্য মেঘকে বারি বর্ষণ করাতে। "তিনি উপরের সমুদ্র হতে স্বর্গের বৃষ্টিবারি নীচের সমুদ্রে আনলেন।" উপরের সাগর, অর্থাৎ আকাশের মধ্যে দেবতারা জল আচ্ছাদন করে রেখেছিলেন। দেবাপি যজ্ঞ করে সেই অপরিসীম জল নিম্নে পাতিত করলেন; সেই জলই ক্ষেত্রসমূহের উপর দিয়ে সাগর অভিমুখে ধাবিত হলো। এই স্তোত্রেরও শেষ ঋকে প্রার্থনা আছে : "হে অগ্নি, শত্রুদের দুর্গম পুর সকল ধ্বংস কর। প্রকাণ্ড আকাশে যে সমুদ্র বিদ্যমান আছে তথা হতে অপরিসীম জল এনে দাও।" এখানেও পুর-এর অর্থ যে মেঘপুর, তা সুস্পষ্ট।

বেদের মর্মার্থ গ্রহণ অতি দুরূহ ব্যাপার। বেদের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব। আক্ষরিক অনুবাদে বেদের মর্ম বোঝা যায় না। বেদ সাংকেতিক ও রূপক ভাষায় লেখা। এতে আছে উপমার ছড়াছড়ি। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁদের সাধনা-লব্ধ সত্যকে যিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি সেইভাবে তা উপমা,

রূপক ও সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করে গেছেন। বেদপাঠের এই সংকেত জানা প্রয়োজন। বেদে গো, অশ্ব, ধন, পর্বত প্রভৃতি অনেক শব্দের বিবিধ অর্থ আছে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ, দর্শন সর্বত্রই বেদ-বিষয়ক আলোচনা আছে। বেদের অন্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা আছে নিরুক্ত সমূহে।

ভারতে সংস্কৃতজ্ঞ সাধুসন্তগণ, পণ্ডিতগণ, ভাষ্যকারগণ কেউ-ই কোথাও ঋগ্বেদের উপরোক্ত সূক্ত সমূহে ব্যবহৃত পুর শব্দের অর্থ মনুষ্য-নির্মিত নগর রূপে বর্ণনা করেননি। পুর বলতে মেঘপুরই (লৌকিক বা সাধারণ অর্থে) মনে করেছেন।[১] এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়-বিচারে ঋগ্বেদের ঋক সমূহের লৌকিক বা সাধারণ অর্থই আমরা গ্রহণ করেছি। ঋগ্বেদের আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। ঋষিগণ দেবতার নিকট যে জ্যোতির্দান প্রার্থনা করতেন, তা ভৌতিক সূর্যের নয়—জ্ঞানসূর্যের, গায়ত্রী মন্ত্রোক্ত সূর্যের। এই জ্যোতি আমাদের সকল চিন্তাকে সত্য তত্ত্বের দিকে প্রেরণ করে। ঋষিগণ যে তমঃকে ভয় করতেন, সেটা রাত্রির নয়, অজ্ঞানের ঘোর তিমিরকে। ইন্দ্র হলো জীবাত্মা প্রাণ। বৃত্র মেঘও নয়, কবিকল্পিত অসুরও নয়; যা আমাদের পরম পুরুষার্থকে ঘোর অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত করে, বা রোধ করে, যার মধ্যে দেবগণ অগ্রে নিহিত ও লুপ্ত হয়ে, পরে দেববাক্যজনিত উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে বিস্তারিত ও প্রকট হন, তিনিই বৃত্র। মরুৎগণ মেঘহন্তা বায়ু নন, পঞ্চপ্রাণ। তমঃ= হৃদয়গত ভাবরূপ অন্ধকার। যিনি শক্তিমান, তিনিই অগ্নি। অগ ধাতুর অর্থ শক্তি; যে-শক্তি জ্বলন্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, জ্ঞানের কর্মফল স্বরূপ, সেই শক্তির শক্তিধর অগ্নি। বেদের শত শত সূক্তে অগ্নির গুণ ব্যক্ত ও স্তুত হয়েছে। জগতের আদি, জগতের প্রত্যেক স্ফুরণে নিহিত সকল শক্তির মূল ও প্রধান, সকল দেবতার আধার, সকল ধর্মের নিয়ামক, সর্বজ্ঞান মণ্ডিত ও পরম জ্ঞানাত্মক হলো—তপঃশক্তি।

শ্রী অরবিন্দ তাই বলেছেন: বেদ রহস্যময়, এর ভাষা, কথার ভঙ্গি, চিন্তার গতি অন্য যুগের সৃষ্টি; অন্য ধরনের মনুষ্যবুদ্ধি সম্ভূত। ইয়োরোপীয় অধিকাংশ পণ্ডিতই এই কারণে ঋগ্বেদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি, এই গ্রন্থের মূল্য অনুধাবন করতে পারেননি, কদর্থ করেছেন মাত্র।

ভারতে হারাপ্পা-সভ্যতা যখন ক্ষীয়মান, ইন্দ্রের নেতৃত্বে সশস্ত্র আর্যগণ তখন

১. রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রষ্টব্য: ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রথম মণ্ডল ১১ সূক্তের টীকা, পৃষ্ঠা ২৩, আদি সংস্করণ। *Roth's Illustrations of the Nirukta*, p. 150 এবং *Muir's Sanskrit Texts*, Vol. V, pp. 95-96.

তারতে অনুপ্রবেশ ক'রে, হারাপ্পা-সভ্যতার রাজগণ বা নেতৃগণকে অর্থাৎ অনার্য বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, শম্বর প্রভৃতিকে সংগ্রামে নিহত ক'রে তাদের সুরক্ষিত প্রাচীর বেষ্টিত পুর বা নগরী সমূহকে ধ্বংস ক'রে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদ পাঠ করে এই তথ্যই নাকি পেয়েছেন!

ম্যাক্সমূলর, উইলসন, ম্যাকডোনাল্ড, মিউয়র প্রভৃতি যেসব ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বেদ অনুশীলনে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষ কেমন তা স্বচক্ষে দেখেননি। ভারতের ভাষা, বিশেষতঃ বেদ বুঝতে হলে, কেবল ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্যে বোঝা সম্ভব নয়। ভাষার অনেক ভাব, অনেক ইঙ্গিত ব্যাকরণে বা অভিধানে ব্যক্ত থাকে না। যেমন, বাংলা ভাষায় "পটোল তোলা" বলে একটা কথা আছে, প্রত্যেক বাঙালীই এর অর্থ বুঝতে পারে, কিন্তু একজন ইংরেজ অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে এর কি অর্থ করবেন? 'অমুকে গুরুতর আহত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াতে লাগল কিন্তু পথিমধ্যে পটোল তুললো'—এর প্রকৃত অর্থ তাঁরা কি সত্যিই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন? তা ছাড়া বেদের কথা, হলো হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশের কথা। একজন ভাবুকের কথা ও একজন সাধারণ মানুষের কথায় পার্থক্য অনেক। বেদের ভাব ও ভাষা বুঝবার মত ক্ষমতা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের থাকতে পারে না। ভারতের সঙ্গে ইয়োরোপের মূল প্রকৃতির এত বেশি পার্থক্য যে, ভারতের অধিকাংশ ক্রিয়ার ঘটনাংশটুকু বুঝতে পারলেও ইয়োরোপ তার উদ্দেশ্য ও ভাব গ্রহণ করতে অক্ষম। বেদোক্ত যজ্ঞ সম্পর্কেই কি তাঁদের কোন ধারণা আছে? ঋগ্বেদের দেবদেবী সম্বন্ধেও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছেন? ঋগ্বেদের আর্য ঋষিগণ সূর্যের উপাসনা করতেন—কিন্তু সে কোন্ সূর্যের? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক সূর্যের? অথবা সূর্যের মধ্যে তাঁরা যে তিনটি নিগূঢ় রূপ দেখতে পেয়েছিলেন তার উৎকৃষ্টতম রূপটির? ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই সূর্যের তিন প্রকার রূপের উল্লেখ পাই। প্রথম, (ঋ ১.৫০.১০) উৎ বা উৎকৃষ্ট রূপ, যে-রূপে সূর্য এই পৃথিবীর বক্ষে তার কিরণ বিকীর্ণ করে। দ্বিতীয়, তার উত্তর অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর রূপ, যে-রূপে সূর্য অনন্ত আকাশে ও ঊর্ধ্বতম লোকে তার জ্যোতিঃ প্রকাশ করে। তৃতীয়, সূর্যের উত্তম বা উৎকৃষ্টতম রূপ, অমৃত রূপ। আর্য ঋষিরা যে-জ্যোতির্দান প্রার্থনা করেন, তা ভৌতিক সূর্যের নয়—জ্ঞানসূর্যের, গায়ত্রী মন্ত্রোক্ত সূর্যের, যার জ্যোতিঃ আমাদের সকল চিন্তাকে সত্য তত্ত্বের দিকে প্রেরণ করে।

আবার অন্যত্র (ঋ ১০.৮৮.৪) অগ্নিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, "হে

অগ্নি, তোমার পরম কল্যাণময় নিগূঢ় রূপেই তুমি মৃত জীবকে স্বর্গে নিয়ে যাও। তোমার কল্যাণময় রূপেই তুমি দেবতাদের কাছে যজ্ঞের হবি বহন করে থাকো। এই রূপেই তুমি জাতবেদা, অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তুকেই তুমি জেনে থাকো। হে অগ্নি, তোমার নিগূঢ় রূপ আছে এবং তুমি যে-উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছ তা আমি জানতে পেরেছি।" এই অগ্নি শক্তিমান, যে-শক্তি জ্বলন্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত—পরম জ্ঞানাত্মক তপঃশক্তি। এই দেবতাই যজ্ঞের একমাত্র সিদ্ধিদাতা-পুরোহিত। যজ্ঞবিদগণ যজ্ঞের রহস্য অবগত হয়ে সেই ব্রহ্মাগ্নির উদ্দেশেই আহুতি প্রদান করেন।

বৈদিক আর্য ঋষি বহুত্বের মধ্যে একত্বের, দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের সন্ধান পেয়েছিলেন ও সেই সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ জন্যেই বরুণ দেবতার উদ্দেশে স্তব করে (ঋ ৪.৫৮.১১) বলেছিলেন, "হে বরুণ, সমুদ্রজলে বাড়বাগ্নি রূপে তোমার যে তেজঃ ও শক্তি বিদ্যমান রয়েছে তাই অন্তরীক্ষে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে ক্রীড়া করছে। ঐ তেজঃশক্তিই প্রাণীজঠরে জঠরাগ্নি রূপে, প্রাণীহৃদয়ে আয়ুঃশক্তি রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। ঐটাই মেঘমণ্ডলে বিদ্যুতাগ্নি রূপে বিরাজ করে, রণভূমিতে বীর-হৃদয়ে শৌর্যাগ্নি রূপে প্রদীপ্ত হয়ে থাকে। তোমার শক্তির লীলালহরী সমভাবে তার স্বীয় রূপের মধুধারা বর্ষণ করছে।"

বৈদিক দেবতাবর্গের বর্ণনা থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, আর্য যেকোনো দেবতাকে অবলম্বন করে সেই সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী পরব্রহ্মকেই স্তব করছেন। "একই সত্য : পরব্রহ্মকে তত্ত্বদর্শিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করে থাকেন (ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬)।" আমাদের আর্য ঋষিগণ এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করে বললেন : "বেদাহমেতং পুরুষং পুরাণম্—সেই পরম পুরুষকে জেনেছি (যজুঃ)।" ঋষিকন্যা বাক-এর জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয়েছিল—"অন্তরেও আমি, বাইরেও আমি, আমিময় এ ত্রিভুবন; আমার এই সর্বাত্মভাব বা বিরাট রূপ (ঋ ১০. ১২৫. ১—৮)।" সোঽহং বা আমিই বিশ্ব—স্বীয় আত্মার পরমাত্মা উপলব্ধি এই সূক্তের মধ্যে ফুটে উঠেছে। বিশ্বের দুজ্ঞের্য় সৃষ্টিরহস্য আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে নাসদীয় সূক্তে (ঋ ১০।১২৯)।

বেদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উষাকালে রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে নিহিত মানুষের জ্ঞান পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। সুদূর অতীতে মানুষের প্রজ্ঞা কিভাবে এরূপ বিকাশলাভ করেছিল তা ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়। ভারতীয় চিন্তা ঋগ্বেদে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। এই সংহিতা, ভারতের তথা

মানবের প্রথম গ্রন্থ হলেও জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখর দেখিয়েছে। প্রথম থেকে শেষ অবধি জ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের সম্পূর্ণ ধারা আমরা এর মধ্যেই দেখতে পাই।

বেদ-বিষয়ে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হলো এই কারণে যে, আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস জানি না, প্রাচীন ভাষা—বৈদিক ভাষা বুঝি না। বেদ-এর নাম জানি বটে. কিন্তু তার মধ্যে কি আছে তা জানতে হলে ম্যাক্সম্যুলর, উইলসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার উপরই নির্ভর করি। আমাদের দেশের ইতিহাস যেন তাঁদের রচনার উপরেই নির্ভরশীল।

এই বৈদেশিক পণ্ডিতগণের ধারণা, বেদ-সংহিতা রচনার পর আর্যরা ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং উপনিষদ রচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন; আত্মা (পরমাত্মা) ও ব্রহ্মকে জানতে পেরেছিলেন। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা পরিহার করা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক ব্যাপার। অসভ্য অবস্থার সংস্কার এবং আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ তিরোহিত হয়, এটাই তো স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। অজ্ঞান ও জ্ঞান এমনই বিপরীত ভাবাপন্ন যে, একের উদয়ে অপরকে পলায়ন করতেই হয়। উপনিষদ, সূত্রসমূহ, ষড়দর্শন ও পুরাণ রচনাকালে, আর্যদের মধ্যে জ্ঞানের বহুল পরিমাণ অনুশীলন হয়েছিল—এ তো সর্বজন স্বীকৃত। তখন অর্ধ-অসভ্য প্রকৃতিপূজক ঐ বেদ ও বেদোক্ত কর্মাদির উপর উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের আস্থা কতখানি হ্রাস পেয়েছিল? যদি না পেয়ে থাকে তবে তার কারণ কি? পরন্তু, সকল উপনিষদ-এর উপরই বেদ-এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এমন কোন উপনিষদ নেই, যা বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না; বেদই প্রামাণ্য এবং উপনিষদগুলি বেদেরই অংশ। ভারতের ছয়টি প্রধান বিশিষ্ট দর্শন একবাক্যে বেদকে প্রামাণ্য বলে ঘোষণা করেছে। এমন কি সেশ্বর ও নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনও আমাদের যুক্তি যেখানে পৌছাতে পারেনি সেখানে "আপ্তাগমাৎ সিদ্ধং" বলে বেদের সত্যতা মেনে নিয়েছে। বেদের অন্তে বা শেষে নিবদ্ধ হওয়ায় উপনিষদের প্রতিপাদিত বিদ্যা বেদান্ত নামে পরিচিত। কোনো কোনো পণ্ডিতজনের মতে, বেদের সারভাগ বলেই তা বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদের নিন্দা কোন উপনিষদে নেই। পরা ও অপরা ভেদে বিদ্যা দু'প্রকার। উপনিষদের মতে দু'প্রকার বিদ্যাই জ্ঞাতব্য।

ম্যাক্সম্যুলর প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে, "বেদ মানবজাতির সর্বপ্রথম কাব্য; মানববিশ্বাস, মানবধর্ম, মানব-সভ্যতার, বিশেষ করে আর্য-

ধর্মের, আর্য-বিশ্বাসের, আর্য-চিন্তার প্রথম ইতিহাস। বেদে প্রকৃত সত্যজ্ঞানের কোন কথা নেই, যদি বা থাকে তা অতি সামান্য এবং তাও প্রায় বেদের শেষের দিকে। বেদের মন্ত্রগুলো আর কিছুই নয়—কেবল সেই অসভ্য অথবা অর্ধসভ্য আর্য কৃষকগণের উল্লাসের, ভয়ের বা আশার গীত। বেদ রচনার সময় মানুষ প্রাচীন বর্বরতা ত্যাগ করে একটু সভ্যতা শিখেছে। লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, ভয়ে বা আশায় গীত গাইতে জানে। ঈশ্বরকে তখনো জানে না, কিন্তু সূর্যের প্রভা, ঊষার রক্তিম ছটা, ঝড়ের প্রবল বেগ বা বৃষ্টির হিতকর জল দেখে বার বার আকাশের দিকে চেয়ে সেই আকাশে কল্পিত দেবগণকে আরাধনা করে। সভ্যতা বিশেষ শেখেনি কিন্তু চাষ করতে, কাপড় বুনতে, নৌকা বাইতে শিখেছে। প্রকৃতির যা-কিছু বিস্ময়কর, হিতকর ও ক্ষমতাশালী পদার্থ, তা দেখে ভয়ে, বিস্ময়ে, আশায় অভিভূত হয়ে তাদের ঈশ্বর বলে উপাসনা করে; তাদের উদ্দেশে যাগ-যজ্ঞাদি করে, গান করে। মেঘ না হলে বৃষ্টি হয় না, সুতরাং শস্যও হয় না, তাই মেঘ—দেবতা। বন্যা এসে ক্ষেত প্লাবিত করে, শস্য ধ্বংস ও গৃহাদি বিনষ্ট করে' অতএব জল—দেবতা। বায়ু প্রবল ঝটিকা তুলে গৃহাদি উৎপাটন করে ফেলে, বায়ুর মত পদার্থ আর কিছু নেই, তাই বায়ু—দেবতা। অগ্নি না হলে কোন কাজই সমাধা হয় না, আবার তা ধ্বংসকার্যে ওস্তাদ, তাই অগ্নি শ্রেষ্ঠ দেবতা। এইরূপ সূর্য, ঊষা প্রভৃতি প্রকৃতির বিস্ময়কর, হিতকর ও ভয়প্রদ পদার্থমাত্রেই আর্য কৃষকগণের দেবতা। তাদের উদ্দেশে যে গান গীত হতো তাই মন্ত্র, তাদের প্রীতির জন্য যে কার্য করা হতো তাই যজ্ঞ। স্থূল কথায়, প্রকৃতির জড়শক্তি ও জড়পদার্থগুলো তাদের দেবতা"।[১]

ইয়োরোপের পণ্ডিতগণ বেদ অনুশীলন ও অনুবাদ করে উক্ত জ্ঞানই আহরণ করেছিলেন। ঋগ্বেদের গহনে প্রবেশ করা তাঁদের পক্ষে ছিল সাধ্যাতীত ব্যাপার।

ঋগ্বেদে যে শুধুমাত্র অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোচনা আছে, তা নয়। এর মধ্যে আমরা তৎকালীন জড়বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতিরও যথেষ্ট পরিচয় পাই।

"এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে যে জ্যোতিঃ দেখতে পাওয়া যায় তা চন্দ্রের নিজের কিরণ নয়। উহা দেদীপ্যমান সূর্যের জ্যোতিঃ বলে জেনেছেন। সূর্যের কিরণ নিস্তেজ চন্দ্রমণ্ডলে নিপতিত হয়ে তা আবার পৃথিবীতে প্রতি-

১. রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "ঋগ্বেদের দেবগণ" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। নবজীবন পত্রিকা, আষাঢ় সংখ্যা।

ফলিত হয়ে নৈশ অন্ধকার বিনষ্ট করে।" (ঋগ্বেদ ১.৮৪.১৫, সায়ণ ব্যাখ্যার অনুবাদ)। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে, ঋগ্বেদীয় আর্যগণ চন্দ্র ও সূর্য এই পদার্থদ্বয় কি প্রকার তা নিশ্চয় জানতে পেরেছিলেন। তাদের গতিপ্রণালী, পৃথিবীর শূন্যমণ্ডলে অবস্থিতি, আলোকের ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে নিশ্চয় তাঁরা কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

ঋগ্বেদের ১.৫০.৪ সূক্তে আছে—"তরণিবিশ্ব দর্শতো···বিশ্বমাভাসি রোচনম্" —এই মন্ত্রে সূর্যকেই জ্যোতির্বিহীন চন্দ্রাদি গ্রহের জ্যোতিঃকর্তা বলা হয়েছে। ঋ ১.৬৭.৩ মন্ত্রে সূর্য পৃথিবীলোক এবং অন্তরীক্ষগত ভুবন, দ্যুলোকগত ভুবন সমূহ ধারণ ও স্তম্ভন করে আছেন, একথা বলা হয়েছে। ঋ ১.৬৭.৫ মন্ত্রে অন্তঃপ্রবিষ্ট তাপের দ্বারা লতাপাতা, পুষ্প-ফলাদির উৎপত্তি-বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

এইসব কি মহাপণ্ডিত স্যার লিয়োনার্ড উলে মহাশয়ের উক্ত যাযাবর, অর্ধ-বর্বরদের কথা হতে পারে ?

আবার, ঋ ১.৭৩.৩ মন্ত্রে "দেবো ন যঃ পৃথিবী···পতি জুষ্টেব নারী" মন্ত্রে অনুকূল মিত্রযুক্ত রাজা যেরূপ সর্বজনপ্রিয় হন, পিতৃগৃহবাসী পুত্র যেরূপ সুখী হন, সূর্য যেরূপ পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, একপতিভুক্তা নারী যেরূপ পাতিব্রত্য ধর্মের দ্বারা শুদ্ধা হলে সকল সৎকার্যের যোগ্যা হন ইত্যাদি চারিটি দৃষ্টান্তের অবতারণায় তৎকালীন সমাজের চারিটি গুরুতর বিষয়ের বিশেষ রূপ ও জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে।

এতদ্ব্যতীত সূর্যের গতি (ঋ ১.১২৩.৮), সৌর ও চান্দ্র বৎসর (ঋ ১.২৫ ৮, ১.১৬৪.১৫ প্রভৃতি), উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন (ঋ ১.১৬৪.১২), পৃথিবীর কক্ষপথ (ঋ ১০.৮৯.৪) প্রভৃতি সম্পর্কেও আর্য ঋষিগণের আশ্চর্য জ্ঞানের পরিচয় আমরা ঋগ্বেদে পাই।

প্রসিদ্ধ লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ উলে মহাশয়ের মূলানুগ ঋগ্বেদের পাঠ ও তা সম্যক অনুধাবন করা দূরের কথা, ঋগ্বেদ সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও "মানবজাতির ইতিহাসে ঋগ্বেদ যাযাবর অর্ধবর্বর ভারতীয় আর্যগণের লেখা ধ্বংসের মহাকাব্য," একথা তিনি উচ্চারণ করতে পারতেন না।

যাহোক, ঋগ্বেদে 'পুর' বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'মেঘপুর'—এই অর্থ করা হয়েছে। এই পুর-এর আর একটি অর্থ আছে, তা হলো—দেহপুর। দেহপুর শব্দ আমাদের দেশে বর্তমানেও প্রচলিত আছে। পুর কিংবা নগরের যেমন দ্বারপাল থাকে, সেরূপ শরীরেও ইন্দ্রিয়াদি অনেক উপকরণ থাকে, এই কারণে শরীরকে 'পুর' বলা হয়। অন্তরাত্মা শরীররূপ পুরে অসংহতভাবে অধিষ্ঠান করেন।

দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে তাঁর কোন বিকার হয় না। তিনি একটি মাত্র দেহে নয়, সকল দেহপুরেই বাস করেন। ইন্দ্র-ই অন্তরাত্মা বা পরমাত্মা। তিনি দেহ ভেদ করে প্রবেশ করেন এবং উৎক্রান্ত হন বলেই তিনি "পুরাং ভিন্দুঃ (ঋ. ১.১১.৪), অর্থাৎ পুর সমূহের ভেত্তা পুরন্দর। এই দৃষ্টিতে ঋগ্বেদের উক্ত ঋকের অর্থ: "যিনি পুর সমূহের ভেদক (অর্থাৎ অন্তরাত্মা), যুবা, মেধাবী ও প্রভূত বলসম্পন্ন হয়ে জাত, তিনি হলেন বিশ্বের সকল কর্মের ধারক বজ্রধারী ইন্দ্র।" এই ঋক, মেঘপুর বিদারক রূপেও ব্যাখ্যাত হয়। বেদ এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসমন্বিত গ্রন্থ। অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত মহিমাই বেদে বিধৃত রয়েছে।

ঋগ্বেদে দাস-দস্যু-দানব প্রভৃতির প্রায় ৪৬টি নাম পাওয়া যায়। এই সব নামের ব্যুৎপত্তি বৈদিক ভাষা থেকেই। এই অনার্যরা যদি ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর হতো তাহলে তাদের নাম অন্যরূপ হতো। ঋগ্বেদের অনার্যগণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হলো :

১. দস্যু ও দাস : অর্বুদ, অনর্শনি, অহি, অহিসুব, ইলীবিশ, কুলিতারা, কুয়র, চুমুরী, ধুনি, নমুচি, নৃমর, নববাস্ত, পিপ্রু, বৃহদ্রথ, বর্চিন, ভেদ, বৃত্র, বৃষসিপ্রা, শম্বর, শুষ্ণ, সহবাসু।

২. অসুর : অংহা, অশ্ন, ঔড়ন, কৃষ্ণ, তুগ্র, মৃগয়, বল, বংগদ, বেতসু, বরশিখ. বৃচিবৎ, বৃষয়, রুধিক্র, সনক, শরত।

৩. অন্যান্য : ঊর্ণনাভ, করঞ্জ, পর্ণয়, বেশ, স্ববিন্দ, স্মদিব, পনি, অজ, শিগ্রু, যক্ষ, অনিল, ভলানস, পাকথ, বিশনিল, শিব, শিমু।

ইন্দ্র-বিদ্বেষী 'ভেদ'কে সুদাস বধ করেন (ঋ ৭.১৮.১৮-১৯)।

"আর্যগণ যখন কোন এক আদিম বাসভূমি থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা তাদের ভাষা সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল। সেই মূল ভাষা কি শব্দ-সম্পদে, কি পদসমূহের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে অনেকটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল, এ কথাটা যদি সত্য হয়, তা হলে আর্যগণের সেই আদিম বাসভূমিকে সপ্তসিন্ধু অঞ্চল রূপে এবং সেই ভাষাকে বৈদিক ভাষা বলে ভাবতে আপত্তি কোথায়?[১] বৈদিক

ভারতীয় আর্যদের, ভাষা

১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ উইল ডুরাণ্ট মন্তব্য করেছেন : India is the motherland of our race. and Sanskrit is the mother of European languages. She was the mother of our Philosophy—mother, through the Arabs, much of our mathematics, mother through Buddha of the ideas embodied in Christianity ; mother through village communites of Self-Governent and democracy. Mother India is in many ways the mother of all."

ভাষা সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকেই উদ্ভূত। এই ভাষা থেকেই এসেছে সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষা পাঠ করতে গিয়েই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্টিক প্রভৃতি ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পান। এর থেকেই বর্তমান যুগের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব। যে সকল মূল শব্দ থেকে আর্য বা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহে সাযুজ্যযুক্ত নানা শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে, তার সংগ্রহ সংস্কৃত ভাষাতেই সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। কোন কোন বৈদেশিক পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাকে ঐ সকল আর্য ভাষার জননী বলেও স্বীকার করে নিয়েছেন।

বৈদিক ভাষাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা, যা আজও পরম সমাদরে পঠিত হয়। এই ভাষাতেই রচিত হয়েছে অক্ষয় অমৃত বাণীগুলি এবং প্রাচীনতম কালের আবিষ্কৃত সত্য সমূহ, যা আজও অবিকৃত আছে। এই ভাষায় সৃষ্টি হয়েছিল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের আর্য ঋষিগণের কণ্ঠ হতে—ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা—যখন তাঁরা সত্য জ্যোতির সন্ধান পেয়েছিলেন।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে ভারতে কোন লেখ্য ভাষা ছিল না।[১] অর্থাৎ, ভারতীয় আর্যরা ঐ সময়ের পূর্বে লিখতে পড়তে জানত না। ঋগ্বেদ মুখে মুখে রচিত হয়েছিল এবং মুখে মুখেই তা পুরুষানুক্রমে চলে আসছিল, এই কারণে বেদকে শ্রুতি বলা হয়। ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও একথা মেনে নিয়েছিলেন; স্কুল-কলেজে আমরা এই তথ্যই শিখেছিলাম। এই তথ্য কি সত্য? ভারতীয় আর্যদের কি কোন লিখিত ভাষা ছিল না?

ঋগ্বেদে আমরা দেখতে পাই, দুটি সূক্তে ভাষা সৃষ্টির উল্লেখ আছে। ঋ ১০. ৭১.১ ঋকে আছে: "হে বৃহস্পতি, বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নাম মাত্র করতে পারে। এটাই তাদের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান। তাদের যা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তা বাগ্‌দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশিত হয়।" ২ ঋকে বলা হয়েছে, "যেমন চালনী দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে, সেরূপ বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করেছেন।"...

৩ ঋকে আছে: "বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞ দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হল। ঋষিগণের

১. এই তথ্য অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক 'হারাপ্পা-সভ্যতা' আবিষ্কারের পূর্বের ঘটনা। হারাপ্পা-সভ্যতার লিপি ছিল, নানা প্রকার লেখ্ আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু এ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয় নি। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আর্যগণ ভারতে অনুপ্রবেশকালে উপরোক্ত সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ঐ সভ্যতা ধ্বংস করে। লিপিও ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্তঃকরণের মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তা তাঁরা প্রাপ্ত হলেন। সেই ভাষা আহরণপূর্বক নানা স্থানে বিস্তার করলেন। সপ্তছন্দ সে ভাষাতেই স্তব করে" ইত্যাদি।[১]

এই সূক্তে ভাষা, বাক্য ও অর্থের কথা আলোচিত হয়েছে। আর্য ঋষিগণ উন্নত শ্রেণীর মানব এবং কবি ছিলেন। তাঁদের অন্তঃকরণে ভাষা লুক্কায়িত ছিল। ভাবে উদ্বেলিত তাঁদের কণ্ঠ থেকে ভাষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়েছিল—যা বেদ-চতুষ্টয়ে ধৃত আছে। এই স্তোত্রগুলো সাধারণতঃ সাতটি ছন্দে পাই। এ কারণেই ভারতীয় সাধুসন্ত ও মনীষিগণ, দার্শনিকগণ, বেদের শব্দরাজি নিত্য ও অপৌরুষেয় বলে বর্ণনা করে গেছেন। ঋষিগণ মন্ত্রের রচয়িতা নয়, শ্রোতা বা দ্রষ্টা মাত্র।

ঋগ্বেদের ৩/৩৯ সূক্তে গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি[২] বলেছেন: ঋক (১): "হে ইন্দ্র, তুমি জগৎপতি, হৃদয় থেকে উচ্চারিত ও স্তোতৃ সম্পাদিত স্তোত্র তোমার অভিমুখে গমন করছে। যে স্তুতি তোমাকে জাগরিত ক'রে যজ্ঞে উচ্চারিত হচ্ছে এবং আমা হতেই উৎপন্ন হচ্ছে, তা তুমি জানো।" ঋক (২): "হে ইন্দ্র, সূর্য হতেও পূর্বকালে, সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে উৎপন্ন যে-স্তুতি যজ্ঞে উচ্চারিত হয়ে তোমাকে জাগরিত করে, সে স্তুতি কল্যাণকর শুক্লবস্ত্র পরিধান করতঃ আমাদেরই পিতৃগণের নিকট থেকে আগত।" অর্থাৎ এই স্তোত্রের রচয়িতা তিনি নিজে নন, পিতৃপুরুষগণের নিকট থেকে (পুরুষ-পরম্পরায়) এসেছে। তিনি পরিমার্জিত ভাষায় উচ্চারণ করেছেন মাত্র। এই পরিমার্জিত ভাষাই বর্তমান ঋগ্বেদে আমরা দেখতে পাই। ঋগ্বেদেই আর্যগণের প্রাচীনতম ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমানে আমরা ঋগ্বেদ যে ভাষায় গ্রথিত দেখতে পাই তাকে সংহিতাপাঠ বলে। তারও পূর্বে এ ভাষায় আর একটি প্রাচীনতর মূর্তি ছিল, তার আভাস আমরা প্রাচীনতর ব্রাহ্মণসমূহে পাই। প্রাচীন ব্রাহ্মণে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ যে আকারে উদ্ধৃত হয়ে বিচারিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তা থেকে স্পষ্টতঃ অনুমিত হয় যে, ঋগ্বেদের সংহিতা কলেবরের পূর্বে আর একটি প্রাচীনতর মূর্তি ছিল। (পূর্বে লিখিত ঋষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক শুক্লবস্ত্র পরিধানের পরবর্তী)। ঋগ্বেদের সংহিতাপাঠ, প্রাচীনতর ব্রাহ্মণসমূহ রচিত হবার পরই বর্তমান কলেবর গ্রহণ করেছে। পাণিনি সংহিতা শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন—

---

১. ঋগ্বেদের এই ১০।৭১ সূক্তটি এগারটি ঋক নিয়ে গঠিত। মাত্র তিন ঋকের ব্যাখ্যা এখানে প্রদত্ত হলো।

২. প্রাচীন ভারতে তিনজন বিশ্বামিত্রের নাম পাওয়া যায়।

পরঃ সন্নিকর্ষঃ—সংহিতা। যেরূপ সান্নিধ্যবশতঃ সন্ধি, অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের বিকার হয়, তাকেই 'সংহিতা', বলে। ঋগ্বেদের সংহিতাপাঠে সম্ভবতঃ সন্নিকৃষ্ট পদগুলো সন্ধিবদ্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রাহ্মণে উক্ত আছে —"তু অম্ হি অগ্নে"; কিন্তু ঋগ্বেদের সংহিতাপাঠে আছে—"ত্বংহ্যগ্নে"। ঋষি সাকল্য তাঁর পদপাঠে সন্ধিবদ্ধের পূর্বে প্রত্যেকটি কথা কিরূপ ছিল তা দেখিয়েছেন। ঐ গ্রন্থই পদপাঠ নামে প্রসিদ্ধ। ঐতরেয় আরণ্যকে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অংশ) এই পদপাঠের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম ঋকেই আমরা দেখতে পাই—"অগ্নিমীলে পুরোহিতম" শব্দ দুটি। পদপাঠে তা ছিল—"অগ্নিং ইলে পুরঃ হিতম"।

বৈদিক সাহিত্য ধর্মমূলক। এই ধর্মমূলক সাহিত্যের জন্য বহুকাল থেকেই একটি শিষ্টসম্মত, সুসংযত এবং বিজ্ঞানানুমোদিত ভাষা প্রচলিত ছিল। ঐ ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ঋষিগণ সেকালে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন। পতঞ্জলী মহাভাষ্যে তার উল্লেখ আছে। এই ধর্মমূলক ভাষাতেই পরবর্তীকালে পার্সীদের ধর্মপুস্তক অবেস্তা লেখার প্রচেষ্টা হয়।

এটি ব্যতীত, কথঞ্চিৎ পৃথক এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য অপর একটি কথ্য ভাষারও তৎকালে প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে ঐ ভাষা আর্যভাষা নামে অভিহিত হতো। প্রাচীন পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পুরাকালে আর্যভাষায় রচিত হয়েছিল। বৈয়াকরণিকগণ এই জনপ্রিয় ভাষাকেই ধাপে ধাপে সংস্কার করে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন করেন। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত মহাপণ্ডিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ হলো এই দুই ভাষারই (বৈদিক ও সংস্কৃত) ব্যাকরণ। পাণিনি তাঁর গ্রন্থে ৬৪ জন পূর্বাচার্যের নাম লিখে রেখে গেছেন। এতেই অনুমান করা যায়, সংস্কৃত ভাষা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করতে বহু শতাব্দী পার হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রাপ্য বৈদিক ও সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীই সর্বপ্রাচীন। বৈদেশিক অনেক পণ্ডিতই পাণিনিকে এতটা প্রাচীনত্ব দিতে স্বীকৃত নন। যদিও ভিনসেন্ট স্মিথ, গোল্ডস্টুকর প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় পণ্ডিতদের (অধ্যাপক বেলভেলকার, বিশ্বনাথ কাশীনাথ, রাজকার প্রভৃতি) মত অনুসরণ করে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীই তাঁর আবির্ভাবকাল বলে উল্লেখ করেছেন। পাণিনি বুদ্ধদেবের (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) পূর্ববর্তী ছিলেন। পাণিনি যেমন ব্যাকরণ রচয়িতা তেমনি যাস্ক ছিলেন বর্তমানে প্রাপ্য নিরুক্ত রচয়িতাদের মধ্যে প্রাচীনতম। যাস্ক খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈদিক দুরূহ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও তার প্রয়োগ

প্রদর্শন করাই নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আচার্য যাস্ক তাঁর পুস্তকে বহু পূর্বাচার্যের —গার্গ, গালব, শাকটায়ন, উর্ণনাভ, শাকপূর্ণি, কৌৎস প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করেছেন। শাকপূর্ণি বেদব্যাসের প্রশিষ্য। গার্গ, গালব প্রভৃতি তৎপূর্ববর্তী; মহাভারতেও গার্গ ও গালবের নাম পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা অভিন্ন। কিন্তু শব্দরূপে, শব্দ বিভক্তির ব্যবহারে, ধাতুরূপ ও বিভক্তির ব্যবহারে, বিভিন্ন কালভাব প্রকাশে, অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠনে, বিভিন্ন প্রত্যয় ব্যবহারে এবং অনুসর্গ, উপসর্গ হিসাবে পদান্বয়ী অব্যয়ের প্রয়োগে—বৈদিক ভাষায় যে জটিলতা ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্য ছিল সংস্কৃত ভাষায় তা নেই এবং বৈদিক ভাষায় ব্যবহৃত বহু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় হয় লুপ্ত হয়ে গেছে নতুবা তার অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন ভারতীয় ভাষা বলতে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত আর্যভাষা—এই উভয় ভাষাই গণ্য হয়ে থাকে। প্রাচীন আর্যভাষায় প্রণীত পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পরবর্তীকালে মার্জিত হয়ে সংস্কৃত ভাষার রূপ পেয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, প্রাচীন আর্যভাষার বহু নিদর্শন ঐ সকল গ্রন্থে রয়ে গেছে। এই কারণেই অসংস্কৃত কোন প্রয়োগ দৃষ্ট হলে তাকে আর্য প্রয়োগ বলা হয়।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, বৈদিক ভাষা ধর্মমূলক। এই ভাষার ব্যবহার চারি বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণাদি (আরণ্যক ও উপনিষদ সহ) এবং প্রাচীন ছয় বেদাঙ্গ রচনার পরই লোপ পায়। বৈদিক যুগও শেষ হয়। এই ভাষায় (এ ভাষার অপর নাম ছান্দসী) যে-বিশাল বৈদিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল তার অধি-কাংশই লোপ পেয়েছে। অতি অল্প সংখ্যকই বর্তমান কাল পর্যন্ত বেঁচে আছে। চারিটি বেদ-সংহিতা আছে বটে কিন্তু তার প্রতিটির যে সকল শাখা ছিল তা প্রায় সবই লোপ পেয়েছে। যথা, ঋগ্বেদের যে ২১টি শাখা ছিল (মুণ্ডকোপনিষদে, পাতঞ্জল মহাভাষ্যে উল্লিখিত) তার মধ্যে মাত্র একটি শাখাই আছে। যজুর্বেদের ২৭টি শাখা ছিল, বর্তমানে দুটি আছে। সামবেদের বহু শাখা ছিল, বর্তমানে ৩টি মাত্র প্রচলিত আছে। প্রতিটি শাখার অন্ততঃ একটি করে ব্রাহ্মণ ছিল। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়াপ্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বর্ণনা করাই ব্রাহ্মণ সমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল। স্থানে স্থানে আনু-ষঙ্গিক ব্যাকরণাদি ও অবান্তর তত্ত্বও আছে। ব্রাহ্মণসমূহ গদ্যে রচিত। আরণ্যক ও উপনিষদ, ব্রাহ্মণেরই অঙ্গ। উপনিষদকে বলা হয় বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বর্তমানে চারি বেদের মাত্র ৮টি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট সবগুলিই লোপ

পেয়েছে। ব্রাহ্মণসমূহ কিন্তু সংহিতার ন্যায় উদাত্তাদি স্বরক্রমে উচ্চারিত হয়। বেদাধ্যয়নের সহকারী রূপে ছয়টি বেদাঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) উপরে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার প্রায় সবই লোপ পেয়েছে। ছয় বেদাঙ্গের উল্লেখ সামবেদান্তর্গত প্রাচীন ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে আছে। বৈদিক যাগযজ্ঞের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের অতি নিকট সম্পর্ক। বিশেষ বিশেষ তারিখে চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান অনুসারে যজ্ঞাদি আরম্ভ ও সম্পন্ন হতো। তজ্জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা বৈদিক যুগ থেকেই শুরু হয়। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩২ সূক্তে তিথি গণনা, ১০. ৮৫. সূক্তে নক্ষত্র গণনা, ১. ২৫. ৮ ঋকে মলমাস গণনা, ১০. ৮৫. ১৮ ঋকে ঋতু গণনা, ৫. ৪০. ৫-৯ ঋকে অত্রি বংশীয়দের গ্রহণ গণনা প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় কালে জ্যোতিষচর্চার সাক্ষ্য দেয়। ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অঙ্গ মাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১. ৭. ২) জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচনা দৃষ্ট হয়।

বেদকে অবলম্বন করে সেকালে বহু প্রকার গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, যথা: প্রতিশাখ্য (বৈদিক ব্যাকরণের পরিশিষ্ট), চরণব্যূহ, অনুক্রমণিকা প্রভৃতি। এগুলির অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। তৎসত্ত্বেও বৈদিক কালের গ্রন্থাদি বর্তমানে যা পাওয়া যায় তার পরিমাণ কম নয়। বৈদিক ভাষার এত গ্রন্থ কি সবই মুখে মুখে প্রচলিত ছিল? এর কি কোন লিপি ছিল না? এটা অবিশ্বাস্য কথা। এই ভাষার জন্ম ভারতের বুকেই হয়েছিল আর্য ঋষির কণ্ঠে; তার বিকাশও ঘটেছিল ভারতেই। বেদকে শ্রুতি বলা হয়, শুনে শুনে বেদ শিখতে হয় বলে নয়। বেদ ঈশ্বর বাক্য, আর্য ঋষিগণ এই বাক্য প্রথমে শ্রবণ করেছিলেন, সে কারণেই বেদ—শ্রুতি।

আমরা জানি হারাপ্পা-সভ্যতার যুগেও লিপি ছিল। অথচ বৈদিক যুগে আর্যদের কোন লিপি ছিল না, লেখ্যভাষা ছিল না—ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক-গণের এই প্রচার আমরা নির্বিচারে মেনে নিয়েছি এবং তা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। কিন্তু একথা কি সত্য? বিশাল বৈদিক সাহিত্য, (বর্তমানে প্রাপ্ত চারি বেদ-সংহিতা, আটটি ব্রাহ্মণ, বারোটি বেদান্তর্গত উপনিষদ, ছয়টি আরণ্যক) যার একমাত্র সংহিতা ভাগেই বিশ সহস্রাধিক শ্লোক, তা শুধুমাত্র স্মরণশক্তির সাহায্যে বংশপরম্পরায় অভ্রান্তভাবে সংরক্ষিত হতে পারে, এ কল্পনা অবাস্তব। বৈদিক যুগেই লিপিমালা আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং বেদ পাঠ করবার রীতিও প্রচলিত ছিল; এর প্রমাণ ঐ সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। যথা:

১. ঋগ্বেদে ১/১৬৪ সূক্তের দুই স্থলে অক্ষরের উল্লেখ আছে। ২৪ ঋকে আছে:

দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণী : "অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ বাক দ্বারা অনুবাক রচনা করেন এবং তাঁরা অক্ষর যোজনা দ্বারা সপ্তছন্দ রচনা করেন। আর ৪১ ঋকে আছে : "গৌরী তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্" —অর্থাৎ একপদী দ্বিপদী ইত্যাদি হয়ে, কখনো সহস্র অক্ষর পরিমিত হয়ে আকাশে থেকে শব্দ করেন। গৌরী শব্দের অর্থ সায়ণ করেছেন দেবগর্জন রূপ বাক বা শব্দ।

২. ঋগ্বেদের ১০/৭১ ভাষা-বিষয়ক সূক্তে, ৪ ঋকে আছে : "কেহ কেহ কথা দেখেও কথায় ভাবার্থ গ্রহণ করতে পারে না (উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ), শুনেও শোনে না।" লিপি দ্বারা লিখিত না হলে কথা দেখে কেমন করে ?

৩. ঋগ্বেদের ৪.৫৮.৩ ঋকে ব্যাকরণকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে : "এর চারটি শৃঙ্গ, তিনটি পদ, দুটি মস্তক ও সাতটি হস্ত আছে।" পতঞ্জলি ও সায়ণ উভয়েই ব্যাখ্যা করেছেন—চারটি পদ, তিনটি কাল, দুটি শীর্ষ (তিঙন্ত প্রত্যয় ও সুবন্ত প্রত্যয়), সাতটি বিভক্তি আছে। (চত্বারি শৃঙ্গাঃ, ত্রয়োঅস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্যা আ বিবেশ)। ইনি অভীষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শব্দ করছেন। মহতী দেবতা মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করছেন।

ঋগ্বেদের যুগে বেদপাঠ অবশ্যকর্তব্য ছিল। যজ্ঞে ঋকমন্ত্র পাঠের প্রয়োজন হতো। ঋগ্বেদের আদি স্তর থেকেই যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের মন্ত্রপাঠ দু'প্রকারের হতো—সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ। প্রতিটি পদকে সন্নিবদ্ধ রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথকভাবে উচ্চারণ করাকে ব্যাকৃত পদপাঠ বলে। সন্ধি-বিচ্ছেদ করে, ব্যাকৃত রূপে উচ্চারণ করতে হলে সন্ধির নিয়মগুলো জানা দরকার। সেগুলো ব্যাকরণের বিষয়। ঋক মন্ত্রগুলোকে যজ্ঞে প্রয়োগ করবার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের লিঙ্গ, বিভক্তি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে ব্যাকরণ জানা প্রয়োজন। পদের অর্থ গ্রহণ করতে, ভাষাকে শুদ্ধ রাখতে ব্যাকরণের প্রয়োজন হতে পারে। ঋগ্বেদের কালেই ব্যাকরণ ছিল। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে যে ৬৪ জন পূর্বাচার্যের নাম উল্লেখ করে গেছেন, তার মধ্যে কাশ্যপ, শাকল্য, গার্গ্য, গালব, শাকটায়ন, ভরদ্বাজ, সেনক, আপিসলি প্রভৃতি ঋষিগণ হলেন অতি প্রাচীন যুগের।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে এবং কোন কোন উপনিষদে ব্যাকরণের অনেক বিষয়ের এরূপ বিশদ চর্চা আছে, যা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। বেদের প্রতিশাখাতে, চারটি বেদের বিশেষ ব্যাকরণবিধি ও

উচ্চারণ প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। ঋগ্বেদের প্রতিশাখ্য রচনা করেছেন ঋষি শৌনক। এই প্রতিশাখ্য—ব্যাকরণ প্রধান। ঋষি শৌনক, ঋগ্বেদের সূক্ত রচয়িতা গৃৎসমদ-এর পুত্র। আবার অন্য এক ঋষি শৌনকের নাম পাই, যিনি ব্যাসদেবের শিষ্যক্রমে চতুর্থ পুরুষ। প্রতিশাখ্যের প্রাচীনতা এতেই প্রমাণিত হয়। অক্ষর না থাকলে, পদ না থাকলে ব্যাকরণ থাকে না, এটা তো সহজ সত্য।

৪. শুক্ল যজুর ৩৩. ৫০. ১-এ আছে: যারা পাঠ করে (শংসতে) স্তুতি করে, জপ করে, যারা ধন অর্জন করে ইত্যাদি। (যঃ শংসন্তে, স্তুবতে ধারি পজ্রা ইন্দ্র জ্যেষ্ঠা অস্মা আবন্ত দেবাঃ)। লিখিত আকারে কিছু না থাকলে পাঠ করার প্রশ্নই আসে না।

৫. কৃষ্ণ যজুর ১. ৮. ১৮ অনুবাক-এ "ব্রাহ্মণাচ্ছংসী"-র উল্লেখ আছে। যার অর্থ—ব্রাহ্মণ পুস্তক থেকে যারা পাঠ করে।

৬. ঋ ১০. ৯৩. ২-এ আছে: যিনি বিশিষ্ট রূপে অধ্যয়ন করে উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা দেবতাদের মনোরঞ্জন করেন। এক্ষেত্রেও বলা যায়, লিখিত কিছু না থাকলে অধ্যয়ন করে কি প্রকারে?

৭. ঋগ্বেদের ১০. ৬২. ৭ ঋকে "অষ্ট কর্ণ্যঃ" লিখিত আছে। অর্থাৎ, কর্ণে আট সংখ্যা লেখা। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে পঞ্চ কর্ণ, অষ্ট কর্ণ প্রভৃতির ব্যুৎপত্তিগত নির্দেশ আছে। গরুর কানে আট সংখ্যা লেখার অর্থ, এটি অষ্টম গরু। সংখ্যা লেখার চল থাকলে অক্ষর লেখারও চল ছিল, একথা ভাবা কি অন্যায়?

৮. অথর্ব বেদে (৭. ৫. ২.১) ঋক, সাম, যজুঃ অধ্যয়নের উল্লেখ আছে।

৯. যজুর্বেদের অঙ্গীভূত তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীর একাদশ অনুবাকে "স্বাধ্যায় ও প্রবচন"—শব্দ দুটির উল্লেখ আছে। শঙ্করাচার্য স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ করেছেন—অধ্যয়ন—বেদ অধ্যয়ন; এবং প্রবচনের অর্থ—বেদ অধ্যাপন। শব্দকল্পদ্রুমে স্বাধ্যায়-এর অর্থ দেওয়া আছে—আবৃত্ত্যা বেদাধ্যয়নম্—আবৃত্তি করে বেদ পাঠ।

১০. ঋগ্বেদ ছন্দে রচিত। প্রধানতঃ সাতটি ছন্দ। ছন্দের ভিত্তি হলো অক্ষর। অর্থাৎ, মূলতঃ অক্ষর মাত্রিক ছন্দ। কয়েকটি অক্ষর মিলে এক একটি পাদ রচনা করা হয়। প্রতি ছন্দের প্রতি পাদে অক্ষর সংখ্যা সমান থাকে। ছন্দের ভিন্নতা নির্ভর করে—বিশেষ ছন্দে ক'টি পাদ আছে এবং প্রতি পাদে ক'টি অক্ষর আছে তার উপর। তিন রকম স্বরে ছন্দোবদ্ধ ও সন্ধিবদ্ধ ঋগ্বেদ পাঠ বা আবৃত্তি করতে হয়। স্বরের উচ্চতা-নিম্নতা সূচীত করতে ঋকগুলোর অক্ষরের উপর বিশেষ চিহ্ন প্রয়োজন হয়। ঋগ্বেদের পদপাঠে পদের সন্ধি ও সমাস

বিশ্লিষ্ট করে পাঠ করতে হয়। লিখিত ভাষা না থাকলে এটা কি সম্ভব? যে ভাষার গঠনশৈলী এত উন্নত, সে ভাষায় লিপি থাকতে বাধ্য। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষ করে ঋগ্বেদের সঙ্গে, পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত এর ছন্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না জন্মে। বস্তুতঃ মন্ত্রের দেবতা, ঋষি ও ছন্দ সম্পর্কে যথোচিত জ্ঞান না থাকলে মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রাধ্যাপন ও মন্ত্র প্রয়োগ সবই দোষাবহ। মোট কথা, যা বৈদিক ক্রান্তদর্শী কবি-ঋষির চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিল তাই ছন্দ।

১১. সামবেদের একটি সূক্তে (সাম ৭ম খণ্ড ৮) আছে : ঋষিগণের দ্বারা রচিত এই পাবমানি ঋক যিনি পাঠ করেন তিনি উত্তম ফল লাভ করেন। পাঠ করতে হলে তো পুথি দরকার, এটা স্বীকার করতেই হয়।

১২. সামবেদের অন্তর্গত ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে। এ সবই বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। বেদাঙ্গকে বেদের পরিপূরক বলা যেতে পারে। এদের অস্তিত্বই তো বেদের লিপি ও ভাষার প্রমাণ। প্রকৃত বেদাঙ্গগুলি হয়তো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

১৩. পুরাণে ও অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চারিবেদ সঙ্কলন করেন শেষবারের মত। এর পূর্বেও বেদমন্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হয়ে থাকবে, কারণ ঋগ্বেদেই আমরা ঋক, সাম, যজুঃ-র নাম পাই, ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যাও দেখতে পাই। মন্ত্রগুলো লিখিত আকারে না থাকলে, ব্যাসদেব চারিভাগে তা ভাগ করলেন এবং সঙ্কলন করলেন কিভাবে? মুখে মুখে স্তোত্র রচনা চলতে পারে কিন্তু গ্রন্থ রচনা বা সংকলন করা চলে না। ঋগ্বেদে রাজা শান্তনুর উল্লেখ আছে, ব্যাসদেব তার পরবর্তী পুরুষ।

১৪. ঋগ্বেদে সহস্র, অযুত (৮.৩৪.১৫), নিযুত (৬.৬০.২) প্রভৃতি সংখ্যার উল্লেখ আছে। সংখ্যাতত্ত্ব যখন ভালোই জানা ছিল তখন এই জ্ঞান প্রমাণ করে, সেকালে লিখিত ভাষাও ছিল।

ঋগ্বেদে জ্ঞানের যেরূপ প্রসার দেখতে পাওয়া যায় তাতে সেকালে লিপি বা ভাষা ছিল না, এমন কল্পনা করা যায় না।

সেকালের লিপি এ-পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়নি বলেই তা ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত অসমীচীন। সুপ্রাচীন ভারতে ভূর্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতিতে পুথি রচনা করা হতো। চর্ম অপবিত্র বলে তাতে লেখা চলত না। প্রস্তর বা তাম্রপত্রে খোদাই করে লেখার প্রচলন বৈদিক যুগে হয়তো হয়নি। সম্ভবতঃ একারণেই বলা হচ্ছে যে,

হারাপ্পা লেখ্ একদিন বৈদিক যুগের লেখ বলে প্রমাণিত হতেও পারে। যদিও ঐ লেখার পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত হয়নি।

ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে পিতৃগণের কথা আছে, যথা: অঙ্গিরা, অথর্বা, দধীচি ভৃগু, অত্রি, মনু, কণ্ব প্রভৃতি (ঋ ১.৯৯.৯, ১০.১৫.৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ভারতীয় প্রাচীনতম ঋষিগণই পিতৃগণ। এ ঋষিগণই যজ্ঞের স্রষ্টা এবং প্রবর্তক। ঋষি অথর্বা সর্বপ্রথম অগ্নিকে উৎপন্ন করেছিলেন (ঋ ১০.২১৫, ১০.৯২.১০, ৬.১৬.১৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। এখানে অগ্নি বলতে হয়তো যজ্ঞাগ্নি ধরা হয়েছে। বৈদিক কালে কাষ্ঠে কাষ্ঠে অরণি ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপাদন করা হতো। শমী বৃক্ষের গাত্রে পরগাছা রূপে যে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মায় তারই ডাল কেটে কেটে অরণি কাষ্ঠ নির্মিত হতো। সোম যজ্ঞ প্রাচীনতম যজ্ঞ। সোম হলো লৌকিক অর্থে একপ্রকার ভারতীয় লতা। এই লতা কেবলমাত্র পাওয়া যেত মুজাবন পর্বতে (কাশ্মীর-এ), শর্যানাবত সরোবরে (কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে), সরস্বতী নদীতে এবং আর্জিকিয়া (বিয়াস) নদীতে। ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ নবম মণ্ডল সোম-স্তুতিতে পূর্ণ। ঋ ৯.৪২.৪ : প্রত্নমিৎ জয় : সোম সর্ব প্রাচীন। ঋ ৯.১১০.৮ : "দিবঃ পীযুষং পূর্বং"—অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেবতাদের প্রিয়। ঋ ৯.৮৬.১০ : "পিতা দেবানাং"—দেবগণের পিতা। ঋ ৯.২.১০ : "আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ—যজ্ঞের পুরাতন আত্মা। ঋ ৯.৬.৮ : "আত্মা যজ্ঞস্য"—যজ্ঞের আত্মা। ঋ ৯.৯৬.৫ : "জনিতেন্দ্রস্য"—ইন্দ্রের পিতা। এ সকলই সূচীত করে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে আর্যদের আদিম অধিবাসীত্ব। মুজাবত পর্বতে (হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ) পাওয়া যেত বলে সোমের অপর নাম ছিল মৌজবত (ঋ ১০.৩৪.১)।

বেদ কোন একজন ঋষির বা এক যুগের কিংবা শতাব্দীর সৃষ্টি নয়, তা সহস্রাধিক কালব্যাপী শত শত ঋষির সাধনা ও সিদ্ধির ফসল। ঋগ্বেদেই মন্ত্রদ্রষ্টা, সূক্ত রচয়িতা, পূর্বকাল জাতা পুরাতন ঋষিগণ, মধ্যকালীন ও ইদানীন্তন—তিন কালের ঋষিগণের উল্লেখ আছে (ঋ ৩.৩২.১৩, ৭.২২.৯, ৬.২১, ৬.২২.৭ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ঋ ১০.১৪.১৫ মন্ত্রে আছে : "পূর্বকালীন যে ঋষিগণ আমাদের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করে (ধর্মের) পথ দেখিয়ে গেছেন, তাঁদের নমস্কার করি।"

বেদের অনুক্রমিকাকার আচার্য শৌনক, প্রাচীন আচার্যগণের সর্বসম্মত প্রথা গ্রহণ করে—প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান পরমাত্মাই বেদ-প্রতিপাদ্য বলে ঘোষণা করেছেন। সকল দেবতার মূলে একই পরব্রহ্ম—পরমাত্মা। সেই অভিন্ন পরমাত্মার প্রকাশ সম্ভবপর নয় বলে, উপাধির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

প্রাথমিক দৃশ্য বিকার রূপে আদিত্যই উপাধি। বৈদিক মন্ত্রের ভিতরে যত দেবতা তার সকলই আদিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সকল দেবতার বীজ আদিত্যের বর্ণনা ও লক্ষণে পাওয়া যায়।

আদিত্যাত্মক প্রকাশরূপ তেজই সোম। ইন্দ্র সেই তেজই পান করেন। সেই জন্য রাত্রিকালে সূর্য তেজোহীন—এ প্রকার কল্পনা করা হয়।

সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রথম ঊষা থেকে শুরু করে স্মরণাতীত কাল ধরে বৈদিক যুগে যে সকল সত্যদ্রষ্টা মুনি-ঋষির আবির্ভাব ঘটেছিল তা সম্ভব হয়েছিল সপ্তসিন্ধুতেই, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতের বুকেই। বেদ-সংহিতায় আর্য ঋষিগণের স্পর্শপূত যে সকল ভৌগোলিক অবস্থানের, অর্থাৎ নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সরোবর, অঞ্চল প্রভৃতির নাম পাই, পুরুষ-পরম্পরা ঋষিগণের নামের সঙ্গে তা জড়িত; কিম্বদন্তী ও আখ্যায়িকা প্রভৃতির সঙ্গে যে সকল ভৌগোলিক নাম সংশ্লিষ্ট, তার সবই ভারতের বুকে অবস্থিত। বৈদিক দেবগণ ভারতেরই দেবতা। আর্যগণ কর্তৃক রচিত প্রথম গ্রন্থ বেদে যে-রাজগণের উল্লেখ পাওয়া যায় তারাও সবাই ভারতের। এমন কি সেকালের কিম্বদন্তীতে যে সকল রাজার নাম উচ্চারিত, সেই বেণ ও তৎপুত্র পৃথু, ধ্রুব, দক্ষ প্রভৃতি রাজারাও ছিলেন ভারতেরই মানুষ। চারিটি বেদ রচনা করা হয়েছিল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলেই। এ সবই সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের আর্যদের প্রাচীনত্বের প্রমাণ।

ইন্দ্র হলেন আদি দেবতা—শ্রেষ্ঠ দেবতা; তাঁর আবির্ভাবের পর প্রথম কার্যই হয়েছিল (ঋ ১.৩২.১ থেকে ১২) বজ্রের দ্বারা সৃষ্টির প্রথম অরি বৃত্রকে হনন করা। অর্থাৎ ইন্দ্র, সৃষ্টির প্রথম মেঘকে বিদীর্ণ করে বৃষ্টি সৃষ্টি করে পর্বত-কন্দর ভেদ করে সপ্তসিন্ধু (উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাতটি নদী) বইয়ে দিয়েছিলেন।

সেই সপ্তসিন্ধুতে বাসের জন্য তিনি আর্যদের জমি দিয়েছিলেন (ঋ ৪.২৬.২), বৃষ্টিদান করেছিলেন। এ দুই-ই সৃষ্টির প্রথম পর্বের কার্য। অর্থ ইন্দ্র-পুত্র, আর্যগণ সপ্তসিন্ধুতেই প্রথম সৃষ্ট হয়েছিলেন, লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন। এ দুই সূক্তে আর্যগণ যে বহিরাগত ছিলেন না সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

ইন্দ্র জন্মলাভ করেই সোম পান করেন, যে সোম একমাত্র সপ্তসিন্ধুতেই পাওয়া যেত। সপ্তসিন্ধুর নাম উল্লেখ করতে ঋষিগণ মুখর। এই অঞ্চলকেই বলা হয়েছে—'দেবকৃত যোনি' (ঋ ৩.৩৩.৪—দেব নির্মিত উৎপত্তিস্থল)। দেবগণ মানবজাতির বাসের জন্যই এই অঞ্চল প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। এই অঞ্চলের

মধ্যেই সরস্বতী, দৃশদ্বতী-আপয়া বিধৌত ব্রহ্মাবর্ত, যেখানে ব্রহ্মা সৃষ্টিমানসে বারে বারে আবর্তিত হন। সপ্তসিন্ধু বলতে কোন্ কোন্ সাতটি নদী-বিধৌত অঞ্চল বুঝায়, ঋগ্বেদে তার সঠিক উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদের ৭.৩৬.৬ ঋকে পাই, 'যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধু মাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া'। এতে অনুমিত হয়—সিন্ধু, তার পাঁচটি উপনদী ও সরস্বতী—এই সাতটি নিয়েই সপ্তসিন্ধু। প্রথম দিকে হয়তো সপ্তসিন্ধু একেই বলত, পরে এর সঙ্গে যমুনা ও গঙ্গা যুক্ত হয়। ঋগ্বেদে ১০.৭৫ সূক্তে নদীস্তুতিতে সিন্ধু থেকে সরস্বতী-যমুনা-গঙ্গাসহ বড় নদী-গুলোর উল্লেখ পাই। সিন্ধু থেকে গঙ্গা-বিধৌত অঞ্চলই সপ্তসিন্ধু নামে খ্যাত।

এই সপ্তসিন্ধুর মধ্যেই সরস্বতী, আপয়া-দৃশদ্বতী নদী-বিধৌত অঞ্চলই ছিল আর্য-সভ্যতার মধ্যমণি বা মর্মকেন্দ্র। এই অঞ্চলেই ঘটে জীবনের প্রথম স্ফুরণ। সরস্বতী নদীকেই অন্ন (জীবন) আশ্রয় করেছে। অন্নসম্ভবা সরস্বতী নদী মানবগণকে ভূমি দান করেছে। (ঋ ২.৪১.১৭)। 'সরস্বতী নদীই মানবের প্রথম আশ্রয়স্থল'। ঋষিগণ আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন, যেন সরস্বতীর নিকট থেকে অন্যত্র গমন না করেন। এই অঞ্চলেই 'পঞ্চজাতা বর্ধয়ন্তী' (ঋ ৬.৬১.১২)। অর্থাৎ, বেদের প্রসিদ্ধ পঞ্চ মানবজাতিগোষ্ঠী সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। সরস্বতী—"নদীতমে অম্বিতমে, দেবীতমে" (ঋ ২.৪১.১৬)। পৃথিবীর নাভি-স্থল—ইলায়াস্পদাতে (সরস্বতী-দৃশদ্বতী অঞ্চলে) রাজা ভরতের পুত্র ঋষি দেবরাত দেবশ্রবা সুদিন লাভের জন্য অগ্নিকে স্থাপন করেছিলেন ও প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, অগ্নি যেন দৃশদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতী তীরস্থ মানুষের গৃহে ধনবিশিষ্ট হয়ে দীপ্ত হন (ঋ ৩.২৩.৪)। ঋগ্বেদের ৮.৩৯.৮ ঋকে আছে: "যে অগ্নি সপ্ত মনুষ্যবিশিষ্ট ও সকল নদীতে আশ্রিত, আমরা তাঁর নিকটে গমন করি।" সপ্ত মনুষ্য—এ কথার অর্থ সম্ভবতঃ সপ্তনদী-তীরস্থ মানুষ। সপ্তসিন্ধু-তীরেই অধিকাংশ যজ্ঞ হতো। এই সপ্তসিন্ধু দেশেই পঞ্চ জনপদের মনুষ্যগণ যেন স্বর্গ সুখে থাকে—এই প্রার্থনা জানিয়েছেন ঋষি ১০.৬০.৪ ঋকে। এ সকলই প্রমাণ করে যে, আর্যগণ বহিরাগত মানুষ নন, তারা এই অঞ্চলেরই প্রাচীনতম অধিবাসী। আর্যাবর্ত নাম মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় ২২ শ্লোকে আছে। উক্ত পুস্তকের ভাষ্যকার কুল্লুক ভট্ট এই নামের অর্থ করেছেন—আর্যাবর্ত সেই অঞ্চল, যেখানে আর্যগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।

আর্য : প্রাচীন ভারতে

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—এই চারটি পর্ব নিয়েই বিশাল বৈদিক সাহিত্য। আর্যগণের উল্লেখ আছে এর প্রতিটি পর্বে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে আর্য শব্দ হলো দাস শব্দের বিরোধীবাচক, শূদ্রবিরোধী বলেও তা বর্ণিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকেই বলা হতো আর্য, শূদ্রকে নয়। কারণ শূদ্ররা যজ্ঞ করত না। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল ঋগ্বেদের কালেই। কিন্তু সেই সময়ে গুণ-কর্মের বিভাগ অনুসারে এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে ঐ প্রথা বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। বৈদিক সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীন পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতে, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে, জাতক এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে আর্য শব্দের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তায় "অহুর-মাজদা"র উপাসকদের আর্য বলা হয়েছে। জাতি বা এক ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী হিসাবে আর্যত্ব আরোপিত হয়নি। বশিষ্ঠ স্মৃতিতে আছে, "তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সতু" ইতি স্মৃতঃ। অর্থাৎ, প্রকৃত আচারে যিনি স্থিত, তিনিই আর্য। ঋগ্বেদে আর্য বলতে বিশ্বস্ত, দয়াবান, সৎ, প্রভু, শিষ্ট প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণ বিভীষণকে ভৎর্সনা করছেন: "তুমি ভ্রাতৃস্নেহহীন অনার্য। মধুকর যেমন রসপান করে পলায়ন করে, অনার্যের সৌহার্দ্যও সেরূপ।" রাবণ নিজেকে আর্য মনে করতেন, ভাবতেন ব্রাহ্মণ বংশজাত। রামায়ণে কপিগণও সম্ভ্রমাত্মক সম্বোধনে আর্য শব্দটি ব্যবহার করতেন। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তার খুল্লতাত বিভীষণকে ভৎর্সনা করেছেন অনার্যের মত আচরণের জন্য।

মহাভারতে কুরুরাজ দুর্যোধন সিন্ধুরাজের অনুরোধ রক্ষা না করার জন্য, নিজেকে অনার্য (দ্রোণপর্ব, ১৫২ অধ্যায়) বলে অনুযোগ করেছেন। পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদী অভিযোগ করে বলেছেন, যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় নীচ অনার্য মানুষেরা প্ররোচিত করেছে (সভাপর্ব ৭৩ অধ্যায়)।

ব্রাহ্মণ সমূহে ঋষিগণ প্রচারিত 'ধর্মকেই' আর্যধর্ম বলা হয়েছে। আর পাণিনি আর্য শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন (৩. ১. ১০৩): আর্য—স্বামী ও প্রভু, আবার বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ নিজেদের প্রভু বা স্বামীরূপে মনে করেন, অপরের ক্রীতদাস রূপে নন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) উল্লেখ করা হয়েছে (৩ : ১৩) : যে-শূদ্র জন্মগত ক্রীতদাস নয়, প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, জন্মে আর্য, তাকে বিক্রয় করতে গেলে বা বন্ধক রাখতে গেলে ১২ পণ জরিমানা হবে। ম্লেচ্ছরা তাদের পুত্রকন্যা বিক্রয় করতে গেলে বা বন্ধক রাখতে গেলে তাদের কোন অপরাধ হয় না ; কিন্তু কখনো কোন আর্যকে ক্রীতদাসে পরিণত করা যাবে না।·· যে-আয নিজেকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করেছে, তার সন্তান-সন্ততিরা আর্য। একজন ক্রীতদাস তার বিক্রীত মূল্য ফেরত দিলেই 'আর্যত্বম' ফিরে পাবে। উপরোক্ত বিবরণীতে মনে হয়, কৌটিল্যের সময়েও শূদ্রগণ ক্রীতদাস ছিল না, তারাও ছিল আর্য।

প্রাচীন জৈন অভিধান চিন্তামণি, রাজেন্দ্র প্রভৃতিতে এবং অর্ধমাগধী অভিধানে, আর্য শব্দের উল্লেখ আছে—কতকগুলো সৎগুণের অধিকারী হিসাবে ; কোথাও তা একটা পৃথক জাতি হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়নি।

বৌদ্ধ জাতকেও (৩০০ খ্রীঃ পূঃ) আর্য শব্দের ব্যবহার আছে সম্ভ্রমাত্মক হিসাবে, অর্থাৎ গুণগত বিচারেই শব্দটি ব্যবহৃত, জাতিবাচক বিচারে নয়।

পালি টীকাকারের মতে, আর্য শব্দের অর্থ—চতুর্বিধ। অর্থাৎ, যে সংস্কার সম্পন্ন, যার চালচলন মনুষ্যজনোচিত ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সংগীতিসূত্রে যে চতুর্বিধ আর্য বংশের উল্লেখ আছে তা হলো : যিনি যে-চীবর (কৌপীন) প্রাপ্ত হন ও তাতেই সন্তুষ্ট, যিনি যে-ভোজ্য প্রাপ্ত হন এবং তাতেই সন্তুষ্ট ইত্যাদি। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা সাধুতার উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করেছেন তাঁরাই আর্য (মহাসাগর জাতক, পৃ. ২৩)। বৌদ্ধজাতকে আর্যকা-র অর্থ—ঠাকুর মা, আর্যপুত্রের অর্থ—স্বামী। বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ-এ আছে : আর্য ভাষার অর্থ—বৌদ্ধসংস্কৃতি ভাষা। বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্মের চারটি মূলতত্ত্বকে আর্য সত্য আখ্যা দিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মকেও আর্যধর্ম বলা হতো। ভারহুত-এর বৌদ্ধ শিলালেখে পাওয়া যায়—"ভদান্তাস আয় ভূত রাখিত"। ডঃ বড়ুয়া এর অর্থ করেছেন : "বৌদ্ধদের কাছে আর্য সেই ব্যক্তি, যে তার রিপুর, দেশাচারের, প্রথার প্রমাণহীন মতবাদের দাস নয়···এবং যে আত্মসচেতনভাবে জীবনযাপন করে।" ভারহুত-এর আর একটি শিলালেখে আছে, আর্যত্বের পথে যে সকল ভিক্ষু এগিয়েছে তাদের আর্য সম্বোধন করা হতো (দ্র. বি. এম. বড়ুয়া ও পি. সিংহ প্রণীত "ভারহুত লেখ", পৃ. ৬)। বুদ্ধ ও মহাবীর-এর যুগেই রাজগৃহ, চম্পা (অঙ্গ দেশের রাজধানী) ও তাম্রলিপ্তের জনগণ, আর্য ও ক্ষত্রিয়রা, সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন বলে বর্ণিত হয়েছে (দ্র. *Pre-Aryan & Pre-Dravidian in the Vedas* by S. Levy)।

ঋগ্বেদের কালে, ঐ মগধই ছিল অনার্য কীকটদের দেশ। পরবর্তীকালে, তাদেরই বংশধরগণ নিশ্চয় আর্যত্বে উপনীত হয়েছিলেন।

আর্য শব্দের উৎপত্তি ভারতবর্ষে, এর ব্যবহারও ছিল ভারতেই। ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ পারস্যেও প্রাচীনকালে এই শব্দের ব্যবহার ছিল, যখন ভারতের দেবতারা ছিলেন তাঁদেরও দেবতা এবং ভারতীয় আর্যগণের প্রবর্তিত ধর্ম তাঁরা পালন করতেন। জরথুষ্ট্র কর্তৃক নতুন ধর্ম প্রচারের পরেও, অহুর মাজদার উপাসকগণকেও আর্য বলা হতো। পারস্যের সম্রাট দরায়ুস (৫২১-৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ) তাঁর শিলালিপিতে নিজেকে আর্য বলে দাবী করেছিলেন আর্য বংশোদ্ভব হিসাবে। তাঁর সময়েও পারস্যে রাজ-প্রতিকূলতা সত্বেও আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ছিল। এর পরিচয় দরায়ুস বংশের শিলালিপিতেই পাওয়া যায়—ভারতীয় ঋষিগণের প্রবর্তিত ধর্মের, দেব-আরাধনার বিরুদ্ধাচারণের মধ্য দিয়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঋগ্বেদে বা অপর তিন বেদে পারস্যের বা জরথুষ্ট্রের কোন উল্লেখ নেই, কারণ জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব অনেক পরের ঘটনা।

ভারতীয় পুরাণ সমূহেও আর্য শব্দের উল্লেখ আছে। পুরাণ সমূহ প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তথ্যের, কিম্বদন্তীর ও আখ্যানের ভাণ্ডার। ঋগ্বেদের সমসাময়িক এবং তার পূর্বেরও ইতিবৃত্ত আমরা পুরাণ সমূহে পাই। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে পুরাণকে ঊর্ধ্বেই স্থান দিয়েছে। অথর্ববেদে, ছান্দোগ্য উপনিষদ ও চারি বেদের পরেই পুরাণের স্থান। শতপথ ব্রাহ্মণে দৈনিক পুরাণ পাঠের উল্লেখ রয়েছে—দেবগণকে মধু আহুতি রূপে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও পুরাবিদ-এর উল্লেখ রয়েছে। পুরাণে রয়েছে—ব্রহ্মার মানসপুত্র সপ্তঋষি থেকে বৈদিক ঋষিগণের সৃষ্টির কথা। স্বায়ম্ভুব মনু থেকে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত কিম্বদন্তীর যুগ। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোর সূত্রপাত হয় বৈবস্বত মনু থেকে। বাইরের থেকে আর্যগণের ভারতে প্রবেশের কোন ইঙ্গিতই পুরাণ সমূহে আমরা পাই না। পুরাণসমূহে প্রাচীন ভারতের রাজগণের ও ঋষিগণের বংশাবলী বিবৃত রয়েছে। সপ্তসিন্ধুই হলো আর্যগণের বাসভূমি, সেই প্রাগৈতিহাসিক কিম্বদন্তীর কাল থেকেই। আর্যরা কোন ভিন্ন মানব-জাতিগোষ্ঠী (race) নয়, ভিন্ন ভাষাভাষীগোষ্ঠীও নয়। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণেরাও সঙ্গত ভাবেই নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দেয়। আচার্য শঙ্কর কেরলের অধিবাসী হলেও আর্য। বৈদিক যুগে ঋষিগণ বিশ্বের সকলকেই 'আর্য' করার স্বপ্ন দেখতেন (কৃণ্বন্ত বিশ্বম্ আর্যম্), সে কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মিউয়র (Muir) সাহেব লিখেছেন, " I must

however begin with candid admission that so far as I know, none of the Sanscrit books, not even the most ancient contain any distance reference or allusion to the foreign origin of Indians. (দ্র. *Original Sanscrit Texts*, Vol II, p. 322)

মনুসংহিতার মতে, সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চল—ব্রহ্মাবর্ত্তই বেদের উৎপত্তিস্থল। ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুপাঞ্চাল, শূরসেন ও মৎস্য দেশ নিয়ে ব্রহ্মর্ষি নামক দেশটি ছিল বৈদিক আচারের কেন্দ্রস্থল। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরস্থ মূজাবন্ত, মহাবৃষ, গান্ধার, বাহ্লিক প্রভৃতি অঞ্চল সপ্তসিন্ধুর অন্তর্গত হলেও ঋগ্বেদে ঐ সকল অঞ্চলের দু-চারজন রাজা বা যাগযজ্ঞের উল্লেখ ব্যতীত অন্য কিছুই সেই যুগে কোন মর্যাদা পায়নি। ঐ অঞ্চলের কোন গাথা, কিম্বদন্তী বা কাহিনী ভারতে প্রচলিত নেই। অথর্ববেদ বরং তাদের হেয় রূপেই চিত্রিত করেছে : "তকমান (এক-প্রকার জ্বর) তাদের আক্রমণ করুক" (৫. ৪. ১-৭, ৮ ও ১৫)। প্রাচীনতম কিম্বদন্তী কখনো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে আর্যদের ভারতে আগমন সমর্থন করে না।

প্রাচীনতম কিংবদন্তীর নায়ক রাজা পুরুরবার (বৈবস্বত মনুর কন্যার পুত্র) আবির্ভাব ঘটেছিল সপ্তসিন্ধুর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেই। তিনি যে সকল অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং যেখানে গন্ধর্বগণ বাস করতেন, সেই মন্দাকিনী, অলকা, চৈত্ররথ, নন্দনবন, মেরু (রাজপুতানা সন্নিহিত), উত্তর কুরু (কাশ্মীর) প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ছিল সপ্তসিন্ধুর অন্তর্গত।

কথিত আছে যে, বিবস্বান-পুত্র বৈবস্বত মনু, ঋগ্বেদের আদি সূক্ত রচয়িতা। (ঋ ১. ৭১. ৩, ১. ১১২. ১৬, ৮. ২৮, ৮. ২৯, ৮. ৩০, ৮. ৩১ প্রভৃতি)। তিনি ছিলেন রাজর্ষি। তাঁর পুত্রগণ ও দৌহিত্র, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে ভারতে দুইটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, এঁরা সপ্তসিন্ধুতে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছেন। এঁদের উল্লেখ আমরা পুরাণ সমূহে, বৈদিক ও প্রাচীন সাহিত্যে, রামায়ণে ও মহাভারতে পাই। ঋগ্বেদেও এ দুই রাজবংশের কিছু কিছু রাজার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু বৈবস্বত মনুই সপ্তসিন্ধুর তথা ভারতের প্রথম রাজা নন। তাঁর পূর্বেও তাঁরই পূর্বপুরুষগণ সপ্তসিন্ধুতে তথা ভারতে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন, যাঁদের উল্লেখ পুরাণ সমূহে, বৈদিক ও প্রাচীন সাহিত্যে রয়ে গেছে। প্রাচীনতম ভারতে, কাল গণনায় পুরাণ সমূহে মনুকল্প-র উল্লেখ আছে। মনু-যুগের অন্তর্বিভাগ বা অন্তর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির উল্লেখ যজুর্বেদে (কৃষ্ণ যজুঃ ৪. ৩. ৫০) আমরা দেখতে পাই। ঋগ্বেদে তিনজন মনু-র নাম আছে,

যথা : সাম্বরণি মন্থ, বৈবস্বত মন্থ ও সাবর্ণি মন্থ। পুরাণ মতে বৈবস্বত সপ্তম মন্থ এবং সাবর্ণি অষ্টম মন্থ। এর পরে মন্থগণনা বন্ধ হয়ে যায়। সাম্বরণি মন্থ (ঋ ৮. ৫১. ১)-র উল্লেখ পুরাণে নেই। সাবর্ণি মন্থই হয়তো সাম্বরণি মন্থ। বৈবস্বত মন্থ, সপ্তম। সাবর্ণি মন্থ (ঋ ১০. ৬২. ৯-১০ ও ১০.৯৩)—পুরাণ মতে অষ্টম মন্থ। সুতরাং বেদ-সংহিতায় পৌরাণিক কাল গণনা—মন্থকল্প অপরিচিত ছিল না। বৈবস্বত মন্থর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে আমরা রাজা উত্তানপদ (ঋ ১০. ৫১ ৭২. ৩-৪), বেন ও তৎপুত্র পৃথি বা পৃথু (ঋ ১. ১১২. ১৫, ১০. ১৪৮, ৫. ৮. ৯. ১০), দক্ষ (ঋ ১০. ৭২. ৫) প্রভৃতির নাম ঋগ্বেদে পাই। উত্তানপদ-এর পুত্র ধ্রুব-র উপাখ্যান আজও ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত। স্বায়ম্ভুব মন্থর রাজধানী ছিল সরস্বতীর তীরে। শতপথ ও কৌশিতকি ব্রাহ্মণে পৃথু থেকে পঞ্চম পুরুষ দক্ষ প্রজাপ্রতি দাক্ষায়ণী যজ্ঞ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। দক্ষ প্রজাপতির কন্যার পুত্র বৈবস্বত মন্থ। বিবস্বান, দক্ষ প্রজাপতির জামাতা। পুরাণ সমূহে সায়ম্ভুব মন্থ থেকে এইসব আর্য রাজগণের কাহিনী বংশানুক্রমে বর্ণিত আছে। কিংবদন্তী কালের এইসব রাজগণ (পুরাণে বলা হয়েছে—ইতি বা শ্রুতম অথবা অভিশ্রুতম) ২১৪৪ বৎসর রাজত্ব করে গেছেন। চার বেদে, বৈদিক সাহিত্যে, রামায়ণ-মহাভারতে এঁদের কিছু কিছু নামের উল্লেখ থাকায় এই রাজবংশকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অথর্ববেদে (৮. ৫. ১০-১১), ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই বংশের বিখ্যাত রাজা পৃথু বা পৃথির পৃথিবী দোহন করার কাহিনীর উল্লেখ আছে। পৃথু প্রজাপালক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি গোরূপী পৃথিবীকে দোহন করে প্রবল দুর্ভিক্ষ থেকে মর্ত্যলোককে রক্ষা করেন (ঋগ্বেদ পৃথিবীকে বহুস্থলে গো রূপে উল্লেখ করেছে)। পৃথু রাজার এই উপাখ্যান অতি প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত কালিদাসের কুমারসম্ভবে, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে, শ্রীহর্ষের নৈষধ কাব্য প্রভৃতিতে স্থান পেয়েছে। এই রাজার নাম অনুসারেই পৃথিবী নামটি প্রচারিত হয়েছে বলে কথিত আছে। ঋগ্বেদের ১০. ১৪৮ নামক সূক্তটিতে ঋষি পৃথু বলে উল্লেখ আছে। এই সূক্তেই বেন-এর পুত্র পৃথির যজ্ঞগৃহে এসে ইন্দ্রকে স্তব করার কথা আছে। এই সূক্তটি বেন-এর পুত্র পৃথুরাজার রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৈবস্বত মন্থর রচনার পূর্বে এই একটি মাত্র সূক্তই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। পৃথুর সময়ে যজ্ঞও ছিল, ইন্দ্ররূপী দেবতাও ছিলেন। সুতরাং পৃথু যে আর্য রাজা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বায়ম্ভুব মন্থবংশের দ্বিতীয় পর্বের রাজা, ধ্রুব-র পিতা উত্তানপদ ভারতের প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা রূপে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

পুরাণ সমূহে স্বায়ম্ভুব মনু থেকে প্রচেতাগণ পর্যন্ত ৪৯ জন রাজার নাম পুরুষানুক্রমে দেওয়া আছে। তারপর দেশ বহুকাল পর্যন্ত অরাজক অবস্থায় ছিল বলে কথিত আছে। দ্বিতীয় পর্বে ঐ বংশেরই রাজা উত্তানপদ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বংশের দক্ষ প্রজাপতি, তৎকন্যা অদিতি, জামাতা বিবস্বান ও তৎপুত্র বৈবস্বত মনু-র উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। এতদ্ব্যতীত, বিশ্বগ জ্যোতি, চক্ষু, তৎপুত্র চাক্ষুস মনু, অঙ্গ, প্রাচীন বর্হি প্রমুখেরা ছিলেন বিখ্যাত রাজা। চাক্ষুস মনুর সময়ে সংঘটিত ভয়াবহ এক প্রলয়ের কাহিনী আছে। পুরাণ সমূহের মতে, স্বায়ম্ভুব মনু থেকে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত ৮৭ পুরুষের ব্যবধান—২১৪৪ বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালের আর্যগণ তাই কিংবদন্তী অনুসারে ভারতেরই অধিবাসী। স্বায়ম্ভুব মনু নিজেকে স্বয়ং সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং সৃষ্টির আদি-কাল থেকেই, অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান-উন্মেষের প্রথম পদক্ষেপ থেকেই আর্যগণ ভারতেরই অধিবাসী।

কিংবদন্তী অনুসারে বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু (ঋগ্বেদে উল্লিখিত) অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। উক্ত মনুর দৌহিত্র রাজা পুরুরবা ও তার বংশধর-গণ প্রতিষ্ঠানপুরে (এলাহাবাদের নিকটে) রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এ দুটি নগরীই ভারতের পশ্চিম সীমান্ত থেকে বহু পূর্বে অবস্থিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পশ্চিম থেকে ভারতে কোন অভিযান হয়েছিল, এমন কোন ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে নেই।

ঋগ্বেদের রচনাকাল

ঋগ্বেদের সূক্তগুলো কোন্ সময়কালে রচিত তা জানতে পারলে আর্যদের সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করা যেতে পারে। ভারতের আর্যভাষা বাইরের থেকেই এসেছে, না ভারতের ভাষার কাছেই ইয়োরোপীয় ভাষা সমূহ ঋণী, তা অনুমান করা যায়।

বেদ যে কত প্রাচীন তার ইঙ্গিত বেদের মধ্যে রয়েছে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে প্রাকৃতিক অবস্থানের যে-বর্ণনা আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে পাই তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেই কালটি অন্ততঃ বর্তমান কাল থেকে ৫০০০—৬০০০ বৎসর পূর্বেই হবে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের চারিদিকে সেই কালে চারটি সাগর ছিল (ঋ ৯. ৩৩. ৬, ১০. ৪৭. ২)। সূর্য পূর্ব সাগর থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম সাগরে অস্ত যেত (ঋ ৩. ৫৫. ১, ৪. ৪৩. ৫, ৫. ৮০. ৪-৫, ১০. ১৩৬. ৫ প্রভৃতি)। ঋগ্বেদের অনেকগুলো সূক্তেই সূর্যকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যকে বলা হয়েছে কেশী, যেখানে তিনি লুক্কায়িত ছিলেন—দেবগণ সেই সমুদ্র থেকে সূর্যকে ঊর্ধ্বে উত্থিত করালেন (ঋ ১০. ৭২. ৭)।

উষার অগ্রদূত অগ্নি সাগরসন্তান, পূব দিক থেকেই তার উদয় (ঋ ১. ৪৬. ২)। উষা পূব দিক থেকেই প্রথম উদয় হন (ঋ ৩. ৫৫. ১)।

সপ্তসিন্ধুর চারিদিকে চারটি সাগরের অস্তিত্ব ছিল, এ কথা বর্তমানে কল্পনা করাও কঠিন। একমাত্র দক্ষিণ সাগরের কথা কল্পনা করা যায়। বর্তমান রাজপুতানা ও পাকিস্তানের মধ্যে যে থর মরুভূমির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, তার এক বৃহদাংশ জুড়ে সেকালে সাগর ছিল এবং তা বর্তমান রান অব কচ্ছ-র সঙ্গে যুক্ত ছিল; আরাবল্লী পর্বতটি ছিল পূর্বদিকে। সাগরটি ছিল আরব সাগরেরই একটি অংশ।[১] এই সাগরেই মিলিত হতো সরস্বতী ও শতদ্রু নদী। সাগর খুব নিকটে ছিল বলেই ঋগ্বেদীয় ঋষিগণ সাগর সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন। কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পূর্ব ও পশ্চিম সাগরের অর্থ বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর, আবার কেউ কেউ সিন্ধু নদীকেই পশ্চিম সাগর বলেছেন। সপ্তসিন্ধু থেকে বঙ্গোপসাগর বহু দূরে অবস্থিত। তা ছাড়া বঙ্গোপসাগর কোন ক্রমেই সপ্তসিন্ধুর পূর্বদিকে অবস্থিত হতে পারে না। তেমনি আরব সাগরও পশ্চিমে নয়। কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পূর্ব সাগর ও পশ্চিম সাগরের অর্থ—আকাশ। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। আকাশকে ঋগ্বেদে অনেক স্থলেই সাগর বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এখানে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি পৃথক সাগরের উল্লেখ রয়েছে। আকাশ একটি মাত্র সাগর। সূর্যের উদয়াস্ত আকাশে হয় না। চারিদিকে বিরাজিত সেই সাগরের একটিরও অস্তিত্ব আজ আর নেই। কালচক্রে সবগুলিই বিলীন হয়ে গেছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নদীস্তুতিতে পাঁচটি বৃহৎ ভিন্ন ভিন্ন নদীর উল্লেখ আছে, যথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু ও সিন্ধু। এগুলি সাগরে গিয়ে পড়ত। সরস্বতীর ন্যায় শতদ্রুও তরঙ্গময়ী আর খরস্রোতা নদী ছিল এবং

১. (ক) "Rajputana was a sea, during the time of the Indus Civilisation and perhaps much earlier. This also supports the theory of some geologists that during a still earlier geological period, an area of the Arabian sea went along where the Vindhya Hills now are." H. D. Sankalia

(খ) *Encyclopedia Britannica*, Vol. XXII, p. 865. (Eleventh edition)

(গ) *Gazetteer of the Indian Empire*, Vol. 1. p. 102 (1907)

(ঘ) *Memoirs of the Geological Survey of India*, Vol. XLV, p. 103.

(ঙ) রাজপুতানার উন্নয়ন কমিশনার ডাঃ গডবোল (Dr. Godbole) রাজস্থানের স্থানে স্থানে কূপ খনন করে সামুদ্রিক লবণের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

সেটিও সাগরে গিয়ে পড়ত। এই নদীর প্রাচীন খাতের চিহ্নটি বর্তমান কালেও দেখতে পাওয়া যায়।

বৈদিক কালে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে শীত ও বর্ষা ঋতুর ছিল প্রচণ্ড প্রকোপ। ঋগ্বেদে কোথাও ছয়, কোথাও পাঁচটি ঋতুর উল্লেখ থাকলেও (হেমন্ত ও শীত একত্রে) তিনটি ঋতু, অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতুই ছিল বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই তিনটি ঋতুই নাভি বলে বর্ণিত ছিল (ঋ ১. ১৬৪. ৪৮)। বৎসর শুরু হতো হিমমাস থেকে। বর্ষাও ছিল প্রচণ্ড, তিন-চার মাস ধরে চলত বর্ষা (ঋ ১. ১৬৪. ৩৬ ও ৪৭; ১. ১৬৪. ৬-৮; ১. ৩৮. ৩-৮; ৩. ৫৬; ৫. ৫২, ৫.৮৩, ৫. ৫৭. ৫-৭ প্রভৃতি)। সেকালে ভূ-প্রকৃতি ঐ এলাকায় স্থিতি লাভ করেনি। ভূ-কম্পন, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও দুর্লক্ষ্য ছিল না।[১]

পারসীকগণের অবেস্তাতে উল্লেখ করা হয়েছে : হপ্তহিন্দুতে (সপ্তসিন্ধুতে) পুরাকালে খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়া ছিল। অনথমৈন্য (অশুভ শক্তি) তা গরম আবহাওয়ায় পরিণত করে। ঋগ্বেদে এমন সময়ের উল্লেখ রয়েছে যখন হিমালয়ের হিমবাহ (তুষার প্রবাহ) পর্বতের নিম্নদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রচুর তুষারপাত ছিল, তাই নদীসমূহ ছিল অত্যন্ত খরস্রোতা, পর্যাপ্ত জলও সাগরে প্রবাহিত হতো। চারিদিকে সাগর বলেই প্রকৃতি এরূপ ছিল।[২]

১. ঋ ২. ১২. ২ : "ইন্দ্র, যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, যিনি প্রকোপিত পর্বত-সমূহকে নিয়মিত করেছেন।"

ঋ. ১.৬৩.৩ : 'হে ইন্দ্র, তুমি সর্বাগ্রগণ্য, ভয়ের সময় তোমার শত্রু-শোষণকারী বলের দ্বারা তুমি দ্যাবা পৃথিবী ধারণ করেছিলে। বিশ্বের সকল ভূত ও পর্বতসমূহ এবং অন্য যেসকল মহৎ ও দৃঢ় পদার্থ আছে তাহাও নভোমণ্ডলে সূর্যরশ্মির ন্যায় তোমার ভয়ে কম্পিত হয়েছিল।"

ঋ. ১.৬২.৫ : "তুমি পৃথিবীর সানুপ্রদেশগুলি সমতল করেছ, অন্তরীক্ষের মূল প্রদেশ করেছ দৃঢ়।"

২. "An explanation of the decrease of Himalayan glaciers is that it was a consequence of the diminution of the fall of snow, consequent on the gradual change of climate which must have followed a gradual transformation of an ocean area into one of dry land. The last named circumstance would also account for the great changes in the quantity of rainfall and in the flow of the rivers, of which there are many indications in western India, in Persia and the region east of the Caspean."

—*Encyclopedia Britannica*, Vol. II, p. 688 (Ninth edition).

"একা চেতত্ সরস্বতী নদীনাং শুচির্য্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ।" নদীগণের মধ্যে একমাত্র সরস্বতীই জানে পবিত্র নদী রূপে পর্বত হতে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে (ঋ ৭. ৯৫. ২)। ঋগ্বেদের কালে সরস্বতী বিশাল নদী ছিল। পর্বত হতে উৎপন্ন হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ত। যার অপ্রতিহত গতি, জলবর্ষী বেগ প্রচণ্ড শব্দ করে বিচরণ করে (ঋ ৬.৬১.৮)। নদী সমূহের মধ্যে সমধিক বেগবতী, মহাপ্রবাহিনী ও তরঙ্গশালিনী (ঋ ৬. ৬১.১০) ; প্রবল ও বেগবান তরঙ্গ সহকারে পর্বতের সানুদেশ সকল ভঙ্গ করত (ঋ ৬. ৬১.২)। খরস্রোতা দৃশদ্বতী এবং আপয়া ছিল সরস্বতীর দুই উপনদী। এই তিনটি নদীরই আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। শুক্ল যজুর্বেদে আরও তিনটি উপনদীর উল্লেখ আছে : "তাঁরা পাঁচটি দেশে নিজেদের নাম পরিত্যাগ করে সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ (৩৪.১১.১)। ঋগ্বেদের কালে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল সভ্যতার মর্মকেন্দ্র। সরস্বতী ছিল "নদীতমে অম্বিতমে দেবীতমে"। সেকালে এই নদীর তীরে তীরেই মহা ঋষিগণ বড় বড় যজ্ঞ করে গেছেন, যার জন্যে এই নদী ছিল পুণ্যতমে, দেবী, পরে বাগ্দেবী।

এই উভয় নদীর উপত্যকায়, বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হারাপ্পা-সভ্যতার প্রচুর সাংস্কৃতিক নিদর্শন নগরী সমূহের ধ্বংসস্তূপের তলদেশ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নদীর উল্লেখ রামায়ণে আছে। মহাভারতের কালে সরস্বতী পুণ্যতমা নদী ছিল বটে কিন্তু ক্ষীণস্রোতা হয়ে বিনাশনে (রাজপুতানায়) গিয়ে মরুবালিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল (বনপর্ব ও শল্যপর্ব)। সরস্বতী নদীর অন্তর্ধানের উল্লেখ সামবেদান্তর্গত তাণ্ড ব্রাহ্মণে (অপর নাম পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণে) ২৫.১০.৬-এ আছে। আর উল্লেখ আছে লাট্যায়ন শ্রৌত সূত্রে, বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (১.১.৯) ও মানবধর্ম সূত্রে (২.২১)।

ঋগ্বেদের বহু স্থলে সরস্বতী নদীর নাম পৃথকভাবে ও বিশিষ্ট মর্যাদা সহকারে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত, যথা— জিমার (Zimmer) ও রথ, এ নদীর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে সরস্বতী হলো সিন্ধু নদীরই অপর নাম। কেউ কেউ এ নদীর অস্তিত্ব ভারতের বাইরে দেখিয়েছেন। (তাঁদের মতে আর্যগণ ঋগ্বেদ রচনা করেছিলেন ভারতে প্রবেশের পূর্বে)। এঁরা মনে করেন, পারস্যের হারাবতী নদী ছিল পূর্বতন সরস্বতী নদী। কেউ কেউ আবার আফগানিস্তান ও মধ্যপূর্ব রাশিয়ার অক্সাস (গ্রীক নাম, স্থানীয় নাম আমুদরিয়া নদী) নদীকেই সরস্বতী নদী বলে চিহ্নিত করেছেন। এই নদী সম্পর্কে কোন ভারতীয়ের মনেই কোন

সন্দেহ নেই। উপনদীসহ সরস্বতী নদী একেবারে শুকিয়ে গেছে বটে কিন্তু তার চিহ্ন আজও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পাকিস্তানে দেখতে পাওয়া যায়, সরস্থতি ও ঘগ্‌গর (দৃশদ্বতী) নামে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার অরিয়েল স্টিন সরজমিনে জরীপ করে এই নদীর প্রাচীন খাত খুঁজে পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন—ভূতপূর্ব পাতিয়ালা রাজ্য, হিসার জেলা, ভূতপূর্ব বিকানির রাজ্য ও ভাওয়ালপুর (পাকিস্তান) রাজ্যের ভিতর দিয়ে এই নদীর জলধারা প্রবাহিত হতো, এবং পরে হাকরা নাম পরিগ্রহ করে কচ্ছ উপসাগরের নিকটে গিয়ে পড়ত। গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া-র বাইশ সংখ্যক খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় এই নদীর বিশেষ বিবরণ দেওয়া আছে। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল (প্লক্ষ প্রস্রবণ) আম্বালার উত্তরে শিরমুর পার্বত্য রাজ্যে। ঋগ্বেদের রচনাকালে যে নদী ছিল এত বড়, খরস্রোতা ও জলপূর্ণা, সে নদী শুকোতে আরম্ভ করল কোন্ সময় থেকে ?

ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে (৩. ৩৩. ১-৩) যে, বিপাশ ও শতুদ্রি (বর্তমান শতদ্রু) দুইটি সমান্তরাল নদী ছিল এবং সাগরে গিয়ে পড়ত। শতুদ্রি পূর্বদিকে দেবকুণ্ড স্থানের অভিমুখে প্রবাহিত হতো। শতুদ্রির প্রাচীন খাতের চিহ্ন আজও দেখা যায়। ঋগ্বেদের যুগের পরে শতদ্রু পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে সাগরের পরিবর্তে সিন্ধুনদীতে গিয়ে পড়ছে।[১]

সেকালে সিন্ধু-অববাহিকায় প্রচুর বারিপাত হতো। সেখানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করা হতো এবং বন্যভূমিতে বন্যঘোড়া চরে বেড়াত (ঋ ১০. ৭৫)। বর্তমানে ঐ অঞ্চল মরুভূমিসদৃশ। বাৎসরিক বারিপাত ৮ ইঞ্চি মাত্র। কাশ্মীরে পৌঁছে সিন্ধুনদী ঋগ্বেদের কালেই উত্তর বাহিনী (বর্তমানেও তাই আছে) হয় (ঋ ২. ১৫. ৩ ও ৬)। বৈদিক যুগের পরেই সপ্তসিন্ধুতে নিসর্গের দৃশ্যান্তর ঘটায় হিমালয়ের হিমবাহের পরিবর্তন ঘটে। সেই সময়ে রাজপুতানার সাগর ও সপ্তসিন্ধুর অপর তিনদিকের সাগর শুকিয়ে যায় ; সরস্বতীও তার উপনদীসমূহ সহ শুকোতে থাকে, নদীর মোহনা বালুভূমিতে পরিণত হয় ; শতুদ্রি গতি পরিবর্তন করে সিন্ধু নদীতে গিয়ে পড়ে। সুপ্রাচীন কালে ভারতে এক মহাপ্রলয় ঘটেছিল

১. "There is evidence that the Satlej was a much bigger river in the past when it flowed further east as an independent river through Punjab and Rajputana receiving water from the Jamuna and entering in the Runn of Kutch. Its former branch can still be traced," *The Gazetteer of India*. Vol. I, p. 35.

—যার উল্লেখ আমরা অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, পুরাণসমূহে ও মহাভারতে পাই। আরাবল্লী পর্বত পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম; পুরাকালে এ পর্বত বর্তমান কালের চেয়ে অধিকতর উচ্চ ছিল। সেকালে আরাবল্লীকেও বিন্ধ্য পর্বত বলা হতো। এই পর্বত ঋষি অগস্ত্য-র কাছে মস্তক অবনত করেছিল এবং তা আর উচ্চে তুলতে পারেনি বলে কিংবদন্তী আছে। সেই প্রলয় কালে ঐ পর্বত তার উচ্চতা হারায় এবং তার পাদদেশে অবস্থিত রাজপুতানা সাগর শুকিয়ে যায়। প্রলয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়: সাগরের জল স্ফীত হয়েছিল (সম্ভবত ভূকম্পনের ফলে); মনুর—(এ কোন মনু বলা দুষ্কর) নৌকাকে তার দক্ষিণের বাসভূমি থেকে উত্তর দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে উত্তর গিরিতে (হিমালয়ে) ঠেকিয়েছিল। এ বন্যা ভয়াবহ বৃষ্টিপাতের দরুন হয়নি। রাজপুতানা সাগর হয়তো জলোচ্ছ্বাসের ফলে শুকিয়ে যায়। কাশ্মীরে মনোবতরণ বলে একটি স্থান আছে, হয়তো সেখানেই মনুর নৌকা গিয়ে ঠেকেছিল। ঋগ্বেদে এই প্রলয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে তা আছে। উক্ত ব্রাহ্মণে নক্ষত্র সমাবেশের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় এই ব্রাহ্মণের রচনাকাল ৩০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের পরে নয়। কিন্তু এ প্রলয় সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের পূর্বের ঘটনা।

বোরোসামের বর্ণনা থেকে ব্যাবিলোনিয়ায় এক প্রলয়ের বর্ণনা আমরা পাই এবং ওখানকার গিলগামেশ মহাকাব্যেও তার উল্লেখ আছে। সেই প্রলয়, ভারতীয় প্রলয়ের অনেক পরের ঘটনা। সেখানে তিনদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন ঘন কালো মেঘ থেকে প্রলয় ঘটেছিল। বাইবেলে যে প্রলয়ের উল্লেখ আছে (জেনেসিস ৭/১২), সেটি ঘটেছিল চল্লিশদিন চল্লিশ রাত্রি ধরে অজস্র বৃষ্টিপাতের ফলে। এটিও অনেক পরের ঘটনা। প্রাচীন মিসর এবং গ্রীসেও প্রলয়ের উল্লেখ আছে। এশিয়ার বুকে আরল হ্রদ, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগর, এই তিনটি সাগর পূর্বে একত্রে একটি সাগরে পরিণত ছিল। ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে এই সাগরের কোন যোগাযোগ ছিল না। খুব সম্ভব ভূকম্পনের ফলেই প্রাচীন গ্রীসে ডুকালিয়ন-এর রাজত্বকালে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হয়। একত্রীভূত ঐ তিন সাগরের জল বসফোরাস প্রণালী সৃষ্টি করে ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এটিও ভারতে সংঘটিত প্রলয়ের অনেক পরের ঘটনা। প্রাচীন গ্রীসে ডুকালিয়নের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ।

ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধুর চারদিকে চারটি সাগরের যে উল্লেখ রয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ. সি. দাস মহাশয় তাঁর 'বৈদিক ভারত' (*Vedic India*)

নামক গ্রন্থে আনুমানিকভাবে দেখিয়েছেন—তা রাজপুতানা সাগর, অর্থাৎ দক্ষিণ সাগর। আর উত্তর সাগর—সিনকিয়াং (চীন) প্রদেশের বর্তমান লপনর হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল; কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেও সেখানে ছিল এক বিশাল ভূমধ্য সাগর (ভূতত্ত্ববিদগণও এ সম্পর্কে একমত)। বর্তমানে লপনর ও আরও কয়েকটি ছোট ছোট হ্রদ ঐ অঞ্চলে অবশিষ্ট আছে। অতি প্রাচীনকালে হিমালয়ের পাদদেশে যে অগভীর সাগর ছিল, ভূতত্ত্ববিদগণ যাকে Ganges trough নামে অভিহিত করে গেছেন, সেটিই ছিল পূর্ব সাগর। পশ্চিমের আরল, কাস্পিয়ান আর কৃষ্ণ সাগরের যুক্ত অংশই, অর্থাৎ প্রাচীন ভূমধ্য সাগর হলো পশ্চিম সাগর। বলা বাহুল্য, সবই আনুমানিক। প্রাচীন কালে উত্তরে সতীসর নামে কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে যে বিশাল হ্রদ ছিল, ভূতত্ত্ববিদগণও যার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, সেটিও উত্তর সাগর নামে অভিহিত হতে পারে। ছোটনাগপুরের মালভূমি ও মেঘালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিকগণের মতে প্রাচীনকালে যে উপসাগর ছিল সেটিও পূর্ব সাগর হতে পারে। পশ্চিমে, সুলেমান পর্বতের পাদদেশে, অতি প্রাচীনকালে এক সাগর ছিল; কিংবা বর্তমানের সিন্ধুসাগর ও দোয়াব নামে পরিচিত যে-অঞ্চলটি আছে সেটির পার্শ্বে হয়তো সাগর ছিল, তাকেও পশ্চিম সাগর বলা হতে পারে। বেলুচিস্তানের পূর্বে ও উত্তরমেরু এলাকায় লবণাক্ত যে জলাভূমি আছে, সেখানেও সেকালে একটি বৃহৎ সাগরতুল্য হ্রদ হয়তো ছিল।

বৈদিক সাহিত্যে যেসব জ্যোতিষিক তথ্য দেওয়া আছে তার উপর নির্ভর করে বেদের সময়-কাল নিরূপণ করা যেতে পারে। পণ্ডিতগণের মতে, শতপথ ব্রাহ্মণ বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে নক্ষত্র সমাবেশের উল্লেখ রয়েছে তা বিচার করে অনেক পণ্ডিতই অনুমান করেন যে, শতপথ ব্রাহ্মণ ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বে রচিত।

লোকমান্য তিলক তাঁর 'ওরিয়েন্ট' নামক পুস্তকে জ্যোতিষিক তথ্যের উপর নির্ভর করে ৫৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ঋগ্বেদের রচনাকাল বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সেই সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মূলা নক্ষত্রে ছিল। ভি. বি. কেলকার তাঁর একটি জ্যোতিষিক গণনার সূত্র ধরে এই রচনাকাল অনুমান করেন ৪৬৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ। জ্যাকোবির মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ৪৫০০ থেকে ৪০০০ খ্রীঃ পূঃ। এই তিন গণনাই সত্য হতে পারে, কারণ ঋগ্বেদের রচনা বহু শতাব্দী জুড়েই চলেছিল। আচার্য ম্যাক্সমূলর-এর মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ১৫০০ থেকে ১২০০ খ্রীঃ পূঃ, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়ে নানা পণ্ডিতই নানা

মত প্রচার করে গেছেন।

ঋগ্বেদের কালে যেসব রাজগণ সপ্তসিন্ধুর নানা রাজ্যে রাজত্ব করে গেছেন, যাদের মধ্যে কিছু কিছু রাজাদের নাম ঋগ্বেদের মধ্যেই পাওয়া যায়, সেই সূত্র ধরে ঋগ্বেদের রচনাকাল নিরূপণ করা যায়। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, ঋগ্বেদের আদি সূক্ত রচয়িতা বৈবস্বত মনুর পুত্র ও জামাতা থেকে ভারতের দুই রাজবংশের সৃষ্টি। শাখা-প্রশাখা সহ এই দুই রাজবংশের রাজগণ সমগ্র উত্তর ভারতে সহস্র সহস্র বৎসর রাজত্ব করে গেছেন। তাঁদের বংশপরিচয়, তাঁদের কাহিনী ও রাজত্বকালের কথা পুরাণ সমূহে বিধৃত আছে। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, রামায়ণ-মহাভারতে বহু রাজার নাম পাওয়া যায়। এইসব সূত্র ধরে আমরা ঋগ্বেদের সময়কাল মোটামুটি জানতে পারি; এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদ রচনার সূত্রপাতে আমরা বৈবস্বত মনু, ইক্ষ্বাকু, পুরূরবা প্রভৃতির নাম পাই। আবার সেই ঋগ্বেদেই আমরা মহাভারতের যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনের প্রপিতামহ শান্তনু রাজার যজ্ঞের উল্লেখও দেখতে পাই। মনু থেকে শান্তনু পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে ৯২ জন রাজার নাম তেরটি পুরাণে উল্লিখিত আছে। এই রাজগণের সময়কালেই ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ রচিত, দৃষ্ট অথবা শ্রুত হয়েছিল। ঋগ্বেদের মন্ত্ররচয়িতা দ্রষ্টা হিসাবে অথবা ঐ সময়ে দাতা হিসাবেও অনেক রাজার নাম ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে। অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যেও তা রয়েছে; সুতরাং ঋগ্বেদের রচনাকাল হলো ঐ নিরানব্বই জন রাজার রাজত্বকাল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

বৈদিক সভ্যতা ও হারাপ্পা-সংস্কৃতি

বর্তমান শতাব্দীর ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সপ্তসিন্ধু অঞ্চলেই বেদ রচিত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁদের মতে, হারাপ্পা-সভ্যতা হলো তৎপূর্ববর্তী এবং আর্যগণই ভারতে প্রবেশ করে ঐ সভ্যতাকে ধ্বংস করে। ধ্বংসের সময়কাল—কম-বেশি ১৫০০ খ্রীস্টপূর্ব: এই যুক্তি প্রসঙ্গে এবার কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিন্ধু অর্থাৎ হারাপ্পা-সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মধ্য দিয়ে এই সভ্যতার পরিচয় যতটুকু উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার উপরই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। ভারতের (অখণ্ড) পশ্চিম থেকে পূবে প্রায় ১২০০ মাইল ও উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৭০০ মাইল এলাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ৮, ৪০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে এই সভ্যতার বিস্তৃতি। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এর অর্ধেক এলাকা জুড়েও কোন প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়নি। এই সভ্যতার (হারাপ্পা) বিস্তৃতি যে শুধু পূর্বোক্ত এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, একথাও বলা যায় না। কারণ প্রায়ই নতুন নতুন নিদর্শন ইতস্তত আবিষ্কৃত হচ্ছে। ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এখন শিশুকাল চলছে। যেসব ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তার অতি সামান্য অংশই খনন করা সম্ভব হয়েছে। যে-স্তূপগুলো খনন করা হয়েছে, সেটা আংশিক খনন মাত্র, পূর্ণাঙ্গ খনন নয়। আর, হারাপ্পা সভ্যতার যেসব লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তার পাঠোদ্ধারও এখনো বাকি।

১৯২৪-২৫ সালে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে মাহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার ধ্বংসস্তূপের খননকার্য শুরু হয়। এই আবিষ্কৃত সভ্যতাকে প্রথমে অভিহিত করা হয় সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা রূপে। পরবর্তীকালে ভারতের নানাস্থানে এর বিস্তৃতি দেখে হারাপ্পা-সভ্যতা রূপেই একে চিহ্নিত করা হয়।

মার্শাল সাহেব মাহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পা—এই দুই নগরের ধ্বংসাবশেষ পর্যালোচনা করে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সিন্ধু-সভ্যতা (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রাব্দ) বৈদিক বা আর্য-সভ্যতা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। এটা আর্যদের ভারতে আগমনের অনেক পূর্বের সভ্যতা—ব্রোঞ্জ-

তাম্রযুগের সভ্যতা।[১] তাঁর মতে, বেদে বর্ণিত আর্য-সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার পার্থক্য বিস্তর। সিন্ধু-সভ্যতা যখন ম্রিয়মাণ ও অস্তমিত হবার পথে, তখনই আর্যগণ প্রায় ১৫০০ খ্রীস্টপূর্ব কালে তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি নিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। তিনি তাঁর "মহেঞ্জোদারো ও সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা" (*Mahenjo Daro and Indns Valley Civilisatoin*, Vol. I) গ্রন্থের প্রথম ভাগে উভয় সভ্যতার তুলনা করেছেন: ভারতে আর্যদের আগমনের কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ অবশ্য তিনি দেননি, অনুমানের উপরেই নির্ভর করেছেন মাত্র। তিনি উভয় সভ্যতার মানুষের মধ্যে ভাষার পার্থক্য ও দৈহিক গঠন সম্পর্কে কোন পার্থক্যও দেখাতে পারেননি। যেসব পার্থক্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার মধ্যে বিশেষ একটি হলো—মৃতদেহ সৎকার-পদ্ধতি। তাঁর মতে, সিন্ধুসভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সময় সাধারণতঃ মৃতদেহ অগ্নি সংস্কার করা হতো; বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল সমাধি ব্যবস্থা। সিন্ধুসভ্যতায় মৃতদেহের সমাধি কদাচিৎ দেখা গেছে। তাঁর পুস্তকের ৭৯ থেকে ৯০ পৃষ্ঠায় এইসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বৈদিক যুগে কি হতো? ঋগ্বেদে দু'রকম প্রথার উল্লেখই আমরা দেখতে পাই। প্রথম, অনাগ্নিদগ্ধ (মৃত্তিকা সমাধি, ঋ ১০.১৮.১১; শতপথ ব্রাহ্মণে ১৩.৮.১-৯-তেও এর উল্লেখ আছে দেখতে পাই। দ্বিতীয় অগ্নিদগ্ধ (ঋ ১০.১৬.১); কিন্তু এই সৎকারেই সব কিছু শেষ হয়ে যেত না, অবশিষ্ট অস্থি ও দেহাবশেষ একটি পাত্রে সংগ্রহ করে সমাধি দেওয়া হতো। এ-সম্পর্কে যেসব নিয়ম পালন করা হতো আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে (৪.৪.১) তার উল্লেখ আছে। মার্শাল সাহেব অগ্নিদগ্ধের পর এরূপ সমাধির নিদর্শন উভয় নগরেই পেয়েছেন। অনুমান, বৈদিক যুগের প্রথম দিকে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা চালু ছিল। কিন্তু পরে ঐ যুগেই অগ্নি-সৎকারের প্রথা প্রচলিত হয়। ১০.১৫.১৪ ঋকে উল্লেখ আছে: "হে অগ্নি, যে সকল পিতৃলোক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছেন কিম্বা যাঁরা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হননি" ইত্যাদি। এখানে উভয় প্রথারই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রথাই বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে চলে আসছে। বৌদ্ধ যুগে বুদ্ধদেবকেও দাহ করা হয়েছিল। তাঁর অস্থি নানা স্থানে রক্ষিত হয়েছিল (মহাপরিনির্বাণ দ্রষ্টব্য)। মৃতদেহ পশুপক্ষীর খাদ্য রূপে প্রথমে ফেলে রেখে, পরে দেহের অবশিষ্টাংশ

১. ঋগ্বেদে ও অপর তিন বেদে ব্রোঞ্জ ধাতু বা মিশ্র ধাতুর কোন উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদে যে যুগের চিত্র আমরা পাই, তা তাম্র যুগের। হারাপ্পা যুগে তাম্র ও ব্রোঞ্জ দুই-ই ছিল। সুতরাং ব্রোঞ্জ হলো তাম্র-পরবর্তী যুগের ধাতু।

সমাধিস্থ করার এক প্রথার উল্লেখ অথর্ববেদে (১৮.২.৩৪) আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য ও শাকল-এর কথোপকথনে (তৃতীয় অধ্যায়, ৯ম ব্রাহ্মণ, ২৫) এরূপ প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌষিতকি ব্রাহ্মণেও এ-প্রথার উল্লেখ আছে। মার্শাল সাহেবও উভয় নগরেই এরূপ প্রথার পরিচয় পেয়েছেন। একটি ছাগকে হত্যা করে মৃত নরদেহের সঙ্গে তা পোড়াবার এক প্রথার উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে (১০.১৬.৪)। হারাপ্পার এইচ—৬৭৮ নম্বর সমাধিতে একটি আস্ত নরকঙ্কাল শায়িত অবস্থায় আছে। দেখা গেছে যে, তার সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়েছে একটি ছোট ছাগল। ছাগলের পঞ্জরের কয়েকটি হাড় উক্ত নরকঙ্কালের হাতে। হারাপ্পায় কয়েকটি হাড়ির মধ্যে শিশু মৃতদেহেরও কঙ্কাল পাওয়া গেছে। শিশুদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে।[১]

ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মার্শাল সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে ধর্ম-সংক্রান্ত যা কিছু মাহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় আবিষ্কৃত হয়েছে তা বিশিষ্ট রূপে ভারতীয় বলেই অনুমিত হয় (পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃ. ৬৪-৭৮)। বর্তমানে যাকে হিন্দুত্ব বলা হয় তার সব কিছু এই সভ্যতায় পাওয়া গেছে। স্বস্তিকা চিহ্ন দু'য়েতেই আছে। যেসব ধর্মীয় প্রতীক বা মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলো বৈদিক দেবতা—অর্থাৎ সূর্য, অগ্নি, সোম, অদিতি প্রভৃতি। হারাপ্পা-সভ্যতার সীল সমূহে যেসব চিত্র দেখা গেছে তার অনেকগুলোই ঋগ্বেদীয় বর্ণনা অনুসারী চিত্র বলেই অনুমিত হয়। হারাপ্পাতে সীলমোহরে এক অনাবৃত নারীমূর্তি চিত্রিত আছে, তার পা দুটো প্রসারিত এবং গর্ভদেশ থেকে একটি বৃক্ষ উপর দিকে উঠেছে। এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত পোড়ামাটির নিদর্শন পরবর্তীকালে বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষেও আবিষ্কৃত হয়েছে। নারী মূর্তিটি হলো ঋগ্বেদীয় অদিতি, আর বৃক্ষটি হলো বনস্পতি—সূর্যের প্রতীক—স্বর্গীয় আলোকবৃক্ষ, যার উপর সূর্য প্রতিদিন উদিত হন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণে বনস্পতি রূপে সূর্যের বহু উল্লেখ আছে। শিবলিঙ্গ এই বনস্পতিরই প্রতীক। মার্শাল সাহেব একে শরীরের একটি অংশ বিশেষ ভেবে ভুল করেছেন। আর্যদের দেবদেবীর মধ্যে সূর্যেরই নানা রূপ প্রতিফলিত। তন্ত্রশাস্ত্রে ঐ বৃক্ষকে বলা হয় আলোকবৃক্ষ। মাহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি সীলমোহরে দেখা যায়, সাতটি

১. উভয় সভ্যতার মৃতদেহ সৎকার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত *Man in India*, Vol. XVI ও XVII পুস্তকে এবং স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত *Rigvedic Culture of the Pre-Historic Indus* নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

ডাল বিশিষ্ট একটি যূপ; মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবীমূর্তি, তাঁর তিনটি শৃঙ্গ। এই চিত্র সম্পূর্ণরূপে ঋগ্বেদীয়। ঋগ্বেদের দশম ও অষ্টম মণ্ডলে যূপের বহু উল্লেখ আছে, বর্ণনাও আছে। প্রতি যজ্ঞে নির্দিষ্ট সংখ্যক যূপ (গাছের ডাল থেকে নির্মিত) ব্যবহৃত হতো; মধ্যের যূপটি হলো সূর্যের আসন, সাকল আকৃতির শাখা-প্রশাখা সহ। অপরগুলো সূর্যরশ্মির আসন। ঋগ্বেদের ৩/৮ সূত্রে বনস্পতি ও যূপকে দেবতা বলে গণ্য করা হয়েছে। হারাপ্পা-সভ্যতায় বহু যূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। সাতটি ডাল সূর্যের সাত রশ্মি; মূর্তিটি ঋগ্বেদীয় সাবিত্রী দেবীর, অর্থাৎ নারীরূপে সূর্যের মূর্তি, যিনি যূপ, অর্থাৎ আসনে দাঁড়িয়ে। শৃঙ্গ তিনটি হলো—সূর্যের ঋগ্বেদোক্ত তিন রূপ। সামনে একজন দু'হাত প্রসারিত করে প্রার্থনায় রত। তার পশ্চাতে একশৃঙ্গী বৃষ—সূর্যের প্রতীক। নিম্নভাগে দেখানো আছে সাতটি মূর্তি, যারা স্তুতিপরায়ণ হতে পারে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মস্তকে একটি করে শৃঙ্গ; মনে হয় এই সাতজন হলো সূর্যের সাতটি রশ্মি। আর একটি সীলমোহরে চিত্রিত আছে—এক পিপুল গাছের দুটি ডাল দুদিকে প্রসারিত; মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছেন একটি স্ত্রী-মূর্তি, অর্থাৎ সাবিত্রী। পিপুল গাছ আর্যদের কাছে পবিত্র, এর দুটি ডাল যূপের আকৃতি বিশিষ্ট।

মাহেঞ্জোদারোতে শিংযুক্ত দেবতা ও মনুষ্যের অনেক চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। শিব বা পশুপতির চিত্রেও আছে মস্তকের দুদিকে দুটো শিং; মধ্যে জটা (বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায়), আর উপরের দিকে একটা শিং। ঋগ্বেদেও শিং-এর উল্লেখ আছে: "স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত অশ্ব, তাম্রপদযুক্ত।" (ঋগ্বেদের সূক্তে সূর্য অশ্ব নামে উল্লিখিত) "শৃঙ্গযুক্ত পশুর ন্যায় স্বরুষ (যূপ) তশাল সহ এসেছে।" "অর্ভক তুমি এসেছ ঊষার সামনে শৃঙ্গের ন্যায়।" ঋগ্বেদে সূর্যকে স্বর্ণশৃঙ্গী দেবতা বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্বর্ণশৃঙ্গ যুক্ত বরুণের উল্লেখ আছে। তন্ত্রে একশৃঙ্গী জন্তু হলো সূর্য ও পৃথিবীর প্রতীক। সায়নের মতে, বেদে শৃঙ্গ শব্দের ব্যবহার হয়েছে নিম্নলিখিত অর্থে: "চুল, সুন্দর উষ্ণীষ, ফুল, উজ্জ্বল উচ্চ স্থান, সূর্য-রশ্মি।" অগ্নিশিখাও হয়েছে শৃঙ্গ। বৈদিক যুগে, আর্যরা মস্তকে শিখা ধারণ করত না, উষ্ণীষ ব্যবহার করত। বর্তমান যুগে বিবাহের সময় হিন্দু বর-কনে যে উষ্ণীষ ধারণ করে, তাও শৃঙ্গের ন্যায়। শিবের এবং একজটা দেবীর জটাও হলো শৃঙ্গের অনুরূপ। সংস্কৃত ব্যাকরণে শৃঙ্গ শব্দের অর্থ—পশুর শিং, পর্বতের চূড়া, উচ্চপদস্থ, মহান, মুদ্রা, আকৃতি, পদ্ম, কুরচা বৃক্ষ প্রভৃতি। সূর্য-উপাসকরাই পরবর্তীকালে, উষ্ণীষের পরিবর্তে শিখা ধারণ করে। ঋগ্বেদে, ৮. ৮৬. ৫

ঋকে সত্য-র শৃঙ্গের উল্লেখ আছে—ঋতস্য শৃঙ্গম্।

মাহেঞ্জোদারোতে একশৃঙ্গী জীবটি (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যার নাম ইউনিকরন (unicorn) রেখেছেন, খুব সম্ভবতঃ সূর্যের প্রতীক। ই. ম্যাকে মহাশয় একে বলেছেন—উরুষ ষাঁড়। মার্শাল সাহেবের অনুমান, এটি হলো বিষ্ণুর প্রতীক। বিষ্ণু—মধ্যগগনের সূর্য। এটি একশৃঙ্গী অশ্বও (সূর্য) হতে পারে। এই অশ্ব কখনো এক শৃঙ্গযুক্ত, কখনো বহু শৃঙ্গযুক্ত। মস্তকের শিখা এক শৃঙ্গের প্রতীক।

সিন্ধুসভ্যতায় বৃষভ ও বলদের অনেক চিত্র পাওয়া গেছে। শিব হলো ঋগ্বেদের রুদ্র; যজুর্বেদে শিব, ত্র্যম্বক প্রভৃতি নামের (রুদ্রের) উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে রুদ্র বা শিবের অপর একটি নাম হলো—পশুপতি। ঋগ্বেদে আছে—আকাশের বৃষ পৃথিবীকে আলোকিত বা দৃশ্যমান করে। হারাপ্পা-সংস্কৃতিতে প্রাপ্ত কয়েকটি সীলে চিত্রিত আছে ত্রিমুখ দেবমূর্তি; এর মস্তকে শিং, শিরস্ত্রাণ, পদ্মাসনে বা সিংহাসনে উপবিষ্ট, অনাবৃত, উন্নত লিঙ্গ; আর চারদিকে হাতি, বাঘ, বলদ, গণ্ডার প্রভৃতির মূর্তি। এ মূর্তি পশুপতি বা শিবের মূর্তি—যোগাসনে উপবিষ্ট যোগেশ্বর, চোখের দৃষ্টি নাসাগ্রে। মস্তকের শৃঙ্গ সূর্যের প্রতীক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র—সূর্যেরই তিন মূর্তি। এই মূর্তি যে ভারতের আর্যদের, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই মূর্তিটির তিনটি বৈশিষ্ট্য: (১) ত্রিমুখ (২) পশুপতি (৩) যোগেশ্বর বা মহাযোগী। মার্শাল সাহেবও স্বীকার করেছেন, এ মূর্তির সঙ্গে শিব মূর্তির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। অনেক পণ্ডিতই মনে করেন, হারাপ্পা-সংস্কৃতি থেকেই আর্যরা শিব উপাসনা শিখেছে। এই দেবতা আর্যদের হলেও অনেক পরে এসেছে। যজুর্বেদ অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণসমূহে কিন্তু আমরা এই নামের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই। হারাপ্পাতে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির সীলের পশ্চাতে বৃষ ও ত্রিশূলসহ একটি যোগী মূর্তির চিত্র উল্লেখযোগ্য। এটি শিব মূর্তি। একটি সীলে শিংযুক্ত শিরস্ত্রাণসহ ব্যাধ মূর্তি পাওয়া গেছে—হাতে তার ধনুর্বাণ, মনে হয় ব্যাধরূপী শিব। ঋগ্বেদে রুদ্রও ধনুর্বাণধারী (ঋ ২. ৩৩. ১০) একটি প্রস্তর নির্মিত যোগী মূর্তি ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গেছে। সেটি দেখে মনে হবে ভারতীয় যোগী। শিবলিঙ্গের মত কতকগুলো প্রস্তর ও পোড়ামাটির তৈরি লিঙ্গ বা অনুরূপ নিদর্শন হারাপ্পা-সভ্যতার নানাস্থলে বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রথমে মনে করেছিলেন—এ সবই হলো অনার্যদের লিঙ্গ-পূজার নিদর্শন। বর্তমানে এ সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে সন্দেহ জেগেছে। এর দু'চারটি ছাড়া আর সবগুলিই হয়তো অন্য কাজেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

ঋগ্বেদের ৭. ২১. ৫ ঋকে প্রার্থনা আছে—যেন 'শিশ্ন দেবাঃ' আমাদের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। শিশ্ন দেবাঃ অর্থে লিঙ্গপূজকগণ; হয়তো অনার্য দাসগণ এই লিঙ্গ-পূজা করত।[১] ঋগ্বেদের পরবর্তীকালে আর্যগণের মধ্যেও এই পূজা প্রসার লাভ করে। লিঙ্গতন্ত্র মতে হলো স্বয়ম্ভূ। শিবলিঙ্গের মূল ভগবান ব্রহ্মা; মধ্যে বিষ্ণু আর মস্তকে শম্ভু। হারাপ্পা-সভ্যতায় তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। তান্ত্রিক যন্ত্র ও স্বস্তিক চিহ্ন ঐ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদের ২. ৪২-৪৩ সূক্তে ইন্দ্রকে কপিঞ্জল নামক পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্দ্র হলেন সূর্য-দেবতা; ঐ পক্ষীও সূর্যের প্রতীক। ঋগ্বেদে ঐ পক্ষীকে শকুন্ত, শ্যেন, সুপর্ণ ও গরুৎমন বলেও অভিহিত করা হয়েছে। আর্যদের কাছে শঙ্খ হলো পবিত্র মুখবাদ্য এবং পূজাতেও তা ব্যবহৃত হয়। ঋগ্বেদে শঙ্খের উল্লেখ আছে। এই সব নিদর্শনও হারাপ্পা-সভ্যতায় পাওয়া গেছে।

সিন্ধুসভ্যতায় পরশু বা কুঠারের অনেক চিত্র পাওয়া গেছে, যা কোন কিছু কাটবার জন্য নয়। বর্তমানে হিন্দুসমাজে ভার্গবদের মধ্যে পরশু পূজা প্রচলিত আছে। বেদে যে পরশুর উল্লেখ আছে তা আলোক বিকিরণ করে এবং সূর্যের প্রতীক। শিবধ্যানে, শিবহস্তে পরশুর উল্লেখ আছে। অগ্নির প্রতীক রূপে ঋগ্বেদে ছাগল ও মেষের উল্লেখ করা হয়েছে। হারাপ্পা-সভ্যতার চিত্রসমূহে এই সব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে মানুষ ও পশুর যুগ্মমূর্তির উল্লেখ আছে। ঋ ১. ১১৭. ১২-তে উল্লিখিত হয়েছে দধীচি মুনির স্কন্ধে অশ্বমুণ্ড।

হারাপ্পা-সভ্যতায় প্রাপ্ত পবিত্র পিপুল পাতা ও ময়ূরের চিত্রটি খাঁটি ভারতীয়। বেদে এবং হারাপ্পা-সভ্যতায় 'বৃষ'-র প্রাধান্য লক্ষণীয়।

হারাপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার যদিও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, তবু প্রত্নতাত্ত্বিক-স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ও অধ্যাপক স্টিফেন ল্যাঙডন অনুমান করেন যে, হারাপ্পা লিপি হলো ব্রাহ্মীলিপির জনক।

ঋগ্বেদের কালে অশ্বের ছড়াছড়ি ঘটলেও হারাপ্পা-সভ্যতায় অশ্ব পাওয়া যায়নি, একথা ঠিক নয়। প্রথম দিকে পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালে অশ্বের অনেক নিদর্শনই পাওয়া গেছে। লোথালে পাওয়া গেছে তিনটি পোড়ামাটির অশ্ব।

১. শিশ্নদেবা: টীকাকার সায়ন বলেছেন, যারা শিশ্ন (লিঙ্গ) নিয়ে নাড়াচাড়া করে, অর্থাৎ অপবিত্র মানুষ। অনেকে শিবলিঙ্গ অর্থে শিবের জননেন্দ্রিয়কে মনে করেন। বেদে ও ব্রাহ্মণে কোথাও সেই অর্থে শিবলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়নি। যাস্ক বা সায়ন শিশ্ন পূজা বা উপাসনার কথা বলেন নি।

হারাপ্পা ও মাহেঞ্জোদারোতে অশ্বচালিত রথ বা শকটের সন্ধানও পাওয়া গেছে। সুরকতাকেডোর (কচ্ছ) তিমরগড় ৫ নং সমাধিতে ও কালিবঙ্গানে অশ্বের হাড় আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাঃ পুসালকার, শ্রী ভেরুমল এবং এস. শাস্ত্রীও মাহেঞ্জো-দারোতে অশ্বের নিদর্শন পেয়েছেন। পোড়ামাটির একটি মূর্তিকে তাঁরা অশ্বের মূর্তি বলে মনে করেন।[১] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর *The Vedic Age, Indus Valley Civilisation* গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠায় দেখিয়েছেন যে, অশ্ব ঐ যুগেও অজানা ছিল না।

হারাপ্পা-সভ্যতাকালে কোথাও লৌহ পাওয়া যায়নি। কারণ সেইযুগে লৌহ আবিষ্কৃত হয়নি। ঋগ্বেদে অয়স-এর উল্লেখ আছে। সুতরাং ইয়োরোপীয় পণ্ডিত-গণ মনে করেন, বৈদিক সভ্যতা হলো পরবর্তী কালের সভ্যতা। অয়স-এর অর্থ —লৌহ, এ ধারণাই ওঁদের ছিল। সায়ণের মতে অয়সের অর্থ—তাম্র। প্রত্ন-তাত্ত্বিকের মতে লৌহ আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্যে যুগের যে-বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় ঋগ্বেদীয় সমাজ-বর্ণনায় তেমন কোন কিছু পাওয়া যায়নি।

যাহোক, মার্শাল সাহেব হারাপ্পা-সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতির অন্য যেসব পার্থক্য দেখিয়েছেন তার মধ্যে আছে: ১. বৈদিক আর্যগণ পশুপালন ও কৃষিকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা নগর-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জানত না; তারা বংশ নির্মিত গৃহে বাস করত। ২. বৈদিক আর্যগণ লৌহের ব্যবহার জানত, হারাপ্পা-যুগে তা অজানা ছিল। ৩. হারাপ্পা-যুগে বাঘ ও হাতি প্রচলিত ছিল, বৈদিক যুগে বাঘ ছিল না, হাতিও খুব কমই প্রচলিত ছিল। ৪. বৈদিক আর্যগণ শিরস্ত্রাণ ও বর্ম ধারণ করত, হারাপ্পা-সভ্যতায় তা অজানা ছিল। ৫ বেদে মাতৃদেবতা ও শিবের উল্লেখ ছিল না, হারাপ্পা-যুগে এ দুই-এর প্রাধান্য ছিল। ৬. আর্যগণ ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে, অর্থাৎ হারাপ্পা-সভ্যতা বিলোপের বহু পরে।

এসব যুক্তি যে কত অসার বেদ-সংহিতা পর্যালোচনা করলেই তা ধরা পড়ে। বেদ ইতিহাস নয়—ধর্মশাস্ত্র; রচয়িতা বা দ্রষ্টা ঋষিগণ অরণ্যে আশ্রমবাসী ছিলেন। ধর্মগ্রন্থে নগরের বর্ণনা, নগরবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সভ্যতার বর্ণনা না থাকাই তো স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও ঋগ্বেদেই দেখতে পাই: 'সহস্র স্তম্ভ যুক্ত সৌধ' (৪.৬২.৬), 'সৌধ' (২.৪১.৪); হর্ম্য বা প্রাসাদ (৭.৫৫.৬); সুশাসক নগরপতি (১.১৭৩.১০): সেতা বা ভিস্তিওয়ালা (৩.৩২.১৫);

১. *Annals of Bhandarker Research Institute*, 1937, Vol. XVIII, **'Mahenjo Daro' by Verumal, p. 91.**

বণিক (১.১১২.১১ ; ৫.৪৫.৬): শৌণ্ডিকালয় (১.১৯১.১০), বারাঙ্গনা বা সাধারণী (১.১৬৭.৪); অক্ষ ক্রীড়ার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ (১০.৩৪.৬); মালাকার (৮.৪৭.১৫); ভারভৃত্য বা মালবহনকারী প্রভৃতির উল্লেখ। এ সবই তো নগর-সভ্যতার পরিচয় বহন করে। নগরেরও সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদে, যথা : আমাদের নগরগুলো যেন ক্ষীণ না হয় (১.১৩৯.৮)। ঋগ্বেদে আমরা অন্ততঃ সাত প্রকার গৃহের উল্লেখ পাই। তার মধ্যে হর্ম্য বা প্রাসাদ, ধনী ব্যক্তিদের অট্টালিকা, প্রাচীর বেষ্টিত অশ্বশালা প্রভৃতি (ঋ. ১.১৬৬.৪, ৯.৭১.৪ ; ১০.৭৩.১০)। অপর নামগুলি হলো—গয় (১.৭৪.২ ; ৫.৪৪.৭ ; ৫.১০.৩); পস্ত্য (৬.৪৯.৯ ; ৪.১.১১); দুরোণ (৩.২৫.৫ ; ৪.১৩.১); নিবেশন (৪.১৯.৯); দম (১.১.৮, ১.৬১.৯) ; গৃহ (৭.৫৬.১৬ ; ১০.১০৬.৫); এছাড়া আছে গৃহমধ্যে যজ্ঞস্থল, যেখানে অগ্নি সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকে ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত স্বর্ণমুদ্রা (১.১২৬.২ ; ৪.৩৭.৪ ; ৫.১৯.৮) রৌপ্য মুদ্রা (৫.৩৩.৬) প্রভৃতিও নগর-সভ্যতার পরিচয় দেয়। ঋগ্বেদে অসংখ্য রাজা কিংবা সম্রাটের উল্লেখ আছে। রাজার অভিষেক (ঋ. ১০.১৭৩), পুরুষানুক্রমিক রাজা (ঋ. ৭.১৮), রাজকর (১০.৬৩.১), রাজগণের সভা-সমিতিরও উল্লেখ আছে। রাজসভায় মিত্ররাজ্য দূত পাঠাতো (১.৭১.৪)। সমুদ্র-বাণিজ্যের কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং এসব যখন ছিল তখন প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে নগর গড়ে ওঠাই তো স্বাভাবিক।

অশ্ব ও লৌহ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ভারতে প্রাণী-বিদ্যা বিষয়ক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে, প্রাচীনতম কালে মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলের ঘন অরণ্যে, সিন্ধুনদী তীরের বনাঞ্চলে, এমন কি পশ্চিম বাঙলার শুশুনিয়া পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বে বন্য ঘোটক চড়ে বেড়াত।

ঋগ্বেদে ব্যাঘ্রের উল্লেখ আছে ৬.৫৪.৭ ঋকে। হস্তীর উল্লেখও আছে বহু জায়গায়। ঋগ্বেদে (৪.৪.১) ও যজুর্বেদে (কৃষ্ণ যজুঃ ১.২.১৪) হস্তীপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত রাজাদের যুদ্ধযাত্রার উল্লেখ আছে। ঋ ৮.৩৩.৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে—শত্রুগণের অন্বেষণকারী হস্তী যেমন মদজল ধারণ করে। ঋ ৮.৪৫.৫-এ আছে—বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন—যে তোমার শত্রুতা আকাঙ্ক্ষা করে, সে পর্বতে দর্শনীয় গজের ন্যায় যুদ্ধ করে। ঋ ১০.১০৬.৬-তে বলা হয়েছে—অঙ্কুশ তাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমরা শরীর অবনত করে শত্রু সংহার করো। ঋ. ৪.১৬.১৪-তে : তুমি হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত। ঋ ১০.৬৪. -তে : তোমরা হস্তীর মত, পশুদের মত. বন ভক্ষণ করো 'মৃগা ইব হস্তীনঃ খাদথা বনাঃ।'

১০.৪৪.৯-তে : হস্তী চালনার অঙ্কুশ। সুতরাং আর্যগণ হস্তীকে ভালো করেই জানতেন, হস্তীকে কাজেও লাগাতেন।

বৈদিক আর্যগণ যুদ্ধকালে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করত এবং হারাপ্পা-যুগে এটি ছিল অজানা, একথাও যথার্থ নয়। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এইসব নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলেই সে সময়ে তার ব্যবহার ছিল না, এ কথা বলা যায় না। এ দু'টি বস্তুর হয়তো ব্যবহার ছিল, কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পরে মাটি খুঁড়ে তা না-ও পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া খননকার্য এখনও অসমাপ্ত, তাই একথা বলার আজও সময় আসেনি।

হারাপ্পা ও মাহেঞ্জোদারো খনন করে বহু মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। হারাপ্পা-সভ্যতাকালে মাতৃপূজা প্রচলিত ছিল, বৈদিক যুগে ছিল না—মার্শাল সাহেব এটিকে এ দুই সভ্যতার একটি বড় পার্থক্য বলে দেখিয়েছেন। বৈদিক যুগে কোন দেবী বা শক্তির আরাধনা ছিল না কিংবা কল্পনা ছিল না, একথা সত্য নয়। সেইকালে ফুল-বিল্বপত্র প্রভৃতি উপাচারে কোন পূজা প্রচলিত ছিল না, একথা হয়তো সত্য হতে পারে। তৎকালে যজ্ঞই ছিল প্রধান ধর্ম-কার্য। যজ্ঞের মাধ্যমেই ঋষিগণ প্রার্থনা জানাতেন এবং দেব-দেবীর আরাধনা করতেন। এই কারণে ঋগ্বেদে কোন দেবমন্দিরের উল্লেখ নেই। কিন্তু বৈদিক যুগেও দেবী-আরাধনা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দেবী সূক্ত ও রাত্রি সূক্ত (দশম মণ্ডল) থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে শক্তিবাদ বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেবী সূক্তের ঋষি ছিলেন—মহর্ষি অম্ভৃণ কন্যা বাক্। বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করেছিলেন। ঋগ্বেদীয় রাত্রি সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন—ঋষি কুশিক। ঋগ্বেদের বহুস্থলে নানাভাবে অদিতি দেবীর উল্লেখ আছে, স্তুতিও আছে—আদিত্যগণের মাতা রূপে এবং দেবমাতা রূপে। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অর্যমা, বিবস্বান প্রভৃতি দেবগণ—অদিতি-পুত্র (ঋ ৪.১৮০; ঋ ৫.৬৭.১., ঋ ১.২৪.১৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।) যাস্ক অদিতির ব্যাখ্যা করেছেন—আদিমাতা, দেবমাতা, অনন্ত আকাশ, অনন্ত প্রকৃতি রূপে। ১.৮৯.১০ ঋকে প্রার্থনায় বলা হয়েছে: অদিতি দেবী, অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা। তিনি পিতা, তিনি পুত্র, অদিতি সকল দেব, অদিতি পঞ্চলোক, অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ, অদিতি—র্জাতম্ অদিতি—র্জনিতম। এটি সত্যিই এক উচ্চ কল্পনা। ঋগ্বেদে ভারতী, ইলা, সরস্বতী, রাত্রি, ঊষা, সাবিত্রী, পৃথিবী, গুঙ্গু প্রভৃতি দেবীগণের উল্লেখ আছে এবং তাঁদের আরাধনাও আছে। হোত্রা, ভারতী, ধিষণা-বাগ্‌দেবী, ইন্দ্রাণী, বরুণানি, অগ্নায়ী প্রভৃতি দেব-

পত্নীগণ আছেন (ঋ ১.২২.১০)। ঋগ্বেদের অদিতিই হলেন কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতী। ভারতে শক্তিপূজার মূল নিহিত আছে ঋগ্বেদে। শ্রীশ্রীচণ্ডী—বেদমূলা। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা। ঋগ্বেদে দেব-দেবীগণের কল্পনা-মূর্তি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। যথা: ঋ ১.১৪৬. ১—অগ্নির তিন মস্তক, সপ্তরশ্মি, ত্রিমূর্ধানাং সপ্তরশ্মিং ; ঋ ১.৯৫. ১০—দীপ্যমান লোহিতবর্ণ ও বায়ুগতি অশ্বীদ্বয়।

ঋ ১.১০১ সূক্তে ইন্দ্রের মূর্তি-কল্পনা আছে: ইন্দ্র—সম্রাট, (মুকুটধারী) দীর্ঘ অবয়ব, অলঙ্কারধারী অশ্বদ্বয়—লোহিত বর্ণ ও শ্যামবর্ণ ; সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ; এক হস্তে বজ্র, অন্যহস্তে ধন প্রদান করেন, বাম হস্ত দ্বারা হিংসকদের নিবারণ করেন, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যজমান দত্ত হব্যগ্রহণ করেন (অর্থাৎ চারিহস্ত)। তিনি আকাশচারী। সহচর হলো মরুৎগণ ইত্যাদি। ঋগ্বেদে বহু সূক্তে "দেব-দুহিতা" ঊষার মূর্তি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সূর্যপত্নী, রাত্রিদেবীর ভাগিনী ; তিনি শুভ্রবর্ণা, স্থির যৌবনা, সুবেশা, সৌন্দর্যময়ী, দীপ্তিশালিনী, ধনশালিনী ; তমোরাশি বিদূরিত করে আমাদের নেত্র সমীপে উদিত হচ্ছেন। তিনি ধনদাতা···(ঋ ৫. ৭৯ ও ৮০)।

দেবী সরস্বতীর নিকট স্তুতি জানানো হচ্ছে (ঋ ১. ৩. ১১): "দেবী সরস্বতী, স্বর্গ অথবা সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণা হলেন। জলবর্ষণ করে, আমাদের স্তবে প্রসন্না হয়ে সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুন।" ঋ ২.৪২,১৬-১৮ তে দেবী সরস্বতীকে—অম্বিতমে, নদীতমে, দেবীতমে বলা হয়েছে।

মার্শাল সাহেব খুব বড় একটা পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন যে, ঋগ্বেদে শিব নেই, অথচ হারাপ্পা-সভ্যতায় শিব-এর প্রাধান্য। ঋগ্বেদের রুদ্র, যজুর্বেদে শিব নামে অভিহিত হয়েছেন ; (কৃষ্ণ যজুঃ ১.৮.১৪.১২)। রুদ্র ও শিব একই দেবতা, এ দেবতা বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশুপতিও এই দেবতার অপর একটি নাম। ঋগ্বেদে রুদ্রকে ধনুর্বাণধারী বলা হয়েছে। শিবও ধনুর্বাণধারী। ঋগ্বেদের রচনা হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী। অথর্ববেদে রুদ্রের আটটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে "শিব" নেই—কিন্তু মহাদেব আছেন, পশুপতি আছেন। (অথর্ব ১১.১.৫ এবং ১১. ১০. ৭-৪ ও ৯)।

ইয়োরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রথমে মনে করেছিলেন, হারাপ্পা-সভ্যতা বহিরাগত। বর্তমানে তাঁরা এ সম্পর্কে নীরব হয়ে গেছেন। কারণ, তাঁরা দেখেছেন যে, তুলনায় হারাপ্পা-সভ্যতা—মিসর, সুমের প্রভৃতি সভ্যতা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, অনেক উন্নত এবং বহুদূর বিস্তৃত। যেসব সীল হারাপ্পা-সভ্যতায় পাওয়া গেছে তা উপরোক্ত সভ্যতার তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, প্রাচীন ও উন্নত।

প্রত্নতাত্ত্বিক ম্যাকে লিখে গেছেন—সুমেরীয় সভ্যতার একটি সীলও মাহেঞ্জো-দারোতে প্রাপ্ত সীল-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। আকারে, নক্‌শায়, উদ্ভাবনী প্রতিভায় হারাপ্পার সীল উন্নততর সভ্যতার স্মারক।

সুমেরীয় ও মিসরীয় সভ্যতায় অনেক মন্দিরের পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সুমেরীয়গণ তাদের দেবতাদের জন্য অনেক বড় বড় মন্দির গড়ে তুলেছিলেন। মিসরীয়গণ তাদের রাজাদের সমাধির উপর নির্মাণ করেছিলেন পিরামিড; হারাপ্পা-সভ্যতায় এরূপ কিছু পাওয়া যায়নি, যাকে দেবমন্দির বা সমাধি-মন্দির বলে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বৈদিক সভ্যতায় মন্দিরের প্রচলন ছিল না। সাধারণের জন্য নির্মিত কোন দেবমন্দিরের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে নেই। আর্যদের ধর্ম ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা হতো। অবশ্য এমন সব বড় বড় যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হতো যাতে ঘটত বিশাল জনসমাগম। এখানে কোন বিশিষ্ট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ না পাওয়ায় হারাপ্পা-সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতারই অংশ বলে অনুমিত হয়।

যাহোক, পরবর্তীকালে খননের ফলে দেখা গেছে যে, হারাপ্পা-সভ্যতা দূর-দূরান্তে বিস্তৃত। ঐ সভ্যতার নানা ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পেয়েছেন হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী অপর একটি সভ্যতার অস্তিত্বের নিদর্শন। হারাপ্পা, কোটদিজি, কালিবঙ্গান, কিলগুলমামুদ, সোধি, গুমলা, সরাইখোলা, আম্রি, মাহেঞ্জোদারো (সর্বনিম্ন-স্তর পর্যন্ত খনন করা সম্ভবপর হয়নি), সরস্বতী নদীতীরে মিতাথাল, দৃশদ্বতী-তীরে শিশওয়াল, লোথাল এবং গুজরাটের নানা স্থলে খননকার্য চালিয়ে হারাপ্পা-সভ্যতার স্তরগুলোরও নীচে, ভিন্ন আকার-প্রকারের ও রূপের কৌলাল (ভগ্নমাটির পাত্র), স্থাপত্য, ধাতব পদার্থ, ছুরিকা, পুঁতি, হাতের বালা, পোড়া-মাটির উপর প্রলেপ দেওয়া শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি পাওয়া গেছে। হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্বেই সিন্ধুদেশের কোটদিজিতে দুর্গ ও পার্শ্ববর্তী স্থানে নগর গড়ে উঠেছিল। হারাপ্পা ও পূর্বের সভ্যতার কোন কোন নগরের চারদিকে ছিল আরক্ষ: প্রাচীর এবং নগরের মধ্যে সুপরিকল্পিত রাজপথ। এছাড়া গৃহের ভিত্তি নির্মাণে প্রস্তর ব্যবহৃত হয়েছিল, দেওয়ালে ছিল কাঁচা ইটের গাঁথুনি। বর্তমান রাজপুতানার সরস্বতী নদীতীরে কালিবঙ্গানে, শহরের চারিদিকে (হারাপ্পা-পূর্ব সভ্যতাতেও) ছিল কাঁচা ইটের প্রাচীর। রাজপথের ধারে ধারে কাঁচা ইটের বাড়ি (তখনো গৃহ নির্মাণে পোড়া ইটের ব্যবহার শুরু হয়নি), কুম্ভকারের চক্রে নির্মিত কৌলাল (পাতলা ও হালকা রঙ—লাল থেকে গোলাপী), কালো রঙে চিত্রিত, সাদা

প্রাক্-হারাপ্পা সংস্কৃতি

রঙ-এর দাগ সহ চিত্রের জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক নক্শা এবং নগরে পোড়া ইটের পয়ঃপ্রণালীও ছিল। হারাপ্পাতেও অনুরূপ দেখা গেছে। হারাপ্পা-পূর্ব সভ্যতাতেও তুলার বস্ত্র ব্যবহার করা হতো। কালিবঙ্গানে হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী শস্যক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে লাঙল দিয়ে চাষ করা হতো, অর্থাৎ কৃষিকর্ম জানা ছিল। পোড়ামাটির গোশকট ইঙ্গিত দেয় যে, সেকালে পরিবহণেরও ব্যবস্থা ছিল। তাম্র নির্মিত সীল এবং তামার পুঁতিও পাওয়া গেছে। ঝিনুক, সোপস্টোন (steatite), কার্ণেলিয়ান (এক প্রকার সাদা পাথর) প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। হারাপ্পা-পূর্ব সভ্যতায় আম্রিতে যে সব ভগ্ন কৌলাল পাওয়া গেছে তার মধ্যে খোদিত চিত্র ও নক্শার অনুরূপ নিদর্শন পরবর্তী হারাপ্পা সীলেও পরিদৃষ্ট হয়েছে। আম্রিতে প্রাপ্ত এইসব খোদিত চিত্র ও নক্শা দেখে মনে হয়, হারাপ্পা লিপির উদ্ভব প্রাক্-হারাপ্পা যুগেই।

সরস্বতী নদীর তীরে মিতাথাল ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে (১৯৬৮ সাল), হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী কালিবঙ্গানের অনুরূপ কৌলাল পাওয়া গেছে। মিতাথাল-এর কৌলাল শক্ত-সমর্থ এবং তাতে চিত্র অতি সামান্য, সাদা রং-এর দাগও নেই, এইটুকু শুধু পার্থক্য। হিসার জেলায় সরস্বতী নদীতীরে বানওয়ালি হলো এরূপ আর একটি প্রাক্-হারাপ্পা সংস্কৃতির বিশিষ্ট স্থান।

দৃশদ্বতী-তীরের শিশওয়াল হলো হরিয়ানা রাজ্যের হিসার থেকে ২৬ কি.মি. দূরে। এখানেও পাওয়া গেছে ভিন্ন প্রকারের প্রাক্-হারাপ্পা কৌলাল। আর কট-দিজিতে পাওয়া গেছে কুম্ভকারের চক্রে তৈরি সুন্দর-পাতলা গোলাপী থেকে লোহিতাভ কৌলাল ও তামার দ্রব্য।

কিন্তু এখনো ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ধারণা, হারাপ্পা-সভ্যতার ধ্বংসসাধন করেছে বহিরাগত অপর কোন নিকৃষ্ট সভ্যতা এবং সেই নিকৃষ্ট সভ্যতা হলো বহিরাগত আর্য-সভ্যতা। এর কারণ হিসেবে তাঁরা দেখিয়েছেন, হারাপ্পা-সভ্যতা শেষ হবার পর একটা ছেদ পড়েছিল। অর্থাৎ, নগরগুলো ধ্বংস হয়ে কিছু-কাল পতিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন অনেক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে পূর্বাপর একটা ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। সৌরাষ্ট্রের রংপুর, সোমনাথ দেশালপুর, লোথাল প্রভৃতি স্থানে এবং রাজপুতানা, মধ্যভারত আর উত্তর প্রদেশের নানাস্থানে খনন করে দেখা গেছে যে, কোথাও কোন ছেদ নেই। একই সঙ্গে দেখা গেছে—হারাপ্পা-যুগের কৌলাল এবং নতুন ধাঁচের কৌলালের সহ-অবস্থান। হারাপ্পা-সভ্যতা যে সর্বত্র একই ধাঁচের ছিল,

হারাপ্পা-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও ব্যতিক্রম

তাও নয়। এই সভ্যতাকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা: সিন্ধু উপত্যকা, পূর্ব পাঞ্জাব, গঙ্গা উপত্যকা ও গুজরাট-কচ্ছ। হারাপ্পা-সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি।

১. নগর-পরিকল্পনা: পরিকল্পনা রচনা করে সেই অনুযায়ী নগর নির্মাণ। পৃথিবীর অন্য কোন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় নি। রাজপথ-গুলি সমান্তরাল ও সমকোণ বিশিষ্ট; নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পাকা ইট নির্মিত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা।

২. সুরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত নগর এবং নগরের পাশেই দুর্গ।

৩. উৎকৃষ্টরূপে পোড়ানো মাটির কৌলাল—কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত ও লোহিতোজ্জ্বল।

৪. বিশিষ্ট প্রকার ছিদ্রযুক্ত পাত্র, ছোট ও বড় থালি, পায়াযুক্ত থালি এবং খাদ্যদ্রব্যাদি মজুদ রাখার ভাণ্ড।

৫. চুনা পাথর (steatite) ও তাম্র নির্মিত সীল; সুন্দর রূপে খোদিত জীবজন্তু এবং ছবির মত অঙ্কিত লিপি।

৬. আয়ুধাদি, অস্ত্রশস্ত্র, তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত পাত্র।

কিন্তু হারাপ্পা-সভ্যতাকালেই আকার-প্রকারে ও কারুকৃতিতে নতুন ধরনের কৌলালও অনুপ্রবেশ করে। যেমন, গুজরাটে ভাদার নদীতীরের রংপুরে প্রথম স্তরেই পাওয়া যায় খাঁটি হারাপ্পা-কৌলাল ও অন্যান্য দ্রব্য; কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে আবিষ্কৃত হয় পুরাতনের সঙ্গে আকারে ও প্রকারে নতুন ধরনের কৌলাল। এছাড়া পোড়া ইটের বদলে কাঁচা ইট এবং চকমকি পাথরের পরিবর্তে যশত পাথরে (জাসপার) তৈরি দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়। তৃতীয় স্তরে আরো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সাদা রঙে চিত্রিত কালো-লাল কৌলাল। সৌরাষ্ট্রে দেখতে পাওয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ। উক্ত ভাদার নদীতীরে রজদি ও আদ-কোট ভগ্নস্তূপে ছিল হারাপ্পা-সভ্যতার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটি আগুনে ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় স্তরের কৌলালে সামান্য পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোনো বিরাট পার্থক্য ছিল না। ঐ গুজরাটের সোমনাথে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের ছয়টি স্তরের প্রথম (২০০০-১৮০০ খ্রীঃ পূঃ) স্তরে এক বিশেষ প্রকারের কৌলাল এবং দ্বিতীয় স্তরে (১৮০০-১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) হারাপ্পীয় কৌলালও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়েছে। আবার ঐ সময়কালের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রভাস কৌলালেরও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়া হারাপ্পা-সভ্যতাকালেই মজঃফরপুর জেলার ঝিনঝিনাতে (২৬০০-১৫৭০ খ্রীঃ পূঃ) সুন্দর গৈরিক রঙ-এর কৌলাল পাওয়া গেছে। সাহারাণপুর জেলার নাছিরপুরে (১৩০০ খ্রীঃ পূঃ), বুলান্দ জেলার লাল কিল্লাতে (২০৫০ খ্রীঃ

পূঃ), ইটা জেলার আত্রাঞ্জিখেরাতে (২২৮০ খ্রীঃ পূঃ), ইটাওয়া জেলার সাই-পাইতে (১৫০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ) পাওয়া গেছে গৈরিক কৌলাল। উজ্জয়িনীর ১৬ মাইল উত্তর-পূর্বে, কায়থে (পূর্বনাম কপিস্থকে ২১০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে) কুম্ভকারের চাকাতেই তৈরি এক বিশেষ ধরনের আকৃতি ও রঙ-এর কৌলাল ছিল। নর্মদা-তীরে নাভদাতলিতে (২০০০-৭০০ খ্রীঃ পূঃ) সাদা রঙ-এ চিত্রিত কৃষ্ণ-লোহিত কৌলাল ব্যবহৃত হতো। রাজপুতানার উদয়পুর নগরের প্রাচীন আহার-এ (২১৪৫-১২৭০ খ্রীস্ট পূর্ব) বিশিষ্ট আকার ও প্রকারের কৌলালও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের সুরকোটাডা ছিল হারাপ্পা-যুগের প্রসিদ্ধ নগর। এখানে হারাপ্পার পূর্ববর্তী সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া গেছে হারাপ্পা-যুগের কৌলাল ব্যতীত চার প্রকারের বিভিন্ন কৌলাল। পূর্ব পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়েও হারাপ্পা লিপিসহ হারাপ্পা-যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানেও হারাপ্পা কৌলালের সঙ্গে ব্যবহৃত হতো অন্যান্য প্রকারের কৌলাল। শতদ্রু নদীতীরে, পর্বত ও সমতলের সন্ধিস্থলে রূপারও হারাপ্পা-সংস্কৃতির এক প্রসিদ্ধ নগর। অনুমান, ১৪০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এই নগর পরিত্যক্ত হলেও এর নিকবর্তী বারাতে উক্ত সংস্কৃতি দীর্ঘকাল বহমান ছিল। কোনো মানবগোষ্ঠী কর্তৃক এই শহরটি ধ্বংস হওয়ার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

হারাপ্পা-সংস্কৃতির সময় সিন্ধু উপত্যকায় দেবী মূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল, কিন্তু গুজরাটে তা ছিল অজানা। পশুবলি ও মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি লোথালে চালু থাকলেও ঐ সময়কালে অন্যত্র তার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। হারাপ্পার সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবসান সম্পর্কে যে-সময়কালের উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরেও কয়েক শতাব্দী ধরে তার রেশ চলেছিল, সেই দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। হারাপ্পার সমাধিস্থলের এইচ. এ-তে প্রাপ্ত বিশাল একটি মৃৎপাত্রের চিত্রিত ঢাকনির অনুরূপ নিদর্শন বিকানীর জেলার রঙমহাল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে (খ্রীস্টীয় তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর) পাওয়া গেছে। রঙমহালে প্রাপ্ত নানা কৌলালের সঙ্গে হারাপ্পায় প্রাপ্ত কৌলালের সাদৃশ্য আছে। হারাপ্পা-সভ্যতা-কালের কৌলালের উপর আঁচড়ে আঁকা চিত্র বা নক্শার অনুরূপ নক্শা পরবর্তী-কালে গুজরাটে, উত্তর দাক্ষিণাত্যে, মধ্যপ্রদেশে, উত্তরপ্রদেশের নানা জিলাতে এবং এক হাজার খ্রীস্ট পূর্বাব্দের দাক্ষিণাত্যের ভগ্ন কৌলালে দেখতে পাওয়া গেছে। হারাপ্পা-সভ্যতার আলোক সিন্ধু উপত্যকায় নির্বাপিত হলেও সৌরাষ্ট্রে, মধ্য-প্রদেশে, রাজস্থানে ও উত্তরপ্রদেশে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে প্রজ্জ্বলিত

ছিল। যদিও বিভিন্ন সময়ে কৌলালের রূপের পরিবর্তন ঘটে কিন্তু সেই পরিবর্তন হারাপ্পাযুগেই শুরু হয়েছিল।

নানা প্রাকৃতিক কারণেই হারাপ্পা-সভ্যতা ক্ষীয়মাণ হতে থাকে। লোথাল বন্দরের নগর-পরিকল্পনায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, তা ছিল মাহেঞ্জোদারোর নগর-পরিকল্পনার ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেছেন যে, বারংবার জলপ্লাবনের দরুন এই বন্দরটি খ্রীস্টপূর্ব এক হাজার বৎসর কালেই লোপ পায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ মার্শাল সাহেবও মাহেঞ্জোদারোতে আবহাওয়ার অমঙ্গলজনক পরিবর্তন ও ভয়াবহ বন্যার প্রকোপের উল্লেখ করে গেছেন।

ই. ম্যাকে মহাশয় তাঁর *Further Excavation of Mahenjo-Daro* গ্রন্থে অনুপ্রবেশকারীগণের আক্রমণের পরিবর্তে সিন্ধুনদের গতি পরিবর্তনকেই মাহেঞ্জোদারো ধ্বংসের সম্ভাব্য কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এই নগরী হঠাৎ কোন এক সময়ে ধ্বংস হয়নি, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার চিহ্নই এর সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। মনে হয়, সম্ভবতঃ সিন্ধুনদ সরে যাবার কারণে এবং চারদিকের জমি অনুর্বরা হয়ে পড়ায় ধীরে ধীরে নগরটি জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হতে থাকে। ম্যাকে সাহেব দেখিয়েছেন, শেষের দিকের ইটের গাঁথুনি ছিল খুব নিকৃষ্ট ধরনের; আর ধ্বংসস্তূপ খনন করে সর্বনিম্ন স্তরেই আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক উন্নত মানের গাঁথুনি এবং আকারে খুব বৃহত্তম অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ।

লোথাল, রংপুর, দেশালপুর, ভগতরভ ও চানহুদারো বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ এস. আর. রাও। হারাপ্পা অনুরূপ কারণে ধ্বংস হতে পারে, এটা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়।

আমরা দেখেছি, সেকালে নগরগুলো গড়ে উঠত নদীপ্রান্তে। হঠাৎ কোনো প্লাবনে অথবা নদী সরে যাওয়ার ফলে অনেক প্রাচীন নগরী ধ্বংস হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ অজস্র। রামচন্দ্রের অযোধ্যা, কৌরবগণের হস্তীনাপুর, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, মগধের পাটলীপুত্র, এমন কি সেদিনের চৈতন্যের নবদ্বীপও নদীগর্ভে লোপ পেয়েছে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ এম্. আর. সাহনি তাঁর *Man in Evolution* নামক পুস্তকের ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠায় বন্যাই বহু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। হারাপ্পা-সভ্যতা একই সময়ে সর্বত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন কারণে তার বিলুপ্তি ঘটে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও হারাপ্পা-সভ্যতা হতমান হবার অন্যতম একটি কারণ হতে পারে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হয়। সমগ্র ভারতে রাজশক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রচণ্ড আঘাত পায়।

হারাপ্পা-সভ্যতাকে বলা হয় নগর-সভ্যতা। এ কথাটিও যথার্থ নয়। হারাপ্পা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রথম দিকে কতকগুলো নগর আবিষ্কৃত হয়েছিল বলেই এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। কতকগুলো গ্রামকে অবলম্বন করেই শহর গড়ে উঠেছিল। উন্নতমানের কৃষি ছিল বলেই ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রসার লাভ করেছিল। মাহেঞ্জোদারো, চানহুদাড়ো, প্রভাসপত্তন (সোমনাথ) ও লোথাল প্রভৃতি ছিল তৎকালীন প্রধান বন্দর।

সিন্ধু-সভ্যতায় যেমন প্রচুর পরিমাণে পোড়া ইটের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে, পরবর্তীকালে কিন্তু তা দেখা যায়নি। এই সময়ে পোড়া ইটের বদলে কাঁচা ইটের ব্যবহার চলতে থাকে। তার কারণ, ঐ সময়ে সম্ভবতঃ নৈসর্গিক পরিবর্তন ঘটেছিল ব্যাপক আকারে, যার ফলে শতদ্রু ও যমুনা তাদের গতি পরিবর্তন করে এবং রাজপুতানা সাগর মরুভূমিতে পরিণত হয়। আর সরস্বতী নদী নবউত্থিত মরুবালু তলে অন্তর্হিত হয়। বৃষ্টির অভাবে বনজঙ্গল ধ্বংস হয়ে যায়, ইট পোড়াবার কাঠেরও অভাব ঘটে।

হারাপ্পা-সভ্যতার অবসান ঘটে খুব সম্ভব খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে। স্যার জন মার্শাল, স্যার মার্টিমার হুইলার, স্যার লিওনার্ড উলে প্রভৃতি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণ তাঁদের বদ্ধমূল সংস্কার ও সীমিত তথ্যাদির ভিত্তিতেই এই অভিমত দিয়েছেন যে, আদিম অধিবাসীদের (হারাপ্পা-সভ্যতার অধিবাসী-গণের) প্রাচীরবেষ্টিত নগরীসমূহের উপর বহিরাগত আর্য অভিযানকারীদের বর্বর আক্রমণের সাক্ষ্য বহন করছে ঋগ্বেদ গ্রন্থটি। স্যার লিওনার্ড উলের মতে, "ঋগ্বেদ হচ্ছে প্রাচীন পৃথিবীর এক মহান সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংসের মহাকাব্য।"[১] অর্থাৎ আর্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নন, তারা বহিরাগত। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সুস্পষ্ট ধারণা, উপরোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদদের মগজেও বদ্ধমূল ছিল; তার উপর তাঁরা জানলেন (অবশ্যই অপর স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের কাছ থেকে, কারণ ঋগ্বেদে দন্তস্ফুট করা তাঁদের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল) ঋগ্বেদে আর্য-অনার্যের বহু যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে এবং আর্যদের দেবতা ইন্দ্র অনার্যদের বহু পুর ধ্বংস করেছেন; এছাড়া তাঁরা মাহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ খনন করে তিনটি পৃথক

১ "Rigveda is the epic of destruction of one of the great cultures of the ancient world." *History of Mankind*, Vol. I, p. 399

স্থানে পেলেন—১৪, ৬ ও ৯টি নরকঙ্কাল এবং দেখলেন পাঞ্জাবে ও সিন্ধুর নানা স্থলে (সর্বত্র নয়) খ্রীঃ পূঃ ৭নের শতাব্দী নাগাদ হারাপ্পা-সভ্যতার অবসান। এই কয়টি ঘটনার সমাবেশ থেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন—আর্যরা বহিরাগত এবং অর্ধবর্বর জাতি। এই আর্যরাই ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে স্থানীয় সুসভ্য আদি-বাসীদের (হারাপ্পা-সভ্যতার) প্রাচীরবেষ্টিত নগরসমূহ ধ্বংস করে ভারতে অনুপ্রবেশের পরেই নাকি করেছিলেন হারাপ্পা-সভ্যতার ধ্বংসসাধন। ঋগ্বেদের 'পুর' সমূহ যে হারাপ্পা-সভ্যতার 'পুর' নয়, সেই আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। মাহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতিবাদের কথাটিও ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। উলে মহাশয়ের মতে, আর্যগণ নিশ্চয়ই হারাপ্পা-সভ্যতা ধ্বংস করেছিল, কারণ ঐ সভ্যতা ধ্বংসের আর কোন সম্ভাব্য যুক্তি নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর মতে তাই ঋগ্বেদ হচ্ছে 'ধ্বংসের মহাকাব্য।' এইসব মতবাদ যে কত অসার তা পরবর্তী-কালের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রমাণিত হয়েছে।

কোন্ সময় থেকে ভারতে এই সংস্কৃতির সূত্রপাত আর কোন্ শতাব্দীতে ঘটে তার অবলুপ্তি তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে নানা পণ্ডিতের নানা মত চালু আছে। মার্শাল সাহেব শেষ পর্যন্ত অনুমান করেছিলেন যে, এর স্থায়িত্ব খ্রীঃ পূঃ ৩১৫০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ পর্যন্ত। হুইলার সাহেবও পর্যালোচনা করে এর স্থায়িত্ব দেখিয়েছিলেন—২৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত। এর পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল ২৩০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। প্রত্নতাত্ত্বিক ডি. পি. আগরওয়ালা সি-১৪ কার্বন যোগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ২৩০০ থেকে ১৭৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ হলো এই সভ্যতার স্থায়িত্ব কাল। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া বলেছেন—এই সভ্যতার স্থায়িত্ব এক হিসাবে ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ ; অপর হিসাবে ২৩৫০ থেকে ১৭০০ খ্রীঃ পূঃ (দ্র. *Pre-History of India* by **H. D. Sankalia**)।

কোথা থেকে এই সংস্কৃতির উদ্ভব আর কেনই বা তা লয় পেল, এর সঠিক উত্তর আমাদের অজ্ঞাত। কেউ কেউ মনে করেন—এর সংস্কৃতি বহিরাগত—অর্থাৎ ইরান, দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া, সুমের প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী করা। কেউ-বা মনে করেন, এ-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। ওয়াই. ডি. শর্মার মতে—হারাপ্পা-সংস্কৃতির উদ্ভব সোথি সংস্কৃতি থেকে (কালিবঙ্গানে, দক্ষিণ রাজস্থানে সরস্বতী-দৃশদ্বতী নদীতীরে হারাপ্পা-সংস্কৃতির পূর্বে যে-সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল তাকেই

সোথি বলে) এবং এতদ্ব্যতীত আম্রি, নাল, ঝব, কুল্লী ও কটদিজি প্রভৃতি প্রাক্-হারাপ্পা সংস্কৃতি থেকেও এটি উদ্ভূত হতে পারে।[১]

এম. আর. রাও-এর মতে, হারাপ্পা-সংস্কৃতির আবির্ভাবের পূর্বে গুজরাটে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল। এগুলোরও অবদান আছে। হারাপ্পা-সংস্কৃতি আবির্ভাবের পূর্বেই মুণ্ডিগাক্, কালিবঙ্গান, কটদিজি ও আম্রিতে যে সুরক্ষিত নগর ছিল সেগুলোই হয়তো হারাপ্পা ও মাহেঞ্জোদারোর দুর্গ-প্রাকারের জন্ম দেয়।[২]

প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রী সরকার হারাপ্পা যুগের প্রাপ্ত মস্তিষ্কের করোটি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, মাহেঞ্জোদারোর জনগণের সঙ্গে বর্তমান সিন্ধুদেশের জনগণের সাদৃশ্য আছে, তারা একই জাতিভুক্ত।[৩] হারাপ্পার প্রাচীন জনগণের সঙ্গে বর্তমান পাঞ্জাবের ও লোথালের এবং বর্তমান গুজরাটের জনগণের সাদৃশ্য আছে। এর মধ্য দিয়ে এটিই অনুমতি হয় যে, হারাপ্পা-সংস্কৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন অধিবাসীগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হয়েছিল। অপর কোন দেশের লোক এসে এইসব স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেনি।

প্রত্নতাত্ত্বিক এ. ঘোষ দেখিয়েছেন, কালিবঙ্গানে, পূর্বরাজস্থানে, কটদিজিতেও হারাপ্পা-সংস্কৃতির পূর্ণতা প্রাপ্তির সময়েও পূর্বকথিত সোথি সংস্কৃতির কিছু কিছু মূল বৈশিষ্ট্য প্রচলিত ছিল।[৪] তাঁর মতে হারাপ্পা-সংস্কৃতি ভারতীয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া দেখিয়েছেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কারণে হারাপ্পা-সংস্কৃতির অবসান ঘটেছিল।[৫] (একটি মাত্র কারণে, একই সঙ্গে, একই সময়ে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়নি)। কারণগুলো স্থান বিশেষে পৃথক পৃথক। কোথাও কোথাও নৈসর্গিক কারণে, যথা: নদী সরে যাওয়ায়, জলপ্লাবনে, বৃষ্টিপাত হ্রাস পাওয়ায়, পানীয় জলের অভাব ঘটায়, কোথাও বা অগ্নিতে ভস্মীভূত হওয়া, যেমন ঘটেছিল কটদিজিতে, কোথাও বহিঃশত্রুর আক্রমণ (এটা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হতে পারে), যেমন গুমলা আক্রান্ত হয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল।

এই সংস্কৃতি বা সভ্যতার অবসানে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কি ঘটেছিল আমরা তা জানি না। হয়তো সে সময় বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হতে পারে,

১. দ্র. *Pre-History and Proto-History of India* by K. C. Jain, pp. 131-135.

২. দ্র. ঐ. পৃ. ১১৯-৩১

৩. দ্র. ঐ. পৃ. ১১৮

৪. দ্র *Indian Pre-History* by A. Ghose, pp. 113-18,

৫. দ্র. *Pre-History of India* by H. D. Sankalia, p. 95.

যেমনটি দেখা গেছে চানহুদারোতে। সৌরাষ্ট্রে ও গুজরাটে রংপুর আর সোমনাথ (প্রভাসপত্তন) খুঁড়ে সংস্কৃতির ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে, অর্থাৎ পুরাতন থেকে নূতনে ঘটেছিল ক্রম-অবনতি। হারাপ্পা-সভ্যতার ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা ঐ সংস্কৃতির পতনের পরও কৌলাল নির্মাণে সুদীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

ইয়োরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ হারাপ্পা-সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্যসভ্যতার কোন নিদর্শন খুঁজে পাননি। অথচ তাঁদেরই পুথিপত্রে পাওয়া যায় যে, লোথালের ও কালিবঙ্গানের জনগণ অগ্নি-উপাসক ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের বিভিন্ন স্তরে অগ্নি রক্ষার জন্য সমআয়ত বা ডিম্বাকৃতি যে-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার চারদিকে ইটের প্রাচীর-ঘেরা একাধিক যজ্ঞবেদী যজ্ঞভস্মসহ পাওয়া গেছে। লোথালে ও কালিবঙ্গানে যে সাতটি সীল পাওয়া গেছে তাতেও অঙ্কিত আছে—যজ্ঞবেদী, কূপ ও স্নানের জন্য বাঁধানো স্থান।[১] এর দ্বারা কোনো ধর্মকর্মই তো সূচিত হয়। এই সীলগুলোর একদিক পোড়ামাটির লিপি আছে, অপর দিকে কিছু নেই। হারাপ্পায় যে বিরাট স্নানাগার পাওয়া গেছে তার চারপাশের বিরাট ভগ্ন অট্টালিকাটি যে যজ্ঞশালার ধ্বংসস্তূপ নয়, তা কে বলতে পারে? মাহেঞ্জো-দারোর ভগ্ন অট্টালিকাটি, যেখান থেকে কয়েকটি ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে তা একটি দেবমন্দির। হারাপ্পা ও মাহেঞ্জো-দারোর গৃহে যেসব বাঁধানো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ পাওয়া গেছে, সেখানে যে গৃহস্থের নিত্যকার যজ্ঞবেদী ছিল না, তার নিশ্চয়তা কি? প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হারাপ্পায় যেসব মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্তি বলেই অনুমতি হয়। কোথাও কোথাও দেবীপূজাও প্রচলিত ছিল, এটা মনে হতে পারে। কারণ, একটি দেবী-মূর্তিতে ধূপের দাগ সুস্পষ্ট। ঐ ধরনের মূর্তি দক্ষিণ ভারতের বৃক্ষতলে ও গ্রাম-মন্দিরে আজও পূজিত হয়। ভারতে মাতৃকাপূজা অতি প্রাচীন ও সর্বব্যাপী। "ব্রহ্মণস্পতি, কর্মারের ন্যায় দেবতাদেরও নির্মাণ করলেন" (ঋ ১০.৭২.২)। এই কর্মার, কার্মার (১.১১২.২) থেকে পৃথক। সম্ভবতঃ মূর্তি গড়ার জন্য আলাদা একটি বৃত্তি ছিল। "দেব-লোকায় পেশিতারং" (শুক্ল যজুঃ, ৩০।১২)—দেবালোকের উদ্দেশে প্রতিমা নির্মাণকারী শিল্পী।

মার্শাল সাহেবও প্রাচীন হারাপ্পা-সংস্কৃতির জনগণের সঙ্গে বর্তমান হিন্দুদের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের কথা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি নিজেই লিখেছেন—বর্তমান হিন্দুজাতি প্রাগৈতিহাসিক জনগণের ধর্মাচরণ গ্রহণ করেছে।

১. *Pre-History of India* by H. D. Sankalia p. 95.

কিন্তু তা সত্ত্বেও হারাপ্পা-সভ্যতা যে বৈদিক আর্যগণেরই কীর্তি তা তিনি স্বীকার করতে পারেননি। কারণ তাঁর মতে—আর্যগণ একটা পৃথক জাতি এবং তারা অনেক পরে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

হারাপ্পা-সংস্কৃতি ও সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়। এই সংস্কৃতির পূর্বেও যে নানা সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ ভারতের নানাস্থান খুঁড়ে পাওয়া গেছে। হারাপ্পা-সভ্যতার অনেক নগরই ঐ সভ্যতা পত্তনের পূর্ব থেকেই ছিল; পরবর্তী খননের ফলে বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এর প্রমাণ পেয়েছেন। ইয়োরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ (মার্শাল, হুইলার, পিগট, হেরাস, উলে প্রভৃতি) এই হারাপ্পা-সভ্যতার উপর যখন পুস্তক লেখেন তখন তাঁরা হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্বেও এ দেশে যে অন্য এক সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল, তার কোনো সুস্পষ্ট পরিচয় পান নি। তাঁরা তাই ভেবেছিলেন, এই হারাপ্পা-সভ্যতা বহিরাগত। কিন্তু এর সমর্থনে এ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁরা হারাপ্পা-সভ্যতার ইতি যেখানে টেনেছিলেন তার পরেও দেখা গেছে যে, ঐ সভ্যতার স্রোত নানাস্থানে বর্তমান। প্রাক্-হারাপ্পা, হারাপ্পা ও হারাপ্পা-পরবর্তী সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগসূত্রও প্রমাণিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খণ্ডিত আকারে পৃথক করে দেখলেও এবং ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করলেও সামগ্রিকভাবে এসবই ছিল একই সভ্যতা-সংস্কৃতির জোয়ার-ভাটার নিদর্শন মাত্র। হারাপ্পা-সংস্কৃতির পূর্বেও কালিবঙ্গানে প্রাপ্ত কুম্ভকারের চক্রে নির্মিত কৌলাল ছিল রঙীন ও চিত্রিত। এর নকশা ছিল—জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক। এছাড়া গৃহ নির্মাণে ইটের ব্যবহার ছিল, নগর ও পয়ঃপ্রণালী ছিল, শহরের চতুর্দিকে ছিল কাঁচা ইটের প্রাচীর, তুলায় প্রস্তুত বস্ত্রের ব্যবহার যেমন ছিল তেমনি ছিল তামা ও শাঁখার বালা এবং পুঁতি। আর ছিল কৃষি, লাঙল দিয়ে চাষ ও পরিবহণের জন্য গোশকট। হারাপ্পা-সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এসবই আরও উন্নতমানে পৌছে গিয়েছিল, এই যা পার্থক্য।

ভারতের অন্যতম প্রবেশপথ বোলান গিরিবর্ত্মের যেখানে শুরু, বেলুচিস্তানের বোলান নদীতীরের সেই মেহেরগড়হ্-এ একশত একর জুড়ে হারাপ্পা-সভ্যতার সূত্রপাতের তিন-চার হাজার বৎসর পূর্বেকার, অর্থাৎ ৫০০০-৭০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের এক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ধ্বংসাবশেষের সর্বনিম্ন স্তরে কোন কৌলাল পাওয়া যায়নি, কিন্তু কাঁচা ইটের গাঁথুনি আছে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ঐ সময়ে কৃষি ছিল এবং যব উৎপন্ন হতো। পরবর্তী স্তরে পাওয়া গেছে কৌলাল ও কাঁচা ইটের ভগ্ন অট্টালিকা। খননের ফলে এই শহরের

দক্ষিণে ৪০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের দশ কুঠুরি যুক্ত এক অট্টালিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। কুঠুরিগুলো খুব ছোট ছোট, মনে হয়, গম-যব রাখার জন্য এগুলি গুদামঘর রূপে ব্যবহৃত হতো। এখানে একটা চুল্লীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে পোড়া তুলার বীজ। নিকটবর্তী রহমানবৈরীতে একটি শহরের ও বড় বড় অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া তাঁর গ্রন্থ—'ইণ্ডিয়ান আর্কিওলজি টু ডে'-র মুখবন্ধে লিখেছেন: "আমরা এটা ধারণা করতে পারি যে, সিন্ধুসভ্যতা হঠাৎ জন্মায়নি। এর পশ্চাতে ছিল তিন কিংবা চার শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা—যখন বেলুচিস্তানের মানুষ ক্রমশঃ কোলাল নির্মাণের কৌশল অর্জন করেছিল।" মেহেরগড়হ্-এর সঙ্গে তুলনীয় কোন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ ইরানীয় বেলুচিস্তান, সিস্তান, আফগানিস্তান বা মধ্য এশিয়ায় পাওয়া যায়নি। ঐ পুস্তকেরই বিভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো রয়েছে:

"পাকিস্তানীরা আমাদের বলেছে, প্রাচীন সরস্বতী নদীর উপত্যকায় শত শত এরূপ ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে" (পৃ. ৮৬)। "ডাঃ এম. আর মুঘল (পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক **Dr. M. R. Mughal**)-এর কাছ থেকে আমরা শুনেছি, তিনি হাকরা সমাবেশে (সরস্বতী নদীর স্থানীয় নাম হাকরা) ২৪টি ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন, যার কালনির্ণয় করা হয়েছে ৩৫০০ খ্রীঃ পূঃ। অতএব হাকরা বা বৈদিক সরস্বতী-সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে সর্ব পুরাতন ছিল। (পৃ. ৮৮)

"আমেরিকান ও পাকিস্তানী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিন্ধু দেশের সাগর-তীরবর্তী অঞ্চলে ও চোলিস্তানে (পূর্বতন বাহাওয়ালপুর রাজ্য—রাজপুতানার গঙ্গানগরের নিকটে, যেখানে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয় মিশেছে) খনন কার্য চালিয়ে দেখেছেন—সিন্ধুসভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই সিন্ধু দেশের আরব সাগরতীরে, উত্তর রাজস্থানে, হরিয়ানায় ও পাঞ্জাবে—নগর পরিকল্পনার ছাঁচে আকার-প্রাপ্ত ও ভাটায়পোড়া ইটের গাঁথুনি এবং বিশেষ প্রকারের কৌলাল নির্মাণ-কৌশল জনগণের জানা ছিল।" হারাপ্পা পূর্বকালেই, বানওয়ালিতে, ভগবানপুরা ও দুধেরিতে সোনা পাওয়া গেছে। "হারাপ্পা-পূর্ব সভ্যতার নগরগুলোই হারাপ্পা-সভ্যতা ব্যবহার করেছে।" "ভগবানপুরা (হরিয়ানা), দুধেরি (পাঞ্জাব) নাগার, কাটাপোলান (চেনাব নদীতীরে) ও মাণ্ডা-তে (জম্মু) দুটি অথবা তিনটি সংস্কৃতির (হারাপ্পা-পূর্ব, হারাপ্পীয় ও হারাপ্পা-পরবর্তী) চিত্রিত ধূসর কৌলাল-এর পরম্পর সংযুক্তি দেখা গেছে। এর মধ্যে কোন সাংস্কৃতিক ছেদ ঘটে

নি।” দুই প্রান্তের দুই প্রদেশে—পাঞ্জাব ও সৌরাষ্ট্রে—হারাপ্পা-সভ্যতার সংস্কৃতি বিস্তারের পৃথক রূপ ছিল। পূর্ব পাঞ্জাব, আম্বালা, জলন্ধর ও ভাটিণ্ডা জেলাতেও ছিল পৃথক রূপ।

“হারাপ্পা-সংস্কৃতির শেষ পর্যায়ে পৌরজীবনের, বিশেষ করে গৃহনির্মাণ পদ্ধতির অবনতি মাহেঞ্জোদারো, পুর্ব-পাঞ্জাব ও জম্মুতে দেখা গেছে। আমরা এটাকে প্রায় সর্বত্র সমান বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিতে পারি।” (পৃ. ৮৯)

মাহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের সর্বোচ্চ স্তর দুটিতে নাগরিক জীবনের সুস্পষ্ট অধনতি পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন স্তরসমূহের সুন্দর গৃহগুলির পরিবর্তে জীর্ণ ও নোংরা কুটির সমূহের আবির্ভাব, ভগ্ন ইষ্টকের অধিকতর ব্যবহার এবং রাজপথের উপরই ইটের ভাটা, সাধারণের সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার—এ সকলই ছিল শেষ সময়ের চিত্র।

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হারাপ্পা-সভ্যতা ও সংস্কৃতিই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়। পরিকল্পনা অনুসারে নগর-নির্মাণেও এই সভ্যতা পথিকৃৎ নয়। হারাপ্পা-সভ্যতার উদ্ভব হঠাৎ হয় নি। তার পশ্চাতেও সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উন্নয়নের অতীত ঐতিহ্য আছে। হারাপ্পা-সভ্যতার বিশিষ্ট কৌলাল আছে বটে, কিন্তু অন্য আকৃতির কৌলালও যে তখন ব্যবহৃত হয়নি, তা নয়। এই সভ্যতা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আকৃতি নিয়েছিল। এ-সভ্যতার ধ্বংস হঠাৎ কিংবা সর্বত্র একই সময়ে হয়নি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সভ্যতার সঙ্গে হারাপ্পা-সভ্যতার ধারাবাহিকতা অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হয়েছে। হারাপ্পা-সভ্যতা ধ্বংসের পূর্বেই তার সাংস্কৃতিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে এমন কোন প্রমাণ ভারতে পাওয়া যায়নি; পরন্তু, প্রাকৃতিক কারণেই বহু স্থলেএই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, এমন প্রমাণ দুর্লভ নয়।

সুতরাং মার্শাল, পিগট, হুইলার, উলে প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সামান্য খনন কার্য পরিচালনা করেই তাঁদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যেসব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, অধিকাংশ স্থলেই তা অসার বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

মোট কথা, ‘অর্ধবর্বর আর্যগণ’ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে অনুপ্রবেশ করে হারাপ্পা-সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে বসতি বিস্তার করেছিল, এটা উপরোক্ত মাননীয় পণ্ডিতগণের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র। সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে একথা বোধহয় বলা যায় যে, ঋগ্বেদের কালে সরস্বতী ও

দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল তৎকালীন সভ্যতার মর্মকেন্দ্র। সরস্বতী ছিল নদীতমে, অম্বিতমে, দেবীতমে। এই নদীদ্বয়ের তীরে তীরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হারাপ্পাকালের বহু ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। খননকার্য সম্পূর্ণ হলে বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ অঞ্চল বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত।

সাম্প্রতিককালে, গঙ্গার উপনদী সাইতীরস্থ এলাহাবাদ ও প্রতাপগড় জেলায় মধ্যাশ্মীয় যুগের (Messolithic) প্রায় দুইশত মনুষ্য-বসতি, সরাই ও নাহার-বাই আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে ৯০০০-৬০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মানুষ বসবাস করত। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের নিকটে ও দক্ষিণে গঙ্গার উপনদী বেলানের (বিন্ধ্য পর্বত থেকে উৎপন্ন) তীরে এবং উত্তরে গঙ্গার প্রাচীন খাতের তীরে কলদি-হোয়া ও মেহগড়হ নামে দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে জি. আর. শর্মা একটা লুপ্ত হ্রদ বা নদীতীরে মেহগড়হ আবিষ্কার করেন। এখানে ৬০০০-৫০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দেই মানুষ পশুপালন ও চাষ-আবাদকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তারা কুটিরে বাস করত এবং প্রস্তর থেকে আয়ুধাদি নির্মাণ করত। এখানে চকচকে কুঠার (পালিশ করা) ও পাতলা ছুরি (প্রস্তরের) পাওয়া গেছে। পরবর্তী স্তরে যে কৌলাল পাওয়া গেছে তা তারা নির্মাণ করত পাতলা ধূসর রং এবং খোদাই করা অলংকরণ সহ। এ রকম নিদর্শন বেলান নদীতীরে কলদিহোয়া এবং দেওঘাটেও পাওয়া গেছে, ১৯৭৫ সালে। এখানে প্রাপ্ত কৌলাল নবাশ্মীয় (Neolithic) যুগের, অর্থাৎ ৬০০০-৫০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের। এই অঞ্চলেই পরবর্তী তাম্রাশ্মীয় যুগের (Chalcolithic) (রেডিও-কার্বন পরীক্ষায় নির্ণীত ৪৬৮০-৪৩১৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের) নিদর্শনও পাওয়া গেছে। বেলান নদীর অববাহিকায় অবস্থিত চোপানি মান্ডো হলো মধ্যাশ্মীয় যুগের (Messolithic) আর একটি বসতি স্থল। এসব অঞ্চলে সবে-মাত্র খননকার্য শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে যেটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে বলা যায়, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ থেকে এর ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকভাবে এই ভারতের বুকেই ঘটেছে। বাইরের কোন মানবগোষ্ঠী এসে এখানে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, পারম্পর্যেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।

আর্য-সমস্যার সমাধানের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে অতীতে অনেক প্রচেষ্টা হয়েছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের একাংশের ধারণা—মধ্য এশিয়াই প্রাচীন আর্যজাতির বা ভাষাগোষ্ঠীর আদিম বাসভূমি। মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত চারটি রাজ্য আছে। এগুলি হলো—তুর্ক-

মেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কিরঘিজিয়া। রুশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এইসব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁরা ইরান, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়েছেন। এর ফলে প্রাগৈতিহাহিক সংস্কৃতির বহু পীঠস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রাচীন নগরের অনেক ধ্বংসাবশেষও খুঁজে পাওয়া গেছে। এইসব আবিষ্কার সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে; তাতে কোথাও কোথাও সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথা উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে বলা যায়, সিন্ধু বা হারাপ্পা-সভ্যতা তথা ভারতীয় সভ্যতা কোন কালেই এইসব সভ্যতার নিকট ঋণী ছিল। ভারতে যে-সভ্যতা আদিম কাল থেকে গড়ে উঠেছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ ভারতেরই নিজস্ব ব্যাপার।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুসারে আর্যরা যদি ভারতে বহিরাগত হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল? স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই আদিম নিবাস থেকে শুধু ভারতীয় আর্যগণই নয়—হিত্তি, মিতান্নি, কাসাইট পারসীক আর্যগণও দলে দলে বেরিয়ে এসেছিলেন। ইয়োরোপে যে-আর্যগণ নানাদিকে অভিযান করেছিলেন তারাও ছিলেন তাদেরই দলভুক্ত। এক-একটি দল নিশ্চয় সংখ্যায় বেশ ভারী ছিল, কেননা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে স্থানীয় রাজশক্তির সঙ্গে এবং অধিবাসীদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল, তারপর জয়ী হয়ে ভালো সংখ্যক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ নিয়েই তবে তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। আর ভারতে যে-দল এসেছিল, তাদের সমরবিদ্যায় নিশ্চয় বেশ পটু হতে হয়েছিল, কারণ তথাকথিত দুর্গ নগরগুলো (সংখ্যায় হাজারের উপর; এক অনার্য শম্বর রাজারই ছিল শত দুর্গ; বৃত্রের ছিল আরো অনেক বেশি এবং অন্যান্য তথাকথিত অনার্য রাজাদের প্রত্যেকেরই কম-বেশি দুর্গ ছিল) ভেদ করেই তাদের প্রবেশ করতে হয়েছিল। সেই 'আদিম নিবাস' নিশ্চয় জনবহুল ছিল। সুতরাং আকারেও তা নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না।

সেই তথাকথিত 'আদিম নিবাস' থেকে আর্যগণ যখন বহির্গত হয়ে নানাদিকে অভিযান করে তখন মহাপণ্ডিত স্যার উলে মহাশয় তাদের যতটা বর্বর ভেবেছিলেন (তাঁর মতে ভারতে অভিযানকারী আর্যরা 'অর্ধবর্বর' ছিল, কাসাইট মিতান্নিদের সম্পর্কেও তিনি প্রায় একই কথা বলেছেন) তারা ততটা বর্বর থাকতে পারে না। যে-ভাষা তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, (স্যার উইলিয়াম জোনস্, ম্যাকসমূলর প্রভৃতির মতে) তা একান্ত বর্বরোচিত ভাষা নয়—বেশ

কিছুটা উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা। শব্দসম্পদে এবং ক্রিয়াপদের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে আদিম নিবাসেই সেই ভাষা এতটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল যে, সেই ভাষা থেকে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, জেন্দ (পারসীক) হিত্তি, মিতান্নি, কাসাইট, কেল্টিক, টিউটনিক, স্লাভনিক প্রভৃতি ভাষারও সৃষ্টি হয়েছিল। আদিম বাসভূমি থেকে নির্গমন কালে, তথাকথিত আর্যগণ শুধু ভাষা নয়, তাদের দেবতাগণকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। যে-দেবতাদের বর্ণনা ঋগ্বেদে পাই তার ধারণা বা কল্পনা এমন এক মানসিক উৎকর্ষতার পরিচয় দেয় যে, তা কোনক্রমে স্যার উলে-বর্ণিত বর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত বলে ভাবাই যায় না।

আদিম নিবাস রূপে যে কয়টি স্থানের উল্লেখ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা করেছেন, তার মধ্যে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। স্যার উলে তাঁর 'মানবজাতির ইতিহাস'-এ এটির উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর মতে, আর্যরা বেরিয়ে এসেছিল দ্বিসহস্র খ্রীস্ট পূর্বের কাছা-কাছি সময়কালে। ঐ অঞ্চলের দক্ষিণভাগে ককেসাস পর্বতমালা কাস্পিয়ান থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালা আদিম বাসভূমি হতে পারে না, কারণ এর উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে ছিল সাগর। কাস্পিয়ান সাগর, আরব সাগর ও কৃষ্ণ সাগর একই সাগরে পরিণত ছিল। খ্রীস্ট পূর্ব দেড় হাজার কিংবা তার কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চাতে এক প্রলয়ের ফলে এই সাগরের জল স্ফীত হয়ে বসফরাস প্রণালী সৃষ্টি করে ভূমধ্য সাগরে গিয়ে পড়ে। ডুকালিয়ন তখন গ্রীস দেশের থেসালির এক অঞ্চলের রাজা। এই ঐতিহাসিক ঘটনা ভূতাত্ত্বিক এবং ঐতি-হাসিকগণ স্বীকার করেছেন। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হয় আর্যদের আদিম বাসভূমি এই সাগরের উত্তরে ছিল। কিন্তু আর্যদের দলগুলো সশস্ত্র অবস্থায় এই সাগর-পর্বত ডিঙ্গিয়ে সেকালে ভারতে, পশ্চিম এশিয়ায় এবং ইয়ো-রোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, এটা অবিশ্বাস্য কথা। ভারত ঐ স্থান থেকে বহুদূরে ; সোভিয়েট দেশের ঐ অঞ্চলগুলোতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এমন কোন ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়নি।

আর্যদের আদিম নিবাসরূপে অন্যান্য যেসকল স্থানের কল্পনা করা হয়েছিল, পামীর ও হিন্দুকুশ বাদে তার প্রায় সবই সোভিয়েট-দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত। পামীর মালভূমি বা হিন্দুকুশ পর্বতেই-বা সেকালে কত অধিবাসীর স্থান হতে পারত? এছাড়া তথাকথিত অদিম নিবাস থেকে আর্যগণ হঠাৎ কোন এক সময়ে একযোগে নিশ্চয় নির্গত হননি। হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দলে দলে বহির্গত হয়ে তারা এক-এক দিকে এক-এক দল অভিযান চালিয়েছেন। সে-

ক্ষেত্রে তাদের আদিম নিবাসে কিছু-না-কিছু বংশধর ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি ফেলে আসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়েও তার নিদর্শন কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দক্ষিণ রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ইরান ও উত্তর আফগানিস্তানের সুপ্রাচীন শহর ও গ্রামের ধ্বংসস্তূপসমূহে খননকার্য চালিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখেছেন, কিন্তু আর্য-সমস্যা সমাধানের কোন সূত্র পাননি। তারা এমন কিছু নিদর্শন পাননি যাতে করে বলা যায় যে, বৈদিক আর্যগণ উপ-রোক্ত অঞ্চলগুলির কোথাও না কোথাও বসবাস করতেন কিংবা সেখান থেকেই তারা অভিযানে বহির্গত হয়েছিলেন।

দিল্লীতে অবস্থিত ভারতীয় জাদুঘরের মধ্য এশিয়া বিভাগের ন্যাসরক্ষক প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ এস. পি. গুপ্ত সোভিয়েট প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি নিজেও মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে-ছেন। রুশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রতিবেদনগুলি নিয়েও তিনি গভীরভাবে গবেষণা করেছেন। রুশ দেশের বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে আলোচনান্তে অতি সম্প্রতি তিনি দুই খণ্ডে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন—*Archaeology of Soviet Central Asia and the Indian Border lands*. এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধটি লিখেছেন—সোভিয়েট রাশিয়ার তাজিক রাজ্যের বিজ্ঞান একাডেমির প্রধান। এই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠাতে (৩১৮ পৃ.) পুস্তকের 'সংক্ষিপ্তসার,' অর্থাৎ পর্যালোচনার পর যে শেষসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে, নীচে তার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো:

"সোভিয়েট পণ্ডিতগণের বিশ্লেষণ আরও দেখায় যে, প্রত্নতাত্ত্বিক মতানুসারে এটি প্রমাণ করা যায় না যে বৈদিক আর্যগণ পশ্চিম তুর্কমেনিয়ার জাহিস্তান কোপেটদাগ অঞ্চল থেকে, উত্তর ইরান থেকে অথবা দক্ষিণ-পূর্ব তুর্কমেনিয়ার তেগেন মরগাব বদ্বীপ থেকে কিংবা উজবেকিস্তানের বা তাজিকিস্তানের দক্ষিণাংশের আমুদরিয়া (Oxus) উপত্যকা থেকে বা তাজিকিস্তান ও আফগানের উত্তরাংশ থেকে আগমন করেছিল।

"এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী আরও বলা যায় যে, ইন্দো-ইয়োরোপীয়গণের আদি-নিবাস-সমস্যা সম্পূর্ণরূপে বৈদিক আর্যগণের সমস্যার উপর আরোপ করা যায় না।

"আদিম হস্তশিল্পের বণ্টন বিশ্লেষণ এটাই তুলে ধরে যে, ভারতীয় সীমান্তে এবং সিন্ধু অববাহিকায় বিক্ষিপ্তভাবে মধ্য এশীয় সামগ্রী পাওয়া গেলেও সেই প্রাপ্তি বড় জোর বিনিময় সূত্রে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—সামাগ্রিকভাবে মধ্য

এশিয়ার ইতিহাসপূর্ব সংস্কৃতিসমূহের কোনটিই বৈদিক আর্যগণের 'আদিম বাসভূমি' ভারতীয় গঙ্গা পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেনি।"

ইয়োরোপের ডানিয়ুব, ভলগা, উরল প্রভৃতি অঞ্চলের তথাকথিত আদিম বাসস্থান থেকে আর্যগণের ভারতে অনুপ্রবেশের ধারণা অনুরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক কারণেই পরিত্যাগ করা যেতে পারে। আর্যগণকে ভারতে আসতে হলে ইরান, বেলুচিস্তান অথবা আফগানিস্তানের উপর দিয়েই তো আসতে হবে। এই তিন দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রখ্যাত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়াও তাঁর পুস্তকে[১] স্বীকার করেছেন, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাচীন সংস্কৃতির যেসব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা দেখে নিশ্চয় করে বলা যায় না যে—সেইগুলি আর্য-সংস্কৃতির অথবা অনার্য-সংস্কৃতির কিংবা উপজাতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন।

১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসের 'স্প্যান' (*Span*, Vol. XXIV, No. 8) পত্রিকায় ভারতের আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অ্যান্টিকুইটিস বিভাগের ডিরেক্টর এম. সি. যোশী **'Landmark in Harappan Studies'** শিরোনামে এক চিত্তাকর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন :

কালিবঙ্গানে (রাজস্থান) প্রাক্-হারাপ্পীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি আবিষ্কৃত, সনাক্ত ও চিহ্নিত হয়েছে এবং কোন না কোন আকারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হারাপ্পা সভ্যতা-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অবস্থিতিও প্রমাণিত হয়েছে।...

রাজস্থান মরুভূমিতে এ. ঘোষ-এর পূর্বপরিচালিত অনুসন্ধানের সূত্র ধরে রফিক মুঘল কেবলমাত্র ৪০০ ভগ্নস্তূপই (প্রাক্-হারাপ্পীয়, হারাপ্পীয় ও হারাপ্পা-পরবর্তী যুগের) আবিষ্কার করেন নি, ঋগ্বেদে উল্লিখিত অথচ হারিয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীর গতিপথও তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করেছেন। এটাই প্রতিভাত হয়েছে যে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত হারাপ্পা-সভ্যতার পতন ঘটেছে ঋগ্বেদ-খ্যাত এই সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাবার ফলেই। চিতালওয়ালাও তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, যতদিন 'রান অব কচ্ছ' জলপূর্ণ ছিল, হারাপ্পা-সংস্কৃতির বিভিন্ন কেন্দ্রের সমৃদ্ধি ততদিন বজায় ছিল। জল যেমন শুকিয়ে যাচ্ছিল সভ্যতাও তেমনি লোপ পাচ্ছিল। এইসব বক্তব্য থেকে মনে যে প্রশ্নটি জাগে তা হলো : সরস্বতী নদী খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দে যদি শুকোতে শুরু করে থাকে তবে ঋগ্বেদের সরস্বতী নদীর স্তুতি ও সূক্তসমূহ নিশ্চয়ই ঋগ্বেদের রচনাকাল বলে স্বীকৃত ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের বহু আগেই রচিত হয়েছিল। শ্রী যোশী তাঁর উক্ত প্রবন্ধে গ্রেগ পশেল

১. *Pre-History of India* by H. D. Sankalia, p. 99.

(Greg Possehl) কর্তৃক সম্পাদিত *Harappan Civilisation : A Contemporary Perspective* নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। সেই গ্রন্থে বি. কে. থাপার, মসিয়া ফেনট্রস এবং সিরিন রত্নাগর তাঁদের প্রবন্ধগুলিতে নদীভিত্তিক হারাপ্পা-সভ্যতার বিকাশ, ক্ষয় ও লয়প্রাপ্তি খুব সুন্দরভাবেই তুলে ধরেছেন। শ্রী পশেল তাঁর প্রবন্ধে হারাপ্পা-সভ্যতাকে ছয়টি প্রধান মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। যাহোক, প্রবন্ধগুলোর মধ্য থেকে এইটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কতকগুলো বিভিন্ন স্থানীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক মণ্ডলের সমষ্টি মাত্র, খুব সম্ভব তা বাণিজ্য ও লেনদেনের মাধ্যমে একত্রে গ্রথিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল কতকগুলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্থানীয় ও বহিরাগত মানুষের সংস্কৃতিগত সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে। আর তা সমৃদ্ধ হয়েছিল ক্রমবর্ধমান বহির্বাণিজ্য ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে এবং পরিশেষে লয়প্রাপ্ত হয়েছিল নদীর গতিপথ পরিবর্তনে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে—নিশ্চয় বহিঃ-শত্রুর আক্রমণে নয়, অনেক পণ্ডিতই একথা বিশ্বাস করেছেন।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অ্যান্টিকুইটিস-বিভাগের শ্রী যোশীর উপরোক্ত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতেও এই গ্রন্থের হারাপ্পা-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ অনেকটা সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, হারাপ্পা-সংস্কৃতি বহিরাগত নয় ; প্রাক্-হারাপ্পীয় সংস্কৃতির সঙ্গে হারাপ্পা-সংস্কৃতিরও যোগাযোগ ছিল ; একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণ পৃথক নয়। একথাও সত্য, হারাপ্পা-সভ্যতা সর্বত্রই একই প্রকারের ছিল না ; তার উক্ত অবলুপ্তি প্রাকৃতিক কারণেই ঘটেছিল ; বহিরাগত আর্যরা এসে এর ধ্বংসসাধন করেননি। এছাড়া একটি নতুন তথ্যও এই প্রবন্ধে পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা মুঘল দেখিয়েছেন যে, সরস্বতী নদী খ্রীস্ট পূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে শুষ্ক হতে শুরু করেছিল এবং খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ ভাগে অথবা প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম দিকে তা একেবারে শুষ্ক হয়ে যায়। বৈদিক সাহিত্য পাঠেও ঐরূপই অনুমিত হয়। প্রাচীন তাণ্ড বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ঐ নদী যে শুষ্ক হতে আরম্ভ করেছে তার উল্লেখ আছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণসমূহ রচিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ-তৃতীয় সহস্রাব্দে। ঋগ্বেদের সময় সরস্বতী নদীর ছিল ভরা যৌবন। সরস্বতী তখন বিশাল নদী, অতি খরস্রোতা। হারাপ্পা-সভ্যতার কালেও এই নদীর তীরে বহু নগরী গড়ে উঠেছিল। এই নদীর ধারা লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হারাপ্পা-সভ্যতাও লোপ পায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঋগ্বেদ রচনার সমাপ্তি ঘটেছিল হারাপ্পা-

সভ্যতা ক্ষয় পেতে আরম্ভ করার পূর্বেই। অর্থাৎ, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এটা ঘটেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে হারাপ্পা-সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দেই।

সুতরাং স্যার উলে ঋগ্বেদ 'ধ্বংসের মহাকাব্য' এবং 'আর্যগণ হারাপ্পা-সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে' বলে যেসব উক্তি করেছেন, তা সম্পূর্ণ অসত্য বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। ইয়োরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পূর্বেকার অনেক বিচারও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান যুগে একটা বড় রকমের সুবিধা হয়েছে এই যে, কার্বন-১৪ পদ্ধতি অবলম্বনে প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের সময়কাল অনেকটা অভ্রান্তভাবেই আমরা স্থির করতে পারি। এর পূর্বে, অর্থাৎ মার্শাল, ম্যাকে প্রমুখ পণ্ডিতদের কালে, এই সুযোগ প্রায় ছিল না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আর্যরা বহিরাগত—এই তত্ত্বের সপক্ষে আজ পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের কল্পনাপ্রসূত। আর্যগণ একই বংশোদ্ভূত আদিম জাতি, একই ভাষা-ভাষী জাতি কিংবা একই আদিম নিবাস থেকে পৃথিবীর নানা স্থলে ছড়িয়ে পড়ে বসতি বিস্তার করেছে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে যে-যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল তা অসহায় বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই এনসাইক্লো-পিডিয়া ব্রিটানিকা (***Encyclopedia Britannica***) আর্য শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঐ দুটি মতবাদকে আদৌ প্রশ্রয় দেয়নি। আর্য শব্দের ইংরাজী ব্যাখ্যা করা হয়েছে, '**Noble**' বলে, অর্থাৎ ঐ শব্দটি গুণবাচক, জাতি অথবা ভাষাবাচক নয়। আর্য শব্দটি প্রকৃতই ভারতীয় শব্দ। প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে ও অপরাপর গ্রন্থে এ শব্দটি একটি গুণবাচক শব্দরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর্য হলো বর্ণ, জাতি নয়। ভারতের প্রাচীন পুথিপত্রে কোথাও 'আর্য' শব্দটি বিশেষ জাতি বা ভাষাবাচক রূপে ব্যবহৃত হয় নি।

এসব সত্ত্বেও প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে 'আর্য' শব্দের ইয়োরোপীয় ব্যাখ্যাকে আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করেছি। এর কারণ হলো, পশ্চিম থেকে প্রচার করা ভারতীয় জীবন-ব্যাখ্যাকে আমরা এক হতচেতন মুহূর্তে, রাষ্ট্রিক পরাজয় ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মুহূর্তে নির্বিচারে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। আর সেই ব্যাখ্যা আমাদের প্রাচীনতম কালের প্রচারিত আদর্শ থেকে পৃথক হলেও ধীরে ধীরে আমাদের মতো পরাধীন জাতির চিন্তায় ও মননে স্বীকার্য বলে গৃহীত হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বাধীনতালাভের দীর্ঘকাল পরেও সেই ব্যাখ্যা ও ধ্যান-ধারণা আজও প্রবহমান।

ভারতীয় আর্যগণ ও বহির্বিশ্ব

ঋগ্বেদীয় যুগের আর্যগণের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন যোগাযোগ ছিল না, সাগর সম্পর্কে ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, এরূপ কথাই আমরা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের কাছ থেকে শুনে আসছি। অবশ্য সব পণ্ডিতই এ-বিষয়ে একমত নন। অধ্যাপক এ. এ. ম্যাকডোনেল ছিলেন ইংলেণ্ডের এক বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। ঋগ্বেদ সম্পর্কে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসও লিখেছেন। সেই ইতিহাস গ্রন্থের ১৩৩-১৪৪ পৃষ্ঠায় তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

"আর্য অভিযানকারীরা ঋগ্বেদ রচনাকালে বেশিদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। সিন্ধুর উপনদীগুলো পাঞ্জাবে এসে যেখানে মিলিত হয়েছে তার দক্ষিণে অন্তত নয়। সাগর সম্পর্কে তাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, শোনা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, সিন্ধুনদ যেসব মোহানা দিয়ে সাগরে প্রবেশ করেছে, তার কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই। দক্ষিণ সিন্ধুতে মাছ ধরার জন্য যে-ব্যাপক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা উপেক্ষিত হয়েছে, অথচ অন্যান্য পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের উল্লেখ ঋগ্বেদে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। মাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র একবার। পাঞ্জাবের ও পূর্ব কাবুলীস্তানের নদীগুলোতে মাছ খুব কমই পাওয়া যেত, সেজন্যই বোধহয় ঋগ্বেদীয় আর্যগণের এরূপ অজ্ঞতা। অবশ্য যজুর্বেদ যখন রচনা করা হয় তখন মাছ ধরা সম্পর্কে ঋষিদের জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হয়তো আর্যরা তখন আরও দক্ষিণে গিয়ে পৌঁছেছেন। সমুদ্র-র (সম-উদ্র) অর্থ হলো—জলসমাবেশ। ঋগ্বেদে সমুদ্র বলতে সিন্ধুনদের নিম্নভাগকেই শুধু বোঝাত, যেখানে নদী অত্যন্ত প্রশস্ত; নদীর মধ্যস্থলে একটি নৌকা থাকলে তা পার থেকে দেখা যেত না। ঋগ্বেদীয়দের কাছে ঐটিই ছিল সমুদ্র। অথর্ববেদে অবশ্য সাগরের সঠিক উল্লেখ আছে।"...

অধ্যাপক ই. ডবল্যু হপকিনস্‌ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন তাঁর *Religions of India* নামক পুস্তকে। ঋগ্বেদে পূর্ব সাগর ও পশ্চিম সাগর নামে দুটি সাগরের উল্লেখ আছে। তাঁর মতে, সিন্ধুনদের দুই পারের বন্যার জলরাশিকেই ঋষিগণ সাগর রূপে কল্পনা করেছেন।

ম্যাকডোনেল সাহেবের মতে (ইয়োরোপের বহু পণ্ডিতই এই মত পোষণ করেন), ঋগ্বেদেই প্রথমে রচিত হয়, পরবর্তীকালে রচিত হয় সাম ও যজুর্বেদ

এবং সবশেষে রচিত হয়েছে অথর্ববেদ। এরূপ মত বহু ভারতীয়ও মনে মনে পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, ঋগ্বেদ হলো বহু শতাব্দী ধরে বহু ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট বা রচিত মন্ত্রসমূহের সঙ্কলিত গ্রন্থ মাত্র। ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যজ্ঞের প্রয়োজনীয় মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করে ঋক্-সাম-যজুঃ এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে তিনটি পৃথক সংহিতাকারে তা প্রকাশ করেন। অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয় অথর্ববেদ নামে। এই চারটি বেদেই প্রাচীন মন্ত্রসমূহ স্থান পেয়েছে।

বৈদিক যুগে আর্যগণের ধর্মকার্য অনুষ্ঠিত হতো যজ্ঞের মাধ্যমে। প্রতি গৃহে যজ্ঞাগ্নি রক্ষিত হতো এবং যজ্ঞ হতো প্রতিদিন। তদ্ব্যতীত, ছোট বড় অনেক প্রকার যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হতো। নবগ্ব, দশগ্ব (নয়মাস, দশমাসব্যাপী) এমনকি দ্বাদশ বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করা হতো। ঋগ্বেদের ঋক্গুলো হলো প্রধানতঃ যজ্ঞে উচ্চারিত প্রার্থনামন্ত্র। ঋগ্বেদেই যজমান (যিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করান) এবং কোথাও চার ঋত্বিকের (পুরোহিত : ঋ ১০. ৭১. ১১ : ২. ১. ২ প্রভৃতি) আবার কোথাও সাত ঋত্বিকের উল্লেখ আছে (ঋ ১. ৩৬. ৭)। যজ্ঞে যিনি ঋক্মন্ত্রে প্রার্থনা উচ্চারণ করেন তিনি হোতা ; যিনি যজুঃমন্ত্রে আহুতি দেন তিনি অধ্বর্যু ; যিনি সামমন্ত্র গান করেন তিনি উদ্গাতা ; আর যিনি যজ্ঞের সকল কার্য তত্ত্বাবধান করেন তিনি ব্রহ্মা। প্রতি যজ্ঞে তিন বেদেরই প্রয়োজন হয়। ঋগ্বেদে বহুবার অধ্বর্যু-র উল্লেখ (২. ১. ২ ; ১. ৯৪. ৬ ; ১. ৭৬. ৭ ; ৮. ৪. ১১ ; প্রভৃতি) রয়েছে। হোতা (ঋ ১. ৩০. ৭ ; ৮. ১২. ৩৩ ; ৮. ১০২. ১০ প্রভৃতি) ও উদ্গাতা (ঋ ৮. ১. ৭ গায়ত্রী ; ১০. ৭৮. ৫ প্রভৃতির)-র উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদের ১০. ৯০ সূক্তে ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদেরই উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং একটি বেদ-সংহিতা অগ্রে, অন্যটি পরে প্রণীত হয়েছে—এরূপ বলা অসমীচীন। তিন বেদেরই রয়েছে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তবে, ঋগ্বেদের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার্য।

যাহোক, ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের সমুদ্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, একথা কি সত্য বলে গ্রহণ করা যায় ? সমগ্র ঋগ্বেদ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অসংখ্য সূক্তেই নানাভাবে সমুদ্রের উল্লেখ আছে। সমুদ্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ এবং গভীর-ভাবে জ্ঞান না থাকলে এভাবে লেখা সম্ভবপর হতো না। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাত্র ঋক নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

"উষার পূর্বগামী অশ্বিদ্বয়, সাগর-সন্তান" (ঋ ১. ৪৬. ২)। "সমুদ্র হতে তোমাদের রথ দ্যুলোকের চতুর্দিকে বিস্তৃতভাবে গমন করছে" (ঋ ৪. ৫৩. ৫)।

"সিন্ধুগণ (নদী সকল) যেমন সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমগ্র মানব-প্রজাগণ ইন্দ্রের ক্রোধের ভয়ে তাঁকে সেভাবে প্রণাম করে।" সমুদ্রায়েব সিন্ধবাঃ (ঋ ৮.৬.৪)।

"যেমন মহতী সপ্তনদী সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয় (ঋ ১. ৭১. ৭)।

"নদীসমূহ বারিদ্বারা একটিমাত্র সমুদ্রকেও পূরণ করতে পারে না (ঋ ৫. ৮৫. ৬)।

"সিন্ধু সকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেরকম সোম সকল তোমাতে প্রবেশ করুক" (ঋ ৮. ৮২. ২২)।

ঋগ্বেদে পণি নামক এক মনুষ্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এই সম্প্রদায় ছিল ধনশালী এবং বাণিজ্যে লিপ্ত। এরা প্রভাবশালী না হলে তাদের এত উল্লেখ থাকত না। এই পণি শব্দ থেকেই, পণিক, বণিক, পণ্য, বিপণি প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ঋগ্বেদে বণিক শব্দেরও উল্লেখ রয়েছে (১. ১১২. ১১ ; ৫. ৪৫. ৬ প্রভৃতি)। সেই সময়ে যে সামুদ্রিক বাণিজ্য চালু ছিল তার পরিচয়ও নিম্নলিখিত ঋকগুলোতে পাওয়া যায় :

ঋ ১. ৪৮. ৩ : ধনলুব্ধ ব্যক্তি যেমন সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে।

ঋ ১. ৫৬. ২ : ধনার্থী বণিকেরা সমুদ্র ব্যাপিয়া সকলদিক সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকদের জাহাজ সংখ্যা অগণিত।

ঋ ৪. ৫৫. ৬ : যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সমুদ্রপথে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে। ঋগ্বেদে সাগর পাড়ি দেবার জন্য জাহাজকেও নৌকা বলা হয়েছে। যে-নৌকা শত দাঁড় যুক্ত (ঋ ১. ১১৬. ৫), পক্ষ যুক্ত (পাল তোলা, ঋ ১০. ১৪৩. ৫ ও ১. ১৮২. ৫ সমুদ্রগামী জাহাজ অর্ণব উল্লেখও ঋগ্বেদে আছে (১. ৫১. ৫ : ইন্দ্র ধনের অর্ণব)।

ঋ ৮. ৪০. ৫ : সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্ণব। সাগরে যে দ্বীপ থাকে (ঋ ১. ১৬৯. ৩ ও ১০. ১০. ১), বাড়বানল উত্থিত হয় (৩. ৩০. ১৯ ও ১. ৯৫. ৩), সাগরতলে যে ধনরত্ন থাকে (ঋ ৯. ৯৭. ৪৪ ; ১. ৪৭. ৬), সমুদ্র হতে ধন আহরণ করে দাও ; এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের ন্যায় ধনের আধার স্বরূপ (১০. ৫. ১)—এইসব জ্ঞানও ঋষিদের ছিল।

ঋ ১. ২৫. ৭ : যিনি অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা সমূহের পথ জানেন—"বেদা নাব-সমুদ্রিয়ঃ"। সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট পথ থাকে।

ঋ ৮. ৭৫. ৯ : সমুদ্র-তরঙ্গ যেরূপ নৌকাকে বাধা প্রদান করে।

ঋ ১. ১১৬. ২, ঋ ১. ১৮২. ৫-৭, ঋ ১০. ১৪৩. ৫ : দ্বীপান্তরে দস্যুদের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হয়ে, রাজর্ষী তুগ্র নিজপুত্র রাজকুমার ভুজ্যুকে সৈন্যসহ শত দাঁড় পক্ষযুক্ত নৌকায় প্রেরণ করেন। পথে ও সাগরে সেই নৌকা ভেঙ্গে যায়। দেবতা

অশ্বিদ্বয় ভূজ্যুকে সসৈন্যে আপনার পোতে আশ্রয় দিয়ে তিনদিন তিন রাত্রি পরে পৌঁছে দেন। সমুদ্র যে অতল-অপার ও অবলম্বনহীন সেই উল্লেখও রয়েছে।

ঋ ৭. ৩৩. ৮ : সমুদ্রসেব্য মহিমা গভীর : (বশিষ্ঠগণের) মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর। সাগরের গাম্ভীর্যের সঙ্গে তুলনা।

ঋ ৭. ৮৮. ৩ : "যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করেছিলাম, সমুদ্র মধ্যে নৌকা সুন্দর রূপে প্রেরণ করেছিলাম; জলের উপর গমনশীল নৌকায় ছিলাম তখন শোভার্থে নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করেছিলাম।" একথা বলেছেন বশিষ্ঠ ঋষি। ঋষিরাও সমুদ্র-যাত্রা করতেন (ঐ, ৪ ও ৫ ঋক দ্রষ্টব্য)।

ঋ ৬. ২০. ১২ : তুর্বশ ও যদু রাজা কোনো প্রয়োজনে সাগর ডিঙ্গিয়ে কোথাও গিয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁদের সাগর পার করে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

ঋ ১. ৫৫. ২ : সমুদ্রের সঙ্গে অন্তরীক্ষের তুলনা করা হয়েছে। বহু নদী থেকে সাগর যেরূপ জল গ্রহণ করে, অন্তরীক্ষব্যাপী ইন্দ্র স্বীয় বিস্তীর্ণতা দ্বারা সেরূপ বহুব্যাপী জল গ্রহণ করেন।

ঋ ১০. ৯৮. ১২ : প্রকাণ্ড আকাশে যে সমুদ্র বিদ্যমান আছে তথা হতে অপরিসীম জল এনে দাও।

বৈদিক যুগে মৎস্যও অপরিচিত ছিল না। একটা সম্পূর্ণ সূক্তই (ঋ ৮. ৬৭) হচ্ছে জাল দিয়ে ধরা মৎস্যকুলের স্তুতি। যদিও সূক্তটি একটি প্রতীক, তা হলেও ঋষিরা যে জাল দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপার জানতেন, সেটি সুস্পষ্ট। ঋ ১০. ৬৮. ৮-তে মাছের উল্লেখ আছে। যেমন, মৎস্যরা অল্প জলে থাকলে ক্লেশ পায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সব বৈদেশিক পণ্ডিতই ম্যাকডোনেল সাহেবের অভিমত সমর্থন করতেন না, এর ব্যতিক্রমও ছিল। অধ্যাপক উইলসন সাহেব বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি ইংরেজীতে ঋগ্বেদ অনুবাদ করেছেন। অধ্যাপক উইলসন তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের মুখবন্ধে (পৃ. XIII, 1860 AD) লিখেছেন : তাঁরা (বৈদিক আর্যগণ) সমুদ্রযাত্রায় অভিজ্ঞ ও বাণিজ্যে লিপ্ত মানবসম্প্রদায় ছিলেন। "...সূক্তগুলো কেবলমাত্র পরিদৃশ্যমান সাগর সম্পর্কে চেতনাসম্পন্ন ছিল না, সাগরগামী বণিকদের কথাও জ্ঞাত ছিল। সাগরের অপর পারের দ্বীপে বা মহাদেশে নৌ-অভিযানে যাওয়া, সাগরের মধ্যে নৌকাডুবি ও হতমান হবার উপাখ্যানও আর্যগণের জানা ছিল।" উইলসন সাহেবের ইংরেজী ঋগ্বেদ আর ক'জন পড়ে? ম্যাকডোনেল সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসই

অধিকতর জনপ্রিয়। ভারতে অবস্থিত ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সম্ভবতঃ ম্যাক-ডোনেল সাহেবের গ্রন্থ পড়েই ঋগ্বেদ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান আহরণ করেছেন। উক্ত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ১৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে—ঋগ্বেদের সময়ে হাতি সপ্তসিন্ধুর প্রচলিত পশু নয়, দুই বার মাত্র এর উল্লেখ রয়েছে। স্যার জন মার্শাল এটারই পুনরুক্তি করেছেন। ঘোড়া সম্পর্কেও ম্যাকডোনেল সাহেব ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, প্রাচীন আর্যগণ রথ টানার ব্যাপার ব্যতীত অশ্বের অন্য কোন ব্যবহার জানত না। হস্তী সম্পর্কে মার্শাল সাহেবের বক্তব্যের উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অশ্বপৃষ্ঠে মানুষ যে আরোহণ করত, যুদ্ধ করত, তার উল্লেখ ঋ ৮. ৫. ৭, ৮. ৬. ৩৬, ৬. ৪৭. ৩১, ৪. ৪২. ৫, ১. ২৭. ২, ১০.৯১.৯ প্রভৃতি ঋকে আছে। ১০. ১৬৬. ১ ঋকে ঘোড় দৌড়ের মাঠ "অজি"-র এবং ১০. ১০১. ৭ ঋকে অশ্বের কৃষিকার্যে লাঙল টানার উল্লেখ রয়েছে।

সিন্ধু নদ যে বদ্বীপের সৃষ্টি করে বিভিন্ন মোহানা দিয়ে সাগরে প্রবেশ করেছে, ঋগ্বেদের ঋষিগণের সেটি অজানা ছিল। এতদূর পর্যন্ত তাঁরা পৌঁছাতে পারেননি, ম্যাকডোনেল সাহেব এ কথাই লিখে গেছেন। এমনও তো হতে পারে, বর্তমানে যে-অঞ্চল জুড়ে সিন্ধু নদের মোহানাগুলি অবস্থিত, সেই বদ্বীপ অঞ্চল সেকালে সাগরগর্ভে ছিল! বস্তুতঃ সেকালে সাগর ছিল অনেকটা উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত। ক্রমে ক্রমে সাগর দক্ষিণে সরে যাওয়ায় এরূপ বদ্বীপ সমূহের দ্বারা এত মোহানার সৃষ্টি হয়েছে। হারাপ্পা-সভ্যতার যুগেও সাগর ছিল সুদূর উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত। মাহেঞ্জোদারো ছিল সিন্ধু নদের উপর সাগর-বন্দর। বর্তমানে দেখা যায়, সাগর থেকে এটা উত্তরে নয়। নদীর গতিও পরিবর্তিত হয়েছে।

যাহোক, পণিগণ ছিল বাণিজ্যে লিপ্ত বণিক সম্প্রদায়। এর উল্লেখ ঋগ্বেদে অসংখ্যবার আছে। এই সম্প্রদায় প্রচুর ধনশালী ও সমাজে এদের প্রতিষ্ঠা ছিল কিন্তু এরা ছিল অতিশয় কৃপণ স্বভাবের মানুষ। এরা দান-ধ্যান করত না, যজ্ঞেও মতি ছিল না, এজন্য ঋগ্বেদের ঋষিগণ এদের দাস বা দস্যু আখ্যা দিয়েছিলেন। যজুঃ ও অথর্ববেদেও এদের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের একটি সম্পূর্ণ সূক্তে (অ ৩. ৩. ৫) বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে বণিকদের ইন্দ্রযজ্ঞ করার উল্লেখ আছে। ক্রয়-বিক্রয়, লাভ-বিনিময়, মূলধন প্রভৃতি অনেক কিছুরই উল্লেখ আছে। প্রচুর অর্থ নিয়ে এরা দেশে ফিরে আসত। শকধূমগণ (অ ৬. ১৩. ২) আবহমণ্ডলের পূর্বাভাষ জানত এবং বাণিজ্যযাত্রার শুভদিন স্থির করে দিত। অথর্ববেদের এই সূক্তগুলো যে ঋগ্বেদের সব সূক্ত রচনার পরবর্তী, তার কোন

প্রমাণ নেই। চার বেদ-সংহিতা একই যুগের সৃষ্টি। পৈঙ্গরাজ ছিল সেই যুগে সমুদ্রতরঙ্গে বিচরণকারী পাখি (যজুঃ ৫. ৫. ১০), আর কুষিতক ছিল সাগরের কাক।

বৈদিক যুগেই সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল, তা না হলে বাণিজ্য তরীগুলি সাগর ছেয়ে থাকত না। রাজপুতানা সাগর সেকালে সপ্তসিন্ধুর লাগোয়া ও দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই সাগর দিয়েই প্রচুর বাণিজ্য-নৌকা চারদিকে যাতায়াত করত, এটা অনুমান করা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭. ২. ১). পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (১৪. ৫. ১৭) প্রভৃতিতেও সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ রয়েছে। গুজরাট ছিল সেকালে একটা দ্বীপ। দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূল ছিল সমুদ্র-বাণিজ্যের পক্ষে প্রশস্ত। ঐ উপকূল ছিল সেগুন, চন্দন, ধুপ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষসমূহের ভাণ্ডার। সমুদ্রগামী নৌকা নির্মাণের জন্য উপযুক্ত কাষ্ঠ ঐখানেই প্রচুর পাওয়া যেত। পণিরা যে ঐ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করবে, এটি ছিল তাই স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে উল্লেখ আছে—সপ্তসিন্ধুর কোন কোন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের দক্ষিণ ভারতে প্রস্থানের কথা। যথা, কশ্যপ ঋষির আজ্ঞায় ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা বিখ্যাত জমদগ্নি ঋষিপুত্র পরশুরাম অনর্ত (বর্তমান গুজরাট) ছেড়ে শিষ্যবর্গসহ পশ্চিম উপকূলের কেরলে গিয়ে আশ্রম রচনা করেছিলেন। ঋগ্বেদের অপর সূক্ত-রচয়িতা বিখ্যাত ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে তাঁর পঞ্চাশ জন পুত্র (অথবা শিষ্য) দক্ষিণ দেশে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদেরই বংশধরগণ হলেন দাক্ষিণাত্যের পুলিন্দ (অন্ধ্র), শবর, পুণ্ড্র প্রভৃতি গোষ্ঠী। ঋগ্বেদের অপর বিশিষ্ট সূক্ত-রচয়িতা অগস্ত্য ঋষি বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে গিয়ে আশ্রম রচনা করেছিলেন। তুর্বশ বংশের রাজা মরুত্ত, তাঁর দত্তক পুত্র দুষ্মন্ত এবং তৎপুত্র ভরত—এই তিনজনই হলেন বৈদিক সাহিত্যের বিখ্যাত রাজা। দুষ্মন্তেরই এক পৌত্র জনাপীড় ও তাঁর চার পুত্র দক্ষিণে প্রস্থান করে পাণ্ড্য, কুল্য, চোল ও কেরল রাজ্য স্থাপন করেন। বাল্মিকী রামায়ণে আছে—অযোধ্যার যুবরাজ রামচন্দ্র দক্ষিণাপথে গিয়ে লঙ্কা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে রাবণকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতে আর্য-সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন। বাল্মিকীর বর্ণনায় দক্ষিণাপথের ঋগ্বেদীয় ঋষি অগস্ত্য থেকে শুরু করে কয়েকজন বিখ্যাত মুনি-ঋষির আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাল্মিকী রামচন্দ্রের যে বংশের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে মনে হয়, তিনি ঋগ্বেদীয় যুগের রাজা

ছিলেন। অসুর রাম-এর উল্লেখ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ঋগ্বেদের রাম আর রামায়ণের রাম একই ব্যক্তি।

হরি বংশে (২৪ অধ্যায়) উল্লেখ আছে: বশিষ্ঠ ঋষির আদেশে রাজা সগর কতকগুলো ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীকে, যথা—শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোলি, সর্প, মহীশক, দর্ধ, চোল এবং কেরলকে বেদ পাঠের ও যজ্ঞ করার অধিকারচ্যুত করেছিলেন এবং দেশ থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত চারটি গোষ্ঠী দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কোন কোন বিখ্যাত ইয়োরোপীয় গবেষক রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তী কালের বলে মনে করেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোন কোন ভারতীয় লেখকও এ ধরনের প্রচার শুরু করেছেন। স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতীয় কবিরা একবাক্যে বাল্মিকী মুনিকে ভারতের আদি কবি বলে বন্দনা করে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাল্মিকী হলেন মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবেরও পূর্ববর্তী।

উপরে যেসব ঋষি ও রাজগণের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা সকলেই ছিলেন ঋগ্বেদীয় যুগের মধ্যবর্তীকালীন মানুষ, শেষ যুগের নয়। ঋগ্বেদে দক্ষিণাপথের উল্লেখ নেই বলে ঐ অঞ্চল তৎকালীন আর্যগণের অপরিচিত ছিল, একথা মনে করা ভুল। ঋগ্বেদ ইতিহাস নয়, যজ্ঞের মন্ত্রসমষ্টির সঙ্কলন গ্রন্থ মাত্র, একথা অনেকেই ভুলে যান। ঋগ্বেদে আর্যাবর্তের মধ্য পূর্বভাগের কোন উল্লেখ নেই, কোন নগরেরও নাম নেই। এছাড়া ঋগ্বেদে অযোধ্যা, কাশী, কান্যকুব্জ, বিদেহ, মগধ কিংবা পাঞ্চাল দেশের কোন উল্লেখ নেই বলে কি সেসব অঞ্চলে আর্যবসতি ছিল না? ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা প্রতর্দন ছিলেন কাশীর রাজা। জহ্নু, কুশিক, গাথি প্রমুখ ঋগ্বেদীয় ঋষি ও রাজগণ কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। ঋগ্বেদে উল্লিখিত নামিসাপ্য, গোতম রাহুগণ, দেবরাত, বীতিহব্য প্রভৃতি ছিলেন বিদেহ রাজা কিংবা ঋষি। যজুর্বেদে অঙ্গ ও মগধ রাজ্যের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে 'পঞ্চদিশ'-এর উল্লেখ আছে, এর মধ্যে দক্ষিণাদেশ অন্যতম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও দক্ষিণাদিশ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা কুরুশ্রবণ, তৎপুত্র রাজা জহ্নু এবং তৎপুত্র সুরথের নাম ঋগ্বেদে আছে। এ বংশেরই পঞ্চম পুরুষ মগধ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ঋগ্বেদে উল্লিখিত রাজা শান্তনু এই কুরুবংশেরই পঞ্চদশ পুরুষ। ঋগ্বেদের বিখ্যাত রাজা সুদাস ছিলেন পাঞ্চালের রাজা। বৈবস্বত মনুপুত্র শর্যাত অনর্ত দেশে (গুজরাট) গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ঋগ্বেদে অসংখ্য রাজার, সম্রাটের ও রাজচক্রবর্তীর নামোল্লেখ আছে, কিন্তু কোথাও তাঁদের রাজত্ব বা রাজধানীর উল্লেখ নেই। এ সবের সন্ধান পেতে হলে পরবর্তী ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, পুরাণ ও

সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে খোঁজ করতে হবে।

বৈদিক যুগেই মোটামুটি সমগ্র ভারতে (দাক্ষিণাত্য সহ) আর্যদের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। মনুসংহিতায় (১০/৪৩-৪৪) ক্ষত্রিয় রূপে দ্রাবিড়গণের উল্লেখ রয়েছে। এই ক্ষত্রিয়গণ ব্রিষাল, অর্থাৎ পতিত ছিলেন। স্থানীয় প্রাকৃত ভাষা ও আর্যদের সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে দক্ষিণা-দিশ-এ নানা ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। হারাপ্পা-সভ্যতা কালে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল, এরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দক্ষিণ অঞ্চল থেকেই উৎকৃষ্ট সোনা, মূল্যবান প্রস্তর, মণিমুক্তা, শঙ্খ প্রভৃতি আমদানী করা হতো। এইসব দ্রব্যের নিদর্শন ঐ সভ্যতার ধ্বংসস্তূপগুলিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের সাগর থেকে প্রাপ্ত শঙ্খ ঋগ্বেদের যুগে মুখবাদ্য রূপে ব্যবহৃত হতো (ঋ ১.১৮০.৮)।

বৈদিক যুগে যে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রচলিত ছিল তাঁর পরিচয় পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে পাওয়া যায়। ঐ সব ধ্বংসাবশেষের তলদেশে ৩০০০-২০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

সপ্তসিন্ধুতে তথা ভারতে আর্য-সভ্যতা যখন সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত তখন পশ্চিম এশিয়ায়, সুমের, ব্যাবিলোন এবং উত্তর আফ্রিকার মিসরে আরও দুটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সিন্ধুনদ, ইউফ্রেটিস-তাইগ্রিস ও নীল—এই তিনটি নদী-উপত্যকায় বিকশিত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতম, সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মতভেদ রয়েছে। প্রথমটি ব্যতীত, অপর দুটি যে বহিরাগত ছিল, সে কথা তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী ও কিম্বদন্তীতেই প্রকাশ। প্রথমটির বিকাশ ও প্রসার আজও ভারতের সর্বত্র দীপ্যমান, কিন্তু অপর দুটি খ্রীস্ট জন্মের পূর্বেই লোপ পেয়েছে। প্রথমটিও বহিরাগত ছিল, এই মতবাদ প্রচারে ইয়ারোপীয় পণ্ডিতগণ যদিও সচেষ্ট তবু এর সমর্থনে সিন্ধু-সরস্বতী তীরে কিংবা ভারতের অন্যত্র কোন কিম্বদন্তী বা পৌরাণিক আখ্যান খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভারত ও ইরানের সঙ্গে ইয়োরোপের বিশিষ্ট ভাষাগুলোর যে ঐক্য দেখতে পাওয়া যায় তার মূল অনুসন্ধান করতে হলে উপরোক্ত তিনটি সভ্যতা ছাড়াও ফিনিসীয়, ক্রিজীয়, আসিরীয়, গ্রীক প্রভৃতি সভ্যতারও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বাণিজ্য-ব্যপদেশে এইসব সভ্যতার সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল, এরও প্রমাণ বিদ্যমান।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে হারাপ্পা-সভ্যতার

যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে পালতোলা জাহাজের কতকগুলো ক্ষোদিত চিত্র ছিল। ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ই. ম্যাকে এর থেকে অনুমান করে-ছিলেন যে, সিন্ধু-উপত্যকায় অবস্থিত নগরগুলোর অধিবাসীরা খুব ব্যাপক-ভাবেই সমুদ্রপথে সুমের দেশে যাতায়াত করত। যারা যাতায়াত করত, তাদের পরিচয় ম্যাকে সাহেব দেন নি। তারা যে সপ্তসিন্ধুর অধিবাসী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় গুজরাটের উপকূলে 'লোথাল' নামক একটি প্রাচীন সমুদ্র-বন্দরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায়। এই শহরের পূর্বদিকে প্রত্নবিজ্ঞানীরা চতুষ্কোণ আকারের একটি ইট-বাঁধানো জাহাজের কারখানা উদ্ধার করেছেন। একটি বিশেষ খালসহ এই জাহাজ-কারখানার চত্বরটির আয়তন ছিল ২ ৮×৩৭ মিটার। লোথাল শহরের গঠন-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে মাহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পা শহরের অনুরূপ এবং এর বয়স কোনক্রমেই তাদের চাইতে কম নয়. সুমেরীয় ক্ষোদিত লিপিগুলোতে (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০-২০৫০), প্রায়ই মাগান ও মেলুক-খা নামক দুটি সমুদ্র বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখান থেকে আসত নানাপ্রকারের মূল্যবান কাষ্ঠ, স্বর্ণচূর্ণ, মুক্তা, নীলকান্ত মণি, হস্তীদন্ত প্রভৃতি। এইসব রপ্তানী-সম্পদ সম্পূর্ণ ভারতীয় বলেই প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থির করেছেন। এই দুটো বন্দরের অস্তিত্ব আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ সমুদ্রই গ্রাস করেছে তা। বন্দর দুটো থেকে শুধু সুমের নয়, মিসর ও আরবেও জাহাজ চলাচল করত, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ দুটো বন্দর থেকে 'মাগুলিম' নামক যে বিশাল জাহাজগুলো যেত—সুমেরীয় গ্রন্থে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। ভারতীয় 'মানজি' জাহাজই হয়তো ছিল সুমেরীয় মাগুলিম। মাপান বন্দর থেকেই হয়তো সমুদ্র উপকূলের বর্তমান নাম মাকরাণ হয়েছে।

সুমের-এর প্রাচীন উব নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি পাহাড়ের আমাজান পাথরের তৈরি পুঁতি ও গুটিকা পাওয়া গেছে। প্রাচীন মিসরে পাওয়া গেছে দাক্ষিণাত্যের সবুজ ফেলস্পার। গ্রীকদেশের প্রাচীন মাই-সেনি নামক স্থানটি খনন করে সোনার পাতলা পাত-এর ডিম্বাকৃতি যেরূপ মুকুট পাওয়া গেছে, দাক্ষিণাত্যের আদিচান্নুর-এর প্রাচীন সমাধি খুঁড়েও অনুরূপ মুকুট আবিষ্কৃত হয়েছে। মাদুরার এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমাধিক্ষেত্রে সোনার মুকুট রাখার প্রথা এই কালেও চালু আছে। প্রাচীন মিসরের সপ্তম রাজবংশে সোনার যে কণ্ঠহার ও মালা ব্যবহৃত হতো, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন তা সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারত থেকেই মিসরে যেত। ৩১০০ খ্রীস্ট পূর্বের সুমেরীয় কিশ নগরীর ধ্বংসাবশেষ ও পারস্যের সুসা নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকেও দক্ষিণ ভারতের

নানাবিধ রপ্তানি দ্রব্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ভারতীয় আর্য-সভ্যতার সঙ্গে সুমের, ব্যাবিলোন, মিসর, ফিনিসিয়া প্রভৃতির যোগাযোগ স্থাপনে প্রথমে মালাবার উপকূল, পরে করোমণ্ডল উপকূল বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। বাণিজ্যে সপ্তসিন্ধুর পণিগণ (বণিক সম্প্রদায়) নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, এরূপ মনে করারও সঙ্গত কারণ রয়েছে। পণিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আর্য-সভ্যতায় দীক্ষিত দক্ষিণ ভারতের চোল ও পাণ্ড্যগণ। বৈদিক যুগের অবসানে রাজপুতানা সাগর যখন শুকিয়ে যায়, পণিগণ তখন গুজরাট ও মালাবার উপকূলেই স্থাপন করেছিল তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মালাবার উপকূলে জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত কাষ্ঠের প্রাচুর্য ছিল, আবার নানাদেশে ঐ কাঠসহ সুগন্ধী চন্দনকাঠ, ধূপ-ধূনা প্রভৃতি রপ্তানী করা হতো।

ক্রীট দ্বীপের নসস্ ও ভূমধ্য সাগরতীরের ট্রয়, পারস্য উপসাগর তীরের সুসা, ব্যাবিলোন, সুমেরীয় কিশ, উর, টেল আসমের, বেহেরিন প্রভৃতি খনন করে প্রাচীন ভারতের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। মালদ্বীপ ও লখাতরা হয়ে একদিকে লোহিত সাগর দিয়ে মিসর অভিমুখে, অপরদিকে বেহেরীন হয়ে সুমের-এর দিকে প্রসারিত ছিল প্রাচীন সমুদ্র-বাণিজ্যের পথ। মালদ্বীপ এবং সুমের-এর মধ্যেও যোগাযোগ ছিল।

মালদ্বীপ

ত্রিবান্দ্রাম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় একহাজার কিলোমিটার দূরে ভারত মহাসাগরের বুকে মালদ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। জনসংখ্যা প্রায় একলক্ষ, দ্বীপ সংখ্যা ৭৫০টি। অতি সাম্প্রতিককালে এর কোন কোন দ্বীপে নানাদেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদরা খননকার্য চালিয়ে সিন্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক কালের এক অপূর্ব সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক থোর হেইয়ার ডাহাল প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বিস্তৃত বাণিজ্যের নৌপথটি পুনরুদ্ধারের জন্য এবং প্রাচীন বন্দরগুলি চিহ্নিত করার জন্য ১৯৭৭-৭৮ সালে একদল সহকর্মীসহ ঐ দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা সাগরের বুকে একটি ভাসমান প্রবালদ্বীপে কালোপাথরের এক অপূর্ব সূর্য মন্দির ও মূর্তি আবিষ্কার করেন; এর গায়ে ছিল পাথরে খোদাই করা সূর্যদেবের বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও মুদ্রা; ১২-১৫ মিটার প্রবাল পাথরে নির্মিত ত্রিভূজাকৃতি সেই মন্দিরটি ছিল অনেকটা মিসরের পিরামিড-এর মত। মেসোপটেমিয়াতেও এ ধরনের উপাসনালয় ছিল। এই দ্বীপপুঞ্জে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং বুদ্ধদেবের মূর্তিও পাওয়া গেছে। বহু দ্বীপেই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন মিসরীয়, রোমান ও গ্রীক মুদ্রা।

যেসব প্রাচীন শিলালিপি মালদ্বীপের শিক্ষা ও পুরাকীর্তি বিভাগ আবিষ্কার করেছেন, সেগুলি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার অক্ষরমালা চিত্রময় এবং হারাপ্পা-সভ্যতার সমগোত্রীয়। এর পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভবপর হয়নি। রাজধানী মাল-এর জাতীয় সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে একটি কোরাল প্রস্তর শিলা, যার গায়ে হিরোগ্লিফিক (Hyroglyphic) লিপি খোদিত আছে। এরও পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। হারাপ্পা-সভ্যতার সমগোত্রীয় অনেক মূর্তি, যেমন—দীর্ঘ কর্ণযুক্ত পুরুষ, মা কালীর মত দীর্ঘ জিহ্বাযুক্ত নারী মুখ, দাঁত বের করা হাস্য-মুখর, বাবরি চুল, কানে বড় বড় দুল পরা আদিবাসীদের মত পুরুষ মূর্তিও পাওয়া গেছে। মাল রাজধানীতেই মাটির তলদেশে পাওয়া গেছে—একই মূর্তির মধ্যে তিন দেবতা এবং চার মুখযুক্ত মূর্তি।

১৯৬২ সালে এক গ্রামবাসী পূর্ব মাল উপকূলে নারকেল গাছ রোপণকালে পেয়েছিলেন—অজানা ভাষায় লেখা লিপি, মূর্তি, কারুকার্য খচিত পাথর, ব্যব-হারযোগ্য থালা-গেলাস-কলস এবং স্বর্ণ আর রৌপ্য অলঙ্কার। হাদাদ হুমাতি স্থানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের বিষ্ণু ও বুদ্ধমূর্তি এবং আরি থো ডু দ্বীপে প্রাপ্ত বিশাল বুদ্ধ মূর্তির নির্মাতা-শিল্পীরা কি ভারতীয় ছিলেন? সূর্যদেবই এখনকার সবচেয়ে প্রিয় উপাস্য দেবতা ছিলেন, যা এই দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীনত্ব সূচীত করে। বিশ্বের প্রাচীনতম সূর্য মন্দিরটি—আঞ্জিধা বা ফেরোলুন আবিষ্কৃত হয়েছে মাল দ্বীপ-পুঞ্জেরই হুভাযু অঞ্চলে। দক্ষিণ ভারতের লোকগাথায় আছে সমুদ্রদেবের বাসভূমি ছিল মালদ্বীপে। আজও মালদ্বীপের সুন্দরী তরুণীরা জাতীয় উৎসবে নাচ-গানের মাধ্যমে পূর্বদিকে মুখ রেখে আঞ্জিধা (প্রাচীন দিভেহী ভাষায় এর অর্থ সূর্য) বর্ণনা করে। এই দ্বীপপুঞ্জ ছিল বহুযুগব্যাপী আফ্রিকা ও এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বা-ঞ্চলের সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক লেনদেন ও যোগাযোগের পথ, তথা সমুদ্র-বণিকদের স্বর্গরাজ্য।

স্মরণাতীতকালে, পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগরের উত্তরে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের তীরভূমিতে এক মানবগোষ্ঠী বাস করত। ঐ নদীদ্বয় প্রবাহিত অঞ্চলের নিম্নভাগকে বলা হতো সুমেরিয়া বা সুমের এবং উত্তরভাগকে বলা হতো—আক্কাদ। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল, এই সুমেরীয় সভ্যতা

সুমের

সিন্ধু-সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ সিন্ধু-সভ্যতার জন্মদাতা। পরবর্তীকালে এই ধারণায় ঘোরতর সন্দেহ দেখা দেয়। কারণ, দেখা গেল যে—প্রাচীনতায়, ব্যাপ্তিতে এবং উৎকর্ষতায় সিন্ধু তথা হারাপ্পা-সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতার চেয়ে অগ্রবর্তী। এই সুমের ও আক্কাদ

দেশে বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার মধ্যে পাওয়া গেছে সে দেশের প্রাচীন লিপির নিদর্শন। সুমেরীয় প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখিত হয়েছে যে, এখানকার মানবগোষ্ঠী ঐ দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী নয়; পূর্বদেশ থেকে আসার সময়ে তারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা-অক্ষরমালা এবং কৃষিবিদ্যা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এই নবাগতরা সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত; তারা গৃহ নির্মাণবিদ্যা ও নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল; তাদের নিজস্ব ধর্ম ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্য দিয়ে এ ধারণার সমর্থন পাওয়া গেছে। এই নতুন মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল বহু নগর, যথা: উর, এরিদু উরুকু, শিরপুরলা (টেল্লো, লাগাস), সিরুপ্পক (ফারা), কিসুরা, আদব, ইড়েক প্রভৃতি। প্রাচীন নগরগুলোর মধ্যে সব চাইতে দক্ষিণে ছিল এরিদু শহর। এইটিই ছিল সুমের-এর প্রাচীন বন্দর। এই নগর থেকেই ইউফ্রেটিস্ ও তাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে।

ওদেশের প্রাচীন উপকথায় বলা হয়েছে: ওয়ান্নেস নামক একজনের নেতৃত্বে অর্ধমনুষ্য অর্ধমৎস্য একটি জাতি, জাহাজে চেপে পারস্য উপসাগর পার হয়ে এরিদু শহরে এসে পৌঁছায় এবং তারপর থেকেই তাদের শহরে সভ্যতার আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান বাগদাদ শহর থেকে ইউফ্রেটিস নদী ধরে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত যাবার ঠিক মধ্যপথে, নদীতীরে অবস্থিত প্রাচীন উর শহর ছিল সুমের-এর রাজধানী। এই নগরের ধ্বংসাবশেষের সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া গেছে আদিম অধিবাসীদের হাতে তৈরি কৌলাল এবং প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ। এর উপরের স্তরেই কিন্তু এক বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান, অর্থাৎ সেখানে পাওয়া গেছে বহিরাগত সভ্যতার নিদর্শনসমূহ। এ নগরেই মিলেছে নতুন সুমেরীয় সভ্যতার পোড়া ইটের বহু ছোট ছোট বাড়ি। প্রত্নবিজ্ঞানী স্যার জন মার্শাল-এর মতে, এই বাড়িগুলোর সঙ্গে মাহেঞ্জোদারো শহরে পরবর্তীকালে কিছুটা অবহেলার সঙ্গে নির্মিত ছোট ছোট বাড়িগুলোর এত বেশি মিল ছিল যে তা চোখে পড়ার মত। উর শহরের এক সমাধিক্ষেত্রের ভূগর্ভ থেকে প্রত্নবিদরা একটি উপবিষ্ট বানরের ছোট মূর্তি উদ্ধার করেছেন, এর সঙ্গে মাহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত বানর-মূর্তিগুলোর খুব বেশি রকম সাদৃশ্য রয়েছে। এই মূর্তিগুলো সম্ভবতঃ হনুমান হিসাবে পূজিত দেবতার আদিরূপ। প্রাচীন সভ্যজগতের কাছে বানর ছিল প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয় প্রাণী হিসাবে পরিচিত। বানর যদি পবিত্র প্রাণী হিসাবে পরিগণিত না হতো তাহলে ভাস্কর্যকর্মে বানরের মূর্তি শোভা পেত কিনা সন্দেহ। সুমেরে প্রাপ্ত সীলগুলোতে খোদাই করা এই আদি হনুমান ও অন্যান্য জীবজন্তুরা হলো

দেবতায় পরিবর্তিত রূপেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি।

দক্ষিণ ভারতের বহু জনবসতি এলাকায় নামের শেষে 'উর' শব্দটি যুক্ত। দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহে 'উর' শব্দের অর্থ—'জনবসতি', শহর বা জনঅধ্যুষিত এলাকা। সুমেরেও নগরগুলোর নামের শেষে অনেক স্থলে 'উর' শব্দটি রয়েছে, যথা: উর নিজপুর, উরুক প্রভৃতি। সুমেরীয় ভাষায় বিভিন্ন পেশাতে অর্থ-ব্যঞ্জক শব্দগুলোর অন্তে 'গার' যোগ হতে দেখা যায়, যেমন: এনগার—মানে চাষী, মানগার—মানে ছুতোর, দামগার—মানে বণিক ইত্যাদি। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাতেও 'গার' শব্দের অর্থ হলো—কোন পেশায় নিযুক্ত লোক। পূর্ব ভারতে 'কার' শব্দটি যুক্ত হয়ে যেমন হয় স্বর্ণকার, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার প্রভৃতি।

লাগাস বা শিরপুরলা শহরটি ছিল বিখ্যাত। এটি লম্বায় ছিল আড়াই মাইল এবং চওড়ায় সোয়া মাইল। এই শহরে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে তার মধ্যে সোনা, রূপা, তামা আছে, কিন্তু ব্রোঞ্জ নেই। সুমেরীয় সভ্যতার শিল্পদ্রব্য, অলঙ্কার, প্রসাধন দ্রব্যাদি, সীলমোহর, গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি, বাসনপত্র, খেলার গাড়ি, মাটির পাখি, শিকারী, একশৃঙ্গী বৃষের চিত্রাদি ও ফলক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। ডাঃ ফ্রাঙ্কফার্ট তেল আসমের নামক স্থানে একটি গোলাকৃতি ভারতীয় সীল পেয়েছেন, তাতে হাতি, গণ্ডার, ঘড়িয়াল প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয় পশুর চিত্র অঙ্কিত আছে। এর তুলনায়, সুমেরীয় দ্রব্যাদির নিদর্শন হারাপ্পা-সভ্যতা অঞ্চলে অতি সামান্যই পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করেন যে, হারাপ্পা-সভ্যতা সামুদ্রিক বাণিজ্যে অধিকতর দক্ষ ছিল। টেল্লো নগরের ধ্বংসাবশেষে যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলো সম্ভবত রাজাদের। সুমেরগণ যেসব দেবদেবীর পূজা করতেন তার সঙ্গে ঋগ্বেদীয় দেব-দেবীগণের আশ্চর্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

মাহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে অপূর্ব পুরোহিত মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার ছিল ছোট করে ছাটা চাপদাড়ি আর উপরের গোঁফ কামানো, সেটি সুমেরে প্রাপ্ত দেবতা আর মানুষগুলোর মূর্তির মতই। এমনকি ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটির দিক থেকেও এই পুরোহিতের মুখটি মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ভাস্কর্য-গুলোতে রূপায়িত মানুষগুলোর মূর্তির অনুরূপ—একথা লিখেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ ই. ম্যাকে। গর্ডন চাইল্ড মহাশয় লিখেছেন: সুমের আর সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত ঘণ্টাকৃতি পাত্রগুলো দেখে যে কেউ অভ্রান্তভাবে একটি সগোত্রীয় সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন। মাহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত বেলনাকৃতি রৌপ্য পাত্রটি দেখে

স্বতঃই উর শহরে প্রাপ্ত পলেস্তারার পাত্রগুলোর সঙ্গে তুলনার কথা মনে আসে। একটি সুমেরীয় শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হুবহু সুমেরীয় শৈলীতে রচিত একটি চিত্রালঙ্কৃত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। কিন্তু চিত্রিত বিষয়টি স্পষ্টতঃই ভারতীয়। চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে: ক্রিয়াচারের সঙ্গে যুক্ত একটি উপাস্যপাত্রের সামনে একটি ভারতীয় ককুদ বৃষ দাঁড়িয়ে রয়েছে; এটি হলো প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার সীলগুলোতে ব্যবহৃত একটি খুবই প্রিয় বিষয়।

সুমেরের প্রথম খননকারী এইচ. আর. হল-এর মতে, "পূর্ব, অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকা থেকেই সুমেরগণ এসেছে। সিন্ধু উপত্যকার নাবিকগণের নিকট সুমেরই ছিল নিকটবর্তী স্থান। ক্রমে ক্রমে ঐ জনগণ এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। সুমেরগণ প্রথম থেকেই সুসভ্য; তারা ধাতুর ব্যবহার জানত, বড় বড় শহরে বাস করত এবং আকৃতিতে ছিল ভারতীয়দের মতো। সেই ভারত ছিল আর্যদের আগমনের পূর্বের ভারত; তখন দ্রাবিড়ী সভ্যতা সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত ছিল। এই সভ্যতা আর্যদের ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির বটে, কিন্তু তা প্রাক্-আর্য।"[১] হল সাহেব যদি বৈদিক সাহিত্যের চর্চা করতেন, যেমন করে তিনি ব্যাবিলোন সভ্যতার ইতিহাসের চর্চা করেছিলেন, তাহলে হয়তো তিনি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। আর্য-সভ্যতাই দক্ষিণের তথাকথিত দ্রাবিড়গণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিশেষ করে চোল ও পাণ্ড্যদের উপর। আর, প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন, কেরলই হলো সেই পূর্বাঞ্চল।

স্যার লিওনার্ড উলে ১৯২২ সালে ব্যাপক আকারে সুমের অঞ্চলের খনন কার্য পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সুমের-সভ্যতার ভারতীয় উৎস সম্পর্কে ঘোরতর সন্দিহান।

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রাগোজিন তাঁর 'বৈদিক ভারত' (*Vedic India*) নামক পুস্তকের ৩, ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন: "ঋগ্বেদে 'মাণা' শব্দের ব্যবহার আছে—সোনার একটা নির্দিষ্ট ওজন হিসাবে; এই শব্দ ব্যাবিলোনিয়া ও চাল্ডিয়াতেও একই অর্থ বহন করে। সেই অর্থ পরে গ্রীক অর্থনীতিতেও ব্যবহৃত হয়েছে 'ম্না' উচ্চারণে এবং ল্যাটিন ভাষায় 'মিনা' শব্দে। এগুলি দ্রাবিড়-ভারত এবং ব্যাবিলোনিয়া চাল্ডিয়ার মধ্যে বিরাজিত বাণিজ্য-সম্পর্কের কথা প্রমাণ করে। সুপ্রাচীনকালে এই দেশগুলোর মধ্যে যে বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাগোজিন সাহেবের মতে,

১. H. R. Hall: *Ancient History of Near East*, Chap V. pp. 172-74

দ্রাবিড়দের মারফত এই শব্দটি ঋগ্বেদে এসেছে। তিনি যদি ভাষাতত্ত্ববিদ হতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, 'মাণা' শব্দটির মূল সংস্কৃতে নিহিত। 'ম'-এর অর্থ ওজন—যা থেকে 'মণ' (ওজন) শব্দটির উৎপত্তি। মণ থেকে মাণা। মাণা শব্দটি ঋগ্বেদে স্বর্ণমুদ্রা রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে (ঋ ৮. ৭৮. ২)। উক্ত গ্রন্থকার আর একটি সংবাদ দিয়েছেন: উর বা মুখেইর ধ্বংসাবশেষে (৩০০০ খ্রীঃ পূঃ, হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী) একখণ্ড ভারতীয় সেগুন কাঠ পাওয়া গেছে। সেগুন কাঠের জন্য মালাবার ছিল বিখ্যাত। ভারতের যে মসলিন বস্ত্র পৃথিবী-বিখ্যাত, ব্যাবিলোনে সেই মসলিন বস্ত্রের নাম 'সিন্ধু'। এই বস্ত্র সপ্তসিন্ধুর আর্যরাই তৈরি করত। বৈদিককালে তুলার চাষ হতো এবং বস্ত্রও বয়ন করা হতো (দ্র. *Vedic India*)। ব্যাবিলোন ছিল অতি বিখ্যাত প্রাচীন নগর। এখানে সুমেরীয়গণই প্রথম সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত করে। কেউ কেউ অনুমান করেন, সুমের শব্দটি এসেছে সংস্কৃত স+মরু শব্দ থেকে। এর অর্থ—মরুদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল। পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতা প্রথম শুরু হয়েছিল পারস্য উপসাগর তীরে। সেখান থেকে তা ক্রমশঃ উত্তরে বিস্তৃত হয়। সপ্তসিন্ধুর পণি নাবিকেরাই এসে কালক্রমে ইরিথ্রিয়ান সাগরের (আরব সাগর, প্রাচীন উপ-সাগরগুলি সহ) দুই তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এদের সঙ্গে চোলগণও যোগ দেয়। এরাই সুমের হয়ে উত্তরের ব্যাবিলোন নগরটি গড়ে তোলে।

ব্যাবিলোন ও চাল্ডিয়া

সুমেরের উত্তরে বর্তমান বাগদাদ নগরের ৫৫ মাইল দক্ষিণে, ইউফ্রেটিস নদীতীরে আক্কাদের প্রাচীন প্রধান শহর ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যাবিলোন অবস্থিত। ২৩০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের পূর্বে এর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। উর নগরীতে সুমেরের তৃতীয় রাজবংশের পতনের পর আমোরাইট রাজা সুমুয়াবুম-এর রাজত্বকালে ব্যাবিলোন ১৮৯৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ষষ্ঠ রাজা হামুরাবি (খ্রীঃ পূঃ ১৭৯২-১৭৫০) বিখ্যাত ছিলেন। বর্তমান দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া ও আসিরিয়ার একাংশ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত। আসিরিয়া হলো টাইগ্রিস নদীতীরে ব্যাবিলোনিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রতিবেশী রাজ্য। ব্যাবিলোনিয়ায় সুমেরগণই প্রথম রাজত্ব করে। তারাই কৃষিবিদ্যা শিখিয়েছিল এবং খাল কেটে কৃষির জন্য তারাই সেচের ব্যবস্থা প্রথম চালু করে। ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া ও চাল্ডিয়া (ব্যাবি-লোনিয়াকে চাল্ডিয়াও বলা হতো)—এই তিন দেশের অধিবাসীগণের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর সুমেরগণের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। চাল্ডিয়া শব্দটি খুব সম্ভবতঃ 'চোল' শব্দ থেকে এসেছে। সুমের, ব্যাবিলোনিয়া, চাল্ডিয়া এবং

আসিরিয়া পৃথক পৃথক নাম হলেও এদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দেবতা বেল বা বাল হলেন ঋগ্বেদীয় ভাল (সূর্য) এবং এই সব অঞ্চলের প্রধান দেবতা। নিপপুর নগরে বেল-এর একটি বিশাল মন্দির ছিল। অসু-র (ঋগ্বেদীয় অগ্নি) ব্যাবিলোনীয় নাম দগনু (সংস্কৃত—দহন); ঋগ্বেদীয় বেন (ঋ ১০.১২৩) হলো সংস্কৃতে বায়ু, আর ব্যাবিলোনিয়ার বিন হলেন ঝড়ের দেবতা ; বৈদিক মরুৎ হলেন এদের মাতু বা মর্তু এবং ল্যাটিন মারন্ ; ব্যাবিলোনিয়ায় চতুর্দিকে সোপান পরিবেষ্টিত বিখ্যাত মারতুক মন্দিরটি এই দেবতার মন্দির হতে পারে। বৈদিক উষা বা তমজা (তমঃ থেকে জন্ম) ব্যাবিলোনিয়ায় ইস্তার, স্বামী তম্মুজ প্রভৃতি এদের দেবতা। ইলপতি ইলু—ঋগ্বেদীয় ইলপতি পর্জন্য (ঋ ৫. ৪২. ১৪)। বৈদিক দিনেশ ওদের দায়ানিস, আর গ্রীক দায়োনিসাগ। ঋগ্বেদের আইহান হলেন ওদের আনা দেবতা। ঋগ্বেদীয় দেব-বাহনগণকেও ওদেশে পাওয়া গেছে। ব্যাবিলোন ও নিনেভ-এ (অ্যাসিরিয়ার রাজধানী) অনেক অর্ধনর-অর্ধপশুর প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলির কোনো-কোনোটা হলো—অর্ধনর-অর্ধপক্ষী কিংবা অর্ধনর এবং অর্ধমৎস্য। বৈদিক অশ্বি, নিনেভে হয়েছে পক্ষযুক্ত ষাঁড় (ষাঁড়—সূর্যের প্রতীক)। গরুড় বা শ্যেন (শ্যেন গরুত্মান ঋগ্বেদের বিষ্ণুর প্রতীক) নিনেভে মনুষ্য মস্তক, দেহে পক্ষযুক্ত ষাঁড়—সোম বা অমৃত হরণের জন্য যার শৃঙ্গে রয়েছে পাত্র। ঈগল ও নরের যুগ্ম-মূর্তিতে মস্তকটি ঈগলের, যা বৈদিক গরুড়। প্রাচীন ব্যাবিলোনীয়গণ সর্পকে পৃথিবীর প্রতীক হিসেবে গণ্য করে পৃথিবীর পূজা করত। এই প্রথাটি স্থানীয় নয়, দ্রাবিড়ীও নয়, সপ্তসিন্ধু থেকেই এটার আমদানী। ঋগ্বেদের একটি সূক্ত-র রচয়িতা (ঋ ১০.১৮৯) হলেন ঋষি সার্পরাজ্ঞী, দেবতা সূর্য। সূর্যমন্ত্র—সায়ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, সার্পরাজ্ঞী হচ্ছেন পৃথিবীর প্রতীকী দেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণ (২. ১. ৪. ৩০) এই ঋকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পৃথিবী নিজেই সার্প-রাজ্ঞী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণও (৫. ৪. ৪) পৃথিবীর ব্যাখ্যা করেছেন। এড়িডু নগরে ছিল 'ইয়া' মন্দির। এই ইয়া বা এয়া সম্ভবত অহি থেকেই এসেছে।

প্রাচীন চাল্ডিয়ার সমাজজীবনে পুরোহিতদের বিশেষ মর্যাদা ছিল ; যেমন ভারতের সমাজজীবনে আছে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা। ও দেশে পুরোহিতদের বলা হতো পটেসি। পটেসিরা ভালো জ্যোতিষী ছিলেন। ঋগ্বেদের দ্বাদশ আদিত্য হলো—চাল্ডিয়গণেরও দ্বাদশ সূর্য। ব্যাবিলোনে বারোটি চান্দ্রমাসে বৎসর হতো। সূর্যের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সময় সময় যুক্ত করা হতো একটি অতিরিক্ত মাস। ঋগ্বেদের ১.২৫.৮ ঋকেও এরূপ উল্লেখ আছে। আসিরীয় ও

ব্যাবিলোনীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ঋগ্বেদীয় সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ অংশের সাদৃশ্য ছিল। সৃষ্টির প্রথমে যখন স্বর্গ ছিল না, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ছিল না, দেবগণও ছিল না, তখন চতুর্দিকব্যাপী ছিল একমাত্র জল। এই জল থেকে দুই দেবতা অপস্থ ও তিয়ামত উত্থিত হলেন। অপস্থ=অপ; তিয়ামত=তমসা=অন্ধকার। সৃষ্টিতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা আমাদের ঋগ্বেদের ১০।১২৯ স্মরণ করিয়ে দেয়।

ব্যাবিলোন, নিনেভ, উর প্রভৃতি স্থানের মন্দির গঠনে চোলদের প্রভাব দৃষ্ট হয়। এখানকার বাড়িগুলো তৈরি হতো পিরামিডের আকারে। হারাপ্পা-সভ্যতায় এরূপ বাড়ি দেখা গেছে। দক্ষিণ ভারতের শেঠ বা শ্রেষ্ঠী (বর্তমান চেট্টি) চাল্ডিয়াতে হলেন সেইট। এই সেইটরাই ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়াতে চারুকলা, ললিতকলা ও শিল্পকলাকে প্রভাবিত করতেন।

ব্যাবিলোনিয়ার সঙ্গে তৎকালীন ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক। সুমেরীয় কিশ, টেল আসমের, উর, ব্যাবিলোন, সুসা প্রভৃতি নগরীর ধ্বংসাবশেষ খনন করে ভারতীয় বাণিজ্যের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৮৯৪ থেকে ১৫৭০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ব্যাবিলোন স্বাধীনতা ভোগ করে। ইতি-মধ্যে সেমাইট নামে এক বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠী তাদের পৃথক ভাষা নিয়ে আক্কাদে অনুপ্রবেশ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাবিলোনেও ক্রমশঃ তারা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ব্যাবিলোনে সুমের ও সেমাইট—দুই জাতিই অধিষ্ঠান করে। সুমেরীয়গণ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ছিল অধিকতর অগ্রসর। তারা ধর্ম, সভ্যতা ও বিজ্ঞানচর্চায় প্রাধান্য রক্ষা করেছিল। সেমাইটগণ প্রথম প্রথম এসব মেনে চলেছিল। ১৫৭০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে কাসাইটগণ ব্যাবিলোন আক্রমণ ও জয় করে। আসিরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কাসাইটগণ ব্যাবিলোনে ৪১২ বৎসর ধরে রাজত্ব করে। রাজশক্তি হারালেও ব্যাবিলোন কিন্তু ধর্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্র রূপে তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখে। মারডুক ছিল চাররাজ্যের প্রধান ধর্ম-মন্দির। মারডুক হচ্ছে সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের মরুৎ; রুদ্র বা শিব যার পিতা।

১১৫৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এলাম রাজ ব্যাবিলোন জয় করে এবং সেটিকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করে। প্রথম নেবুচানড্রেজার ১১২৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে নতুন করে ঐ ব্যাবি-লোন নগর গড়ে তোলে। ব্যাবিলোন হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ (জনসংখ্যায়) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। একশত বৎসর ঐ পরিবার রাজত্ব করে। খ্রীঃ পূঃ নবম থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাবিলোন আসিরিয়ার অধীনতা স্বীকার করে নেয়। পরে ঐ নগরীর প্রভুত্ব নিয়ে চাল্ডিয়গণের সঙ্গে আসিরীয়দের যুদ্ধ চলে। ৬৪৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আসিরিয়ার রাজা অসুর বানিপাল ঐ নগর জয় করে। তার মৃত্যুর

পর চ্যাল্ডিয়দের (৬২৬ খ্রীঃ পূঃ) রাজত্ব স্থাপিত হয়। ৫৩৯ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে পারস্য রাজা সাইরাস ব্যাবিলোন জয় করে এবং ৪৮২ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ব্যাবিলোন থাকে পারসীকগণের অধিকারে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ব্যাবিলোন ঐ সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী বাণিজ্য নগর বলে ঘোষণা করেন : ৩৩১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ঐ নগর জয় করেন। তিনি এই নগরীতেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সেনাপতি সেল্যুকাস-এর রাজত্বকালে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

ব্যাবিলোনীয়দের মধ্যে একটা সুপ্রাচীন প্রবাদ বা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। সেটি হলো : তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলে আছে ওয়ানুসো নামে (Oanuso) এক মৎস্য দেবতা, যিনি ইরিথ্রিয়ান সাগর থেকে সকাল বেলা এসে চাল্ডিয়-গণকে উপদেশ দিয়ে সন্ধ্যার ঢেউয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যেতেন। এই মৎস্য দেবতা আর কেউ নন, ইনি দেবতা ইয়া বা আই, যার কথা ব্যাবিলোন ও আসিরিয়ার স্তূপসমূহে উৎকীর্ণ আছে ; মালাবার তীরের পণি নাবিকরাই এসে ইরিথ্রিয়ান সাগরের কূলে কূলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। হিব্রুরা এই নাবিকদের কুশ-এর সন্তান বলে অভিহিত করেছে। পৌরাণিক কুশ দ্বীপ দাক্ষিণাত্য হতে পারে। এই পণি বংশীয়রাই কালক্রমে সেমাইট জাতির আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে উত্তরে সিরিয়া হয়ে ভূমধ্য সাগরের তীরে বর্তমান লেবাননে এসে উপনীত হয়। এই উপনিবেশের নাম হয় ফিনিসিয়া।

আসিরিয়ার প্রাচীন রাজধানী অসুর থেকেই এসেছে আসিরিয়া নামটি। ২৮০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে আসিরিয়া আক্কাদীয় সম্রাট প্রথম সারগণকে কর দিত এবং তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ২০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সুমেরীয় সম্রাটকে (উর রাজধানী) এবং ১৭৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলোনের রাজা হামুরাবিকে কর দিত। ১৫৭০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে কাসাইটগণ ব্যাবিলোন দখল করলে আসিরিয়া স্বাধীন হয়। ১২১০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে আসিরীয় রাজা প্রথম আদাতনিরাবি হিত্তিদের নগর কারকেমীশ (ইউফ্রেটিস নদীতারে) দখল করে। নেবুচাদনেজার-এর রাজত্বকালে পুনরায় তা ব্যাবিলোনের অধীনস্থ হয়। ১২০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে হিত্তি সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। মিশর সাম্রাজ্যেরও অবস্থা হয় পতনোন্মুখ। ১১৩০-১১১৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে আসিরীয় রাজা অসুর প্রথম রেশরিসি-র রাজত্বকালে পুনরায় ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যাবিলোনকে পরাস্ত করে। এইভাবে গড়ে ওঠে আসিরীয় সাম্রাজ্য। 'অসুর' নগরের মন্দিরে এই রাজার কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ৮৮৪ খ্রীস্ট

আসিরিয়া

পূর্বাব্দে অসুর দ্বিতীয় নাসির অপাল উত্তর সিরিয়াতে আরামিয়গণের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ৭০৩-৬৮১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সেন্নাচেরির রাজত্বকালে নিনেভ রাজধানী হয়। পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত আসিরীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী হলো আসিরিয়ার গৌরবোজ্জ্বল যুগ।

সুমেরীয় এব মিসরীয়—এই দুই সভ্যতার মধ্যে কোন্ সভ্যতা অধিকতর প্রাচীন, এ সম্পর্কে দারুণ মতভেদ আছে। কে-যে কার উপরে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বলা কঠিন। উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, বাণিজ্য-সম্পর্কও ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ দুই সভ্যতা ইয়োরোপের উপর যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কেও কোন দ্বিমত নেই।

মিসর

যাহোক, মিসর বা ইজিপ্ট—উত্তর আফ্রিকার নীলনদের নিম্ন উপত্যকায় দু-দিকের মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। নীলনদ উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে। এর দক্ষিণে হলো নিউবিয়ার বেলে পাথরের মালভূমি, লম্বায় প্রায় ৫৭০ মাইল। প্রকৃতিই মিসরকে আফ্রিকার অপরাপর দেশ থেকে পৃথক করে রেখেছে।

মিসরের প্রাচীন অধিবাসীগণ নিজেদের দেশকে কামিত বলত। কু+মিত= কুমিত বা কামিতও হতে পারে। অর্থাৎ, কালো মৃত্তিকার দেশ; গ্রীক নাম —আইজিপটস (হোমার-এর লেখায়)। সেমেটিকগণ এদেশের নাম দিয়েছিল মুস্র বা মুসর। আরবগণ বলত মাসর। মুস্র হয়তো সংস্কৃত মিশ্র থেকে এসেছে। মিশরে সুপ্রাচীন কালে নানা ধরনের মানুষ ছিল। এদের মধ্যে একটা সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। কপটস রাজার রাজত্বকালে তাদের পতনোন্মুখ অবস্থায় পূর্ব দেশ থেকে একটি জাতির মানুষেরা দলে দলে এসে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। পুণত্-এর অবস্থান সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে খুবই মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পুণত্ লোহিত সাগরতীরবর্তী একটা অঞ্চল, কেউ কেউ মনে করেন এটি পারস্য সাসরতীরবর্তী পণি বা পিউনিকদের দেশ; আবার কারো কারো মতে, পুণত্ হলো দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের একাংশের মত হলো—এটি আফ্রিকারই দক্ষিণের একটি অঞ্চল। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেছেন, এই ঔপনিবেশিকরা পূর্বদেশ পুণত্ থেকে আগত। ইয়োরোপীয় বিশেষজ্ঞদের (মিসর বিষয়ে) মতে, মিসরীয়গণ হলো—উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার আদিম শ্বেতজাতি এবং এশিয়ার আদিম অভিযানকারীদের একটা মিশ্র জাতি।[১] প্রত্নতত্ত্ববিদ

১ *Historians' History of the World*, Vol. I. p. 65

হিয়ারেন (Hearen) মনে করেন, মিসরীয়গণ ছিল ভারতেরই আদিম অধিবাসী। অপর প্রত্নতত্ত্ববিদ পেট্রির (Sir Flindess Petrie) অভিমতে, মিসরীয়গণ হলো—ফিনিসিয়দের একটি শাখা, অর্থাৎ পিউনিক জাতি, যারা লোহিত সাগর দিয়ে এসেছিল।

যাহোক, ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাচীন মিসরের অনেক কিছুই আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মিসরের অনেক ফারোয়া (রাজা) তাদের রাজত্ব-কালে পুণত্ দেশে বাণিজ্য ও তীর্থ করতে হয় নিজেরা গিয়েছিলেন, নয়তো অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তাঁরা পুণত্-এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন। পুণত্ শব্দটি কিন্তু ভারতীয়। সংস্কৃত 'পুণ' যা থেকে পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র হয়েছে। আর 'ত' অর্থে 'দেশ'—পবিত্র দেশ। মিসরীয় রাজগণের পুণত্-এ অভিযান প্রেরণের অনেক বর্ণনাই ডের-এল-বারি (Der-El-Bahri) নগরীর হর্ম্যসমূহের দেওয়ালে চিত্রিত আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননেও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্তমানে যেসব তথ্য জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে, ২৭৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ফারোয়া সাহুরে পুণত্-এ এক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। সেই অভিযানের মাধ্যমে পুণত্ থেকে তিনি বহু দ্রব্যাদি নিয়ে এসেছিলেন। যথা: ৮০,০০০ ওজনের সুগন্ধি নির্যাস, ৬০০০ ওজনের ইলেকট্রন[১], ২৬০০টি মূল্যবান কাষ্ঠের যষ্টি, গদ, সুগন্ধী ধুনা ইত্যাদি।

২১০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে একজন রাজকর্মচারী হেনু, সাগরগামী নৌকা তৈয়ার করে পুণত্-এ পাঠিয়েছিল। এছাড়া, ২৪৭৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এলিফ্যানটাইন-এর শাসন-কর্তাদের সঙ্গে পুণত্-এর যোগাযোগ ছিল। তাদের একজন কর্মচারী অন্যূন এগার বার পুণত্-এ যাতায়াত করেছেছ। আর, ১৯৩৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ফারোয়া আমেনহেত পুণত্-এ একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

রানী হেপটেপসুট তাঁর দেবতা আমন-এর নিকট থেকে আদেশ পেয়ে নিজ দেশেই পুণত্ গড়ে তোলার জন্য সেখানে এক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং ঐ স্থান থেকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলো নিজদেশে আনয়ন করেছিলেন: চন্দন কাষ্ঠ; সুগন্ধি নির্যাস, টাটকা মীরহ (সুগন্ধি কাষ্ঠ—তার মধ্যে তিনি ৩০টি 'আমন' কে উপহার দেন), অনেক টুকরো কাঠ, হাতির দাঁত, এমুর সোনা, দারুচিনির কাঠ, ধূপ, চোখের রূপসজ্জা (অঙ্গরাগ), বানর, গরু (৩৩০০টি মন্দিরে দান

১। ইলেকট্রন: রৌপ্য ও তাম্রের মিশ্রিত ধাতু। হারাপ্পা-সভ্যতায় (৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে) পাওয়া যায়। অনুমান, দক্ষিণ ভারত থেকে আমদানি করা।

করা হয়), কুকুর, চিতাবাঘ, ঐ বাঘের চামড়া, পুণত্-এর কিছু মানব-পরিবার শঙ্খ প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এই সব দ্রব্য সেকালে কেবলমাত্র ভারত থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল।

১৫২৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে তৃতীয় খুতমোজ পুণত্-এ অভিযান প্রেরণ করেন এবং হাতির দাঁত, মূল্যবান কাঠ, চিতাবাঘের চামড়া, ধূনা, সুগন্ধি, ধূপ (২.২৩ বুসেল) দাস ও বহু গরু আমদানি করেন। প্রাচীন মিসরীয় গরুর যে-চিত্র পাওয়া যায়, সেরকম গরু বর্তমানে গুজরাটেও পাওয়া যায়। হাতির দাঁত, চন্দন, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ, ধূপ ও সুগন্ধী দ্রব্যাদি একমাত্র ভারতেই পাওয়া যেত।

মিসরীয় ও ভারতীয় আর্যদের ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রথায় অনেক সাদৃশ্য দেখা গেছে। ঋগ্বেদীয় ধর্মের ন্যায় মিসরীয় ধর্মেও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও ঘটনাবলীই হলো ভিত্তি স্বরূপ। মিসরে দেবগণের অনেকেই হলেন সূর্যের নানা অভিব্যক্ত রূপের প্রতীক। মিসরীয় সূর্যদেবতার নাম হোরাস (সূরীয়, সূরীয়স-হুরিয়স-হোরাস)—গ্রীক সিরিয়াস। মিসরের রাত্রির সূর্য ওসিরিশ ও পত্নী ইশিষ (উষা)। ওসিরিস=অসুরীয়স্। মিসরের রা—ভারতের হর। আমেন বা ইমন সংস্কৃত ওম্। সেথ্=বৈদিক শ্বেত (চন্দ্রের রং)। সেব হলো ভারতীয় সাবিত্রী (রাত্রের সূর্য) অথবা পৌরাণিক শিব। সংস্কৃত হর=হুর ও তার পত্নী —হুষ্ট হর=শিব ও হোত্রী বা সাবিত্রী; পথ্ত=বৈদিক প্রকৃতি, শেখেত= সংস্কৃত শক্তি। মিসরীয়দের ধর্মীয় আচার-ব্যবহার পুণত্ থেকে এসেছিল। মিসরে সিন্ধুসভ্যতার নর ও পশুর যুগ্মমূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। একটি বৃত্তাকৃতিকে ঘিরে পাঁচটি প্রাণীর মিলিত মূর্তি পাওয়া গেছে; আর সিন্ধুসভ্যতায় ছিল ছয়টি প্রাণীর মূর্তি। সিন্ধুসভ্যতার বৃষের মতই মিসরে আপিষ বৃষ পবিত্র পশু। মেণ্ডেস্ দেব ও এত্ মেষ সিন্ধুসভ্যতায় মেষের সঙ্গেই তুলনীয়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের প্রতীক মেষ (ঋ ৮. ৯২. ১২, ৮. ২. ৪০), পক্ষী ও মানুষ; বিড়াল ও মানুষ (ষষ্ঠীদেবী) গরু এবং মানুষের যুগ্মমূর্তি মিসরে পাওয়া গেছে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে প্রাচীন মিসরীয়গণ ছিলেন তৎকালীন ভারতীয়গণের অনুরূপ। রাজা হলেন দেবতার প্রতিনিধি, আর রাজশক্তি দেবগণ থেকে প্রাপ্ত। রাজা ছিলেন ধর্মের ও রাষ্ট্রের শীর্ষে। তিনি বিচারক ও আইন প্রণেতা। তিনি সেনাদলের নিয়ামক ও সংগ্রামের নেতা। রাজা ছিলেন পুরুষানুক্রমিক (ঋগ্বেদে অবশ্য নির্বাচিত রাজারও উল্লেখ আছে)। তিনি হতেন ক্ষত্রিয় কিংবা তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ। মিসরীয়গণ ভারতীয়দের মত বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত ছিলেন; কিন্তু এই প্রথা কঠোর বা

অনমনীয় ছিল না। রাজপরিবারের পরেই পুরোহিতশ্রেণী ও সেনাদলের মানুষ ছিলেন সমাজের উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। বড় বড় মন্দিরে থাকতেন চার-জন করে প্রধান পুরোহিত। ভারতেও যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত থাকতেন সাধারণত চারজন করে ঋত্বিক। আর্যদের মতই মিসরীয়গণ আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আর্যদের মতই তাঁরা অনেক রীতিনীতি মেনে চলতেন। বৈদিক যুগের আর্যদের মতই তাঁরা ষাঁড় বা বৃষকে বলি দিতেন। কিন্তু স্ত্রী জাতীয় বৃষ ছিল ঈশির প্রিয়, সুতরাং তা অবধ্য ছিল। মিসরীয়গণ গাভীকে পবিত্র মনে করে হত্যা করতেন না। আর্যদের মত মিসরীয়গণ শূকরকে অপবিত্র মনে করতেন এবং শূকর স্পর্শ করলে তাঁদের স্নান করতে হতো।

আর্যদের পুরাতন তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিনজনই সূর্যের অভিব্যক্তি মাত্র। প্রাতঃসূর্য—ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নসূর্য—বিষ্ণু বা হরি (মিসরীয় হোরাস) এবং রাত্রির সূর্য—শিব বা হর হলেন (মিসরীয়—হর) প্রলয়ের বা ধ্বংসের দেবতা—পৃথিবীকে যিনি অন্ধকারে আবৃত করেন।

ডায়োডোরাস (Diodorus) লিখেছেন, "কোন কোন গ্রীক পুরাতত্ত্ববিদ ওসিরিস ডায়োনিসাসকে তাঁর কুলনাম সিরিনস বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে চিত্রল হরিণ শাবকের (নেব্রিস) গোল গোল চিত্রযুক্ত চর্ম পরি-হিত বলেও বর্ণনা করেছেন—আকাশর নক্ষত্রের কল্পনায়।" এখানে ওসিরিস =সূর্য; ডায়োনিসাস=দিনেশ; সিরিনস—সূর্যেরই অপভ্রংশ। এই বর্ণনার সঙ্গে ভারতীয় শিবের যথেষ্ট মিল আছে। শিব—সূর্যেরই অপর নাম এবং ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত; এখানে ব্যাঘ্রচর্মের পরিবর্তে চিত্রল হরিণের চর্ম বলা হয়েছে। শিব ঠাকুরকে শশীমৌলী বলা হয়, কারণ তাঁর কপালে চন্দ্র বিরাজিত। মিসরীয় পুরাণে বলা হয়েছে—বৃত্র (চন্দ্র) ওসিরিসকে পরাস্ত করেছে। আর্যদের পুরাণে কালরাত্রি শিবের স্ত্রী (কালী), শায়িত শিবের দেহের উপর তিনি প্রলয়নাচে মত্তা এবং অসুরের সঙ্গে সংগ্রামরতা। এরূপ উপাখ্যান মিসরীয় পুরাণেও আছে। মিসরীয় পুরাণে ঈশিসকে কখনো কখনো চন্দ্র রূপে কল্পনা করা হয়েছে, কারণ তার মাথায় যুক্ত রয়েছে শিং (অর্ধচন্দ্রের যেমন দু'দিকে শিং)। এটা হারাপ্পা-সভ্যতার চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। মিসরীয়গণ অগ্নিকে দেবতা ভাবত। পৃথিবী ও 'মেতেরা' (সংস্কৃত মাতৃ বা মা), ঋগ্বেদে পৃথিবী-দেবী।

অনন্ত নাগের অবতার বলরামের অন্তিমকালের যে উপাখ্যান মহাভারতে দেওয়া আছে তাতে দেখা যায় যে, অন্তিম সময়ে সময়ে বলরামের মুখ থেকে অনন্ত

নাগ বেরিয়ে গিয়ে পশ্চিম সাগরে প্রস্থান করেছেন। খুব সম্ভব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে বলরাম দলবল নিয়ে ভারত ত্যাগ করে পশ্চিম সাগর দিয়েই প্রস্থান করেন। বলরামের হাতের দণ্ড, অর্থাৎ 'হল' বা লাঙল হলো মিসরের ফারোয়াদের রাজদণ্ড। বলরামের সম্মানজনক পরিচয় চিহ্ন 'সর্প' ফারোয়াদের কপালেও দৃষ্ট হতো। বলরামের বংশ হলো সাত্বত; মিসরীয় অনেক ফারোয়াও 'সাত্বত' বলে পরিচয় দিতেন। বলরামের মূল বংশ—চন্দ্রবংশ। চন্দ্রের প্রিয় হলো জলপদ্ম, মিসরীয় রাজগণ এই ফুল তাদের অঙ্গসজ্জা রূপে ব্যবহার করতেন। মস্তকে সূর্য ঋগ্বেদের বনস্পতিকে মিসরের চিত্রে দেখা গেছে। ঋগ্বেদের যূপ ছিল সূর্যের বাহন। বৃষরূপী সূর্য—যূপকাষ্ঠের উপরে অধিষ্ঠিত, এরূপ চিত্র মিসরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে।

একটি বৃষ, সাতটি সন্তান (রশ্মি) এবং তাদের শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে গোলাকৃতি সূর্য চিহ্ন, এরূপ চিত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমান কালেও ভারতে হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠা'ন বৃষকাষ্ঠে সূর্যরূপী বৃষকে চারটি সন্তান সমেত ক্ষোদিত দেখা যায়। ঋগ্বেদে রুদ্রের প্রতীক বানর—বৃষকপি নামে বর্ণিত; মিসরেও বানর সূর্যদেবের প্রতীক। ঋগ্বেদের আকাশের অহি হলো মিসরের 'অপপ্' (অপ+প). যে স্বর্গীয় বৃষ্টির জল পানকারী এবং সূর্যরূপী বিড়াল কর্তৃক নিহত হয়েছিল।

মৃতদেহ সৎকারের প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি মিসরেও অনুসৃত হতো। মিসরে মৃতের সমাধিতে ছাগল ও কচ্ছপের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এর অর্থ—ঐ দুই জীব মৃতের আত্মাকে মৃত্যুসাগর পার করে নিয়ে যাবে। খেলনা-গাড়ি এবং সেতুও মিসরের সমাধিতে পাওয়া গেছে। মিসরের সমাধি খুঁড়ে যেসব কঙ্কাল-করোটি পাওয়া গেছে সেই সব করোটির সঙ্গে ভারতীয় করোটির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মিসরে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নামও জড়িত থাকত, গুজরাটেও বর্তমানে এই প্রথা চালু আছে।

যে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার উল্লেখ এখানে করা হলো, তার প্রথম রাজা ছিলেন মেনেস্ বা মেনা। তাঁকে ওসিরিস নামেও (সূর্য) সম্বোধন কবা হতো। আর্যদের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা মনু ছিলেন বিবস্বান (সূর্য) পুত্র।

মেনেস-এর পূর্ববর্তী সভ্যতায় মিসর ছিল দুই খণ্ডে বিভক্ত। মেনেস-ই প্রথম ঐ দুই খণ্ডকে একত্রিত করে এক রাজ্য গড়ে তোলেন এবং মেমফিস শহরকে করেন রাজধানী। মেনেস কর্তৃক এই এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৩১০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিসরের যে বিবরণ রেখে গেছেন তা পাঠ

করার পর মনে হয়—মিশরীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের আচার-ব্যবহারে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল।

অনুমিত হয়, দক্ষিণ ভারতের পণিগণের নেতৃত্বেই মিসর রাজ্যটি স্থাপিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের জনগণই মিসরে গিয়ে গড়ে তুলেছিল ভিন্ন ভিন্ন নগর। আর প্রতি নগরেই ছিল পৃথক পৃথক দেবতা।

অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্য সাগরের পূর্বতীরে, বর্তমানে যেখানে লেবানন রাজ্য অবস্থিত, সেই অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে ফিনিসিয়া নামে এক রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ফিনিসীয়গণের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তাদের পূর্বপুরুষগণ সুমের-এর নিকটবর্তী পারস্য উপসাগর তীরে প্রথমে বাস করত; সেখান থেকে এসেই তারা এই উপনিবেশ গড়ে তোলে।

ফিনিসিয়া

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখে গেছেন, ফিনিসীয়গণ প্রাচীনকালে পূর্ব ইরিথ্রিয়ান সাগরতীরে বসবাস করত। সেখান থেকে সিরিয়া হয়ে তারা ভূমধ্য সাগরতীরে উপনীত হয়। এই ফিনিসীয়গণ ছিল সমুদ্র-বাণিজ্যে লিপ্ত এক বিখ্যাত বণিক সম্প্রদায়। এই জাতির অপর নাম ছিল পিউনিক। ২৩০০ থেকে ২২০০ খ্রীস্টপূর্ব সময়কালে এই রাজ্যটি উর নগরীর তৃতীয় রাজবংশের রাজত্বকালে সুমের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। তারা সুমেরীয় ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সুমেরীয় ভাষা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে। এদের প্রধান নগর টায়ার বা ট্রয় গড়ে উঠেছিল ২৭০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। এককালে ভারতীয় সভ্যতা যেমন সুমের সভ্যতাকে গড়ে তুলেছিল, ফিনিসীয় সভ্যতা গঠনেও সেই প্রভাব দৃষ্ট হয়। পণিগণের নামের সঙ্গে ফিনিসিয়া, পিউনিক নামের সাদৃশ্য তো আছেই, তাছাড়া তাদের সমুদ্র-বাণিজ্য বৃত্তিও অভিন্ন, আরাধ্য দেবগণও অভিন্ন। ফিনিসীয়দের প্রধান দেবতা হলো বাল, ঋগ্বেদের ভাল বা সূর্য দেবতা। এই বাল দেবতাই ফিনিসিয়ার এক-এক নগরে এক-এক নামে অভিহিত হতো: ট্রয় নগরীতে মেলকার্থ, কার্থেজে হামমন প্রভৃতি। বাল-এর দেবী অস্তারতে। ইনি বালাথ নামেও পরিচিত। কার্থেজে—তালিথ। ঋগ্বেদে স্তৃণ=নক্ষত্র। ঔরানুস—ঋগ্বেদের বরুণ; রেশচুফ—ঋগ্বেদের রিভু। বিক্রুর নেতৃত্বে পণিগণ এই দেবগণের উপাসক ছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদের ইন্দ্রকে, পণিদের নেতৃত্বাধীন কোন ঔপনিবেশিক সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পণিগণ ইন্দ্রবিদ্বেষী ছিল। এরই জন্যে ঋগ্বেদের ঋষিগণ অর্থবান সমাজে প্রতিষ্ঠিত পণিদের এত বিরুদ্ধে ছিলেন। ফিনিসীয়দের ভাষার মধ্যে আর্যদের ভাষার যেমন প্রাধান্য ছিল, তেমনি পার্থক্যও ছিল। পণিগণ সপ্তসিন্ধু ছেড়ে

প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, সেখান থেকে তারা যায় ইরিথ্রিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে। বহু পৃথক ভাষা, পৃথক আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়; এর ফলে তাদের অনেক পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু আরাধ্য দেবতারা অপরিবর্তিত রয়ে যান। ভারতের সঙ্গে ফিনিসীয়দের বাণিজ্য-সম্পর্ক চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ফিনিসিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সমুদ্র-গামী জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠের অভাব ছিল। দক্ষিণ ভারত থেকেই তাদের কাঠ নিয়ে যেতে হতো। তাছাড়া সোনারূপা, গজদন্ত, বৈদূর্য-মণি, ময়ূর, চন্দন, ধূপ, সুগন্ধিদ্রব্য প্রভৃতি তারা ভারত থেকে নানা দেশে নিয়ে যেত। ফিনিসীয়গণ ক্রীট, গ্রীক উপদ্বীপ, দক্ষিণ ইয়োরোপ, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল। অর্থবলে বলীয়ান হয়ে পশ্চিম এশিয়া মাইনর থেকে ইজিপ্টের সীমানা পর্যন্ত তারা সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। মিশরের রাজা তৃতীয় থুতমোস (**Thutmose,** ১৫৪৪-১৫০১ খ্রীস্টপূর্ব) ফিনিসিয়া আক্রমণ করলে হিত্তি সম্রাট সুকিলোলিয়াম মিসরীয়দের তাড়িয়ে দেয় এবং ফিনিসিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৩৫০-১৩০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত মিসর পুনর্বার ফিনিসিয়া জয় করে। কিন্তু পরবর্তী শতকেই হিত্তিদের কাছে কাদেশে পরাজিত হয়ে ফিনিসিয়া পরিত্যাগ করে। খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে ফিনিসিয়া স্বাধীন হয়ে বাণিজ্য ও সভ্যতা বিস্তার শুরু করে। ফিনিসিয়ায় কতকগুলো বড় বড় নগর গড়ে উঠেছিল, যেমন: অর্ভদ বিব্লশ, বেইরুট, সিডন, ট্রয়, আক্রো প্রভৃতি। এইসব নগরেরও নিজস্ব রাজা ছিল। এই সময় যে বিশাল নৌবহর গড়ে উঠেছিল, ১০০০ থেকে ৭৭৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত তার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ফিনিসিয়া প্যালেস্টাইনের ডেভিড ও সলোমন-এর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে। উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে ফিনিসিয়া একচেটিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। ৮১৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে তার প্রচেষ্টায় উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ নামে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক বন্দর-নগর গড়ে ওঠে। ইতিহাসবিশ্রুত এই নগরকে কেন্দ্র করেই পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর ও পূর্বে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্থেজের অপর নাম কার্য দেশ (ভারতীয় নাম)। কার্থেজীয় পিউনিকগণই গ্রীক, রোমান, আইবেরিয়ান, কেল্টস্, গল, এমনকি নরওয়ের উত্তর তীরেও এককালে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা ইস্রায়েলের ইহুদী রাজগণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। ফিনিসীয়দের কলাবিদ্যা সুমেরীয় ও মিসরীয়দের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে।

খ্রীঃ পূঃ অষ্টম ও সপ্তম শতকে ট্রয় ব্যতীত ফিনিসিয়া আসিরিয়া সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত হয়। আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফিনিসিয়া স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু ৫৮৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলোনিয়ার চ্যাল্ডিয়ানগণ ট্রয় বাদে অবশিষ্ট ফিনিসিয়া জয় করে।

ফিনিসীয়দের ধ্বংসস্তূপে হারাপ্পা-সভ্যতার নিম্নলিখিত নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে : ১. মাটির ভাণ্ড, সর্বত্র গোল ছিদ্র সহ ২. হাতলযুক্ত মাটির পাত্র ও বাটি ৩. তিনটি পায়াযুক্ত মাটির পাত্র ৪. স্তম্ভযুক্ত মাটির পাত্র ৫. মাছ ধরার জাল ৬. গুটিকা ৭. তুরপুন = ছিদ্র করার যন্ত্র। ৮. শিংযুক্ত মাতৃমূর্তি ও দেবমূর্তি ৯. ফিনিসীয়দের অক্ষরমালার মধ্যে ১২টি অক্ষর হলো হারাপ্পায় প্রাপ্ত অক্ষরেরই অনুরূপ।

এই ফিনিসীয়দের কাছ থেকেই গ্রীকগণ খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে তাদের বর্ণমালা পেয়েছে। ফিনিসীয় সংস্কৃতির কাছে গ্রীকগণ ঋণী। তারা ওজন, মাপ, বাটখারা প্রভৃতিও পেয়েছে ফিনিসীয়দের কাছ থেকে।

ইয়োরোপীয়গণ সভ্যতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছে ফিনিসীয়দের নিকট থেকে। লিখবার বিদ্যা, কৃষি, নৌ-নির্মাণ-পদ্ধতি, নাবিকবিদ্যা, বস্ত্র পরিধান ও ধাতুবিদ্যার কলাকৌশল—এসবই হলো ফিনিসীয়দের অবদান।

পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আর্যদের মত ভাষাভাষী যে কয়টি মানব-গোষ্ঠী প্রাচীনকালে আবির্ভূত হয়েছিল, তার মধ্যে ফ্রিজিয়া অন্যতম। ফ্রিজিয়া হিত্তিদের পরাস্ত করে এশিয়া মাইনর-এর উত্তর-পূর্বে রাজ্য স্থাপন করেছিল। তারা ছিল ব্রিজায় এবং আসকানিদের সংমিশ্রণে গঠিত জাতি। প্রাচীন গ্রীক

ফ্রিজিয়া

ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ব্রিজীয়গণকে অতি প্রাচীন জাতি রূপে উল্লেখ করে গেছেন। ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতে এদের ভাষা ছিল ইন্দো-ইয়োরোপীয় (প্রাচীন মতে আর্য)। এদের প্রধান দেবতা—বগাইয়স। ঋগ্বেদের দেবতা 'ভগ' ইরানে হয়েছে 'বগ', স্লাভোনিক ভাষায় 'বেগু', ফ্রিজীয়দের ভাষায় 'বগাইয়স' হতে পারে। এদের আদিনিবাস কোথায় ছিল বলা কঠিন। ঋগ্বেদে আমরা ব্রিচিবৎ নামে এক মানবগোষ্ঠীর সন্ধান পাই, যারা ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হরিয়ূপিয়াতে (হারাপ্পা ?) রাজত্ব করত এবং যারা প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পশ্চিম দিকে প্রস্থান করে (ঋ ৬.২৭.৫ ও ৬)। সম্ভবতঃ এরাই পরবর্তীকালে ব্রিচি বা ব্রিজি বলে পরিচিত হয়েছিল। হুয়েন সাঙ যখন ভারত পরিভ্রমণ করেন তখন কাবুলের কাছে ব্রিচিস্থান নামে একটি এলাকা দেখতে পেয়েছিলেন। ওখান থেকেই কি ব্রিচিগণ পশ্চিমে প্রস্থান করেছিল ? এ সবই অবশ্য

অনুমান। বিশ্বভারতীর হরিদাস মজুমদার মহাশয় তাঁর গবেষণামূলক এক রচনায় বলেছেন, ভৃগু শব্দ রূপান্তরিত হতে হতে সম্ভবত ফ্রিজি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

আমরা জানি, পরশুরাম বংশের ভার্গবগণ গুজরাট থেকে দক্ষিণ ভারতের কেরল অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এর উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে, এরা ভালো রথ বানাতে পারত। ভৃগুরই উপাসকগণ ব্রিজিয়ান বা ফ্রিজিয়ান হতে পারে। এই গোষ্ঠী এশিয়া মাইনর, মাল্টা, ক্রীট, সিসিলিসহ সুদূর স্কাণ্ডিনেভিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'ক্রিস্টিয়ানিটি'র ইতিহাস লেখক ইউসেবিয়াস (Eusebius) এক অজানা গোষ্ঠীর উল্লেখ করে গেছেন, যারা খ্রীস্টকে বাদ দিয়ে বরকফ (Borcoph) বা বারকাব্বাসকে (Barcabbas) অবতার বলে মানত। এই নাম সম্ভবতঃ ভার্গব-এরই অপভ্রংশ। এছাড়া ফ্রিজীয়দের মাতৃদেবী আম্মা হলো সংস্কৃত অম্বা বা মা, পৃথিবী দেবী। অপর দেবতা অট্টিস (ঋগ্বেদীয় অত্রিয়—সূর্য) (ঋ ৫.৪০.৭, ১.১০০ প্রভৃতি) অপর দেবী সিবেল বা সিবেবে ভারতীয় পৃথিবী এবং তাঁর প্রিয়তম—অট্টিস (ঋ ৫.৮৪) বা অত্রি।

কোনো এক সুদূর অতীতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে, ভারতীয়গণ ইয়োরোপের সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত লিথুয়ানিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ঐদেশের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান। লিথুয়ানিয়ার নদীগুলোর নামের সঙ্গে কিছু ভারতীয় নদীর নামের আশ্চর্য মিল আছে। লিথুয়ানিয়ার নেমুনা, তাপ্তি, শ্রোবতী, পুরুস্নে বা পয়স্নে, নর্বুদে নামধারী নদীগুলিই তো ভারতের যমুনা, তাপ্তি, সরস্বতী, পরুষ্ণি ও নর্মদা নদী। ঐ দেশের দেবগণের নামও দিইব, দেবুক (দ্যৌঃ), ইন্দ্র, বরুণ, পুরকণ্য (পর্জন্য), বেত্র (মিত্র) ইত্যাদি। যেসব মানবগোষ্ঠী সেখানে বাস করে তাদের নাম : কুরু, পুরু, যাদব, সুদব, সেলুস, জাহ্নবীকাই প্রভৃতি। এইসব সাদৃশ্য এতই স্পষ্ট যে, হঠাৎ বিশ্বাস করতে মনে দ্বিধা জাগে। এই বিষয়ের প্রতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টিও যথারীতি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে, লিথুয়ানিয়াই ছিল আর্যদের আদি নিবাস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লিথুয়ানিয়ায় ঐ যুগের কোন প্রাচীন সাহিত্য আবিষ্কৃত হয়নি। সরস্বতী নদী, ইন্দ্র, পর্জন ও মিত্র দেবতা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে তখন মনে হয় এই যোগাযোগ ঘটেছিল বৈদিক

লিথুয়ানিয়া

যুগেই। উত্তর ইয়োরোপের অনেক স্থানে ও মধ্য রুশিয়ার নিম্নদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞেরও বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। (দ্র. *Scythians* by E. H. Minns)।

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব ঈজিয়ান এলাকায় এবং মিসরের নিকটবর্তী অঞ্চলে ক্রীট দ্বীপ অবস্থিত। সভ্যতার ইতিহাসে এই দ্বীপটি ইয়োরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই দ্বীপে খননকার্য চালিয়ে একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করেছেন। এই

ক্রীট দ্বীপ

এই দ্বীপবাসীগণ ৩০০০ থেকে ১৪০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রায় ষোল শত বৎসর এক সমৃদ্ধ ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। এই সভ্যতার প্রভাব পশ্চিমে সিসিলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্রীট দ্বীপের রাজধানী নশস নগরে মিনস্ রাজাদের প্রাসাদের যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তা তৎকালীন নাগরিকদের সমৃদ্ধি ও বিলাসিতার সাক্ষ্য বহন করছে। নগরের পয়ঃপ্রণালী ও জল গরম করার পদ্ধতি, মহিলাগণের পোশাক-পারিচ্ছদের বিলাসিতা, তৎকালীন হস্তশিল্পের উৎকর্ষতা প্রভৃতি আজও মানুষের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। নশস ছিল লক্ষাধিক অধিবাসীসহ একটি সাগর-বন্দর এবং পূবের সঙ্গে পশ্চিমের এক বাণিজ্যকেন্দ্র। এই দ্বীপটি ভূমধ্য সাগরের বুকে সেকালে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। প্রথমাবধি ভারতের সঙ্গেও স্থাপিত হয়েছিল এর বাণিজ্য-সম্পর্ক। আর্থার ইভানস্-এর মতানুসারে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দে ক্রীটে ভারতের জাতীয় পক্ষী ময়ূর দৃষ্ট হয়। হারাপ্পা-সভ্যতার নিম্নলিখিত নিদর্শনগুলি ক্রীট-এ পাওয়া গেছে: ১. কলাক্ষেত্রে ময়ূর-এর অবস্থান ২. ভারতীয় ব্রোঞ্জ ৩. সীলমোহরে জীবজন্তুর চিত্র, যা হারাপ্পা-সভ্যতার চিত্রের অনুরূপ ৪. একশৃঙ্গী বৃষের স্থানে মেষ।

ক্রীটের প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ক্রীটের অক্ষরমালায় যে ৪৮টি অক্ষর আছে তা হারাপ্পা-সভ্যতার অনুরূপ বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। হঠাৎ এক সময়ে মিনস রাজবংশের পতন ঘটে এবং যারা এসে এর ধ্বংসকার্য সমাধা করেছিল, তারা এই সভ্যতার কোন বিবরণ রেখে যায়নি। মিনোয়ান সভ্যতায় মহামূল্যবান প্রস্তর খণ্ডের উপর খচিত অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য হলো এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান। গ্রীকগণ নিশ্চয়ই এই বিদ্যা মিনোয়ানদের কাছ থেকেই পেয়েছিল। এই মিনোয়ান সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় ও মিসরীয় সভ্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল। ক্রীট সভ্যতার পতনের দুই-তিন শতাব্দী পরেই গ্রীক সভ্যতার উদয় হয়।

প্রাচীন গ্রীস-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল গভীর। লিথুয়ানিয়া বাদে

ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোর মধ্যে গ্রীক ভাষাই সব চেয়ে প্রাচীন, সংস্কৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী এবং অধিকতর সাদৃশ্যসম্পন্ন। সংস্কৃতের সমজাতীয় শব্দের সংখ্যা গ্রীক ভাষাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক।

গ্রীস

ইয়োরোপের প্রাচীনতম ভাষা গ্রীক। হোমার, হেরোডোটাস্, সক্রেটিস ও প্লেটোর ভাষা গ্রীক; কিন্তু ভারতীয় ভাষার তুলনায় তা অনেক অর্বাচীন, অনেক পশ্চাদবর্তী এবং তার ব্যবধান দুই হাজার বৎসরের কম নয়। সুতরাং কোনো সাদৃশ্য দেখা গেলে ভারতের প্রভাবেই তা সৃষ্ট হয়েছিল বলা চলে। স্থলপথ ও জলপথ, এই দুই পথেই ভারতীয় প্রভাব গ্রীসে গিয়ে পৌঁছেছিল। গ্রীক ভাষার যখন সৃষ্টি হয়নি তার পূর্বেই রচিত হয়েছিল রামায়ণ-মহাভারতের মতো সুমধুর মহাকাব্য।

প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করতেন, কি জাতিতত্ত্ব বিচারে, কি জাতির মূল অনুসন্ধানে, কিংবা ভাষা সৃষ্টিতে, অথবা জাতীয় বৈশিষ্ট্য স্ফুরণে, তারা সব এক। কিন্তু ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয় না। নানা অঞ্চল থেকে, কেউ জানে না কোন্ কোন্ জায়গা থেকে, ভাগ্যান্বেষী নানা জাতের মানুষ এশিয়া কিংবা আফ্রিকা থেকে (নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে) সুপ্রাচীন কালে একের পর এক প্রায় মিছিলের আকারে গ্রীক উপদ্বীপে উপনীত হয়েছিল! ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই জাতিগুলো এশিয়া মাইনর থেকে, ঈজিয়ান সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে অথবা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকেই আগত। তারা ছিল সমুদ্রবিহারী এবং উপনিবেশ স্থাপনকারী। এইসব মিশ্র জাতিই গ্রীক জাতির পূর্বপুরুষ। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐক্যবোধ গ্রীক জাতি গঠনের সহায় হয়েছিল। এক হাজার খ্রীস্ট পূর্বাব্দ এই জাতির উষাকাল বলা চলে।

এই মিশ্র জাতিসমূহ নানা ভাষাভাষী হলেও কালক্রমে এদের মধ্যে তিনটি কথ্যভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যথা : আটিক, ইয়োনিক ও সেরিক। হোমার ছিলেন এই গ্রীক জাতির মহান আদি কবি। তাঁর প্রসিদ্ধ 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটি ইয়োনিক উপভাষায় আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ নবম-অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল বারশত থেকে এগারশত খ্রীঃ পূঃ কালের এক এশীয় রাজশক্তি, অর্থাৎ ট্রয়-ফ্রিজিয়ানদের সঙ্গে আকাইয়ান যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিগ্রহ। এই মহাকাব্য দুটিতেই গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম রূপ রক্ষিত আছে। পরবর্তী গদ্যসাহিত্য প্রধানতঃ আটিক উপভাষায় রচিত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেক লেখ্ আবিষ্কৃত হয়েছে। এথেন্সের গৌরবের যুগে আটিক উপভাষায় অমূল্য নাটক

ও গদ্য গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছিল। গ্রীক সাহিত্যের মত ঐশ্বর্যশালী প্রাচীন সাহিত্য ইয়োরোপে আর কোথাও ছিল না। প্রাচীন গ্রীক বা হেলেনীয় জাতি গড়ে ওঠে খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে। সমুদ্র-বাণিজ্য ছিল এদের প্রধান অবলম্বন। এই জাতির নগরগুলো গড়ে উঠেছিল মিলেটাস নগরকে কেন্দ্র করে এশিয়া মাইনর-এর সমুদ্র উপকূলে, গ্রীক উপদ্বীপে, উত্তর আফ্রিকার সমুদ্র তীরবর্তী সিরীনকে (Cyrene) কেন্দ্র করে, গলের (প্রাচীন ফ্রান্স) তীরে প্রসিলিয়া (বর্তমান মার্সিলিস) এবং সিসিলির কূলবর্তী সাইরাকুজ-এ। কৃষ্ণ সাগরের কূলে কূলেও এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেও গ্রীক বা হেলেনীয় সভ্যতার মর্মকেন্দ্র ছিল এশিয়া মাইনর-এর সাগরতীরে। শিল্পকলা, দর্শনচর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল মিলেটাস। এই যুগের গ্রীক বা হেলেনীয়গণ তাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেছিল মিসর থেকে। দেব হোরাসক্রোড়ে দেবী ইসিস ছিলেন ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে দুই শতাব্দী কালব্যাপী প্রধান আরাধ্যা দেবী।

আলেকজাণ্ডার-এর পূর্ব পর্যন্ত হেলেনিক (গ্রীক) সভ্যতা পূর্ববর্ণিত অঞ্চল-গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আলেকজাণ্ডার-ই প্রথম এই সভ্যতাকে এশিয়া মাইনর থেকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁর পরবর্তীকালে সেল্যু-কাস আন্টিয়ক থেকে বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। আলেকজাণ্ডার মিসর জয় করে তার সাগরতীরে ৩৩২ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর পত্তন করেন। ক্রমে ক্রমে এই বন্দর হয়ে ওঠে মিসরের রাজধানী, গ্রীক ও মিসরীয় সভ্যতার মিলনক্ষেত্র এবং বিশ্ববিশ্রুত শিক্ষাকেন্দ্র। আলেকজাণ্ডার-এর সময় থেকে বহু ভারতীয়দের এই বন্দরে যাতায়াত এবং বসবাস শুরু হয়।

খ্রীস্টজন্মের দুই-তিন শতাব্দী পূর্বেই গ্রীক উপভাষাগুলোর সংমিশ্রণে এক আদর্শ কথ্য ও লেখ্য ভাষার সৃষ্টি হয়। এই ভাষাই গ্রীসের সর্বজনীন কথ্যভাষা হয়ে ওঠে। এই ভাষাকেই কৌনে (Koine) বলে।[১] এ ভাষা থেকেই আধুনিক গ্রীক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন গ্রীকভাষা, সাহিত্য ও দর্শন, বর্তমান ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের মূলে রয়েছে। গ্রীকভাষা সৃষ্টির পূর্বে এশিয়া মাইনরে ও ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে হিত্তি, মিতান্নি, ফ্রিজীয় ও আর্মেনীয় প্রভৃতি ভারত-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

১. কৌনের আভিধানিক অর্থ: প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগে পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে সাধারণ্যে প্রচলিত কথ্য ও লেখ্য গ্রীক ভাষা।—লেখক

গ্রীসে শুধু ভাষা নয়, ভারতীয় দেবদেবীগণও এসেছিলেন তাঁদের উপকথা ও রূপকথা সঙ্গে নিয়ে। অধিকাংশ গ্রীক দেবদেবীর নামের সঙ্গে ভারতীয় দেবদেবীর নামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যেমন, উষা আর্যদের অতি প্রাচীন উপাস্য দেবী। ঋগ্বেদে এই উষা—অর্জুনী, বৃষয়, দহনা, উষা, সরমা, সরণ্যু নামে পরিচিতা। গ্রীসেও এইসব দেবদেবীর নাম যথাক্রমে—অর্জিনারিস, ব্রিষেইস, দফনে, ইয়স, হেলেন, এসিরিস। উষা সম্পর্কে ঋগ্বেদের ১. ১১৫. ২ ঋকে আছে : মানুষ যেমন নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য সেরূপ দীপ্তিমান উষার পশ্চাতে আসছেন। গ্রীকগণের মধ্যেও প্রচলিত একটি আখ্যান আছে—আপেলো (সূর্য) দফনে দেবীর পশ্চাদ্ধাবমান হচ্ছেন। দফনেকে ধরা মাত্র দফনে বিনাশ প্রাপ্ত হলেন, অর্থাৎ সূর্যোদয়ে উষার অবসান ঘটল। গ্রীকদের সুবুদ্ধির দেবী এথেনা, উষার অপর ঋগ্বেদায় নাম অহনারই রূপান্তর মাত্র। এথেনীয়গণ উষার সন্তান। গ্রীক অরফিউস হলো ঋগ্বেদায় ঋভু বা অর্ভুর রূপান্তরিত নাম। গ্রীক গল্পে আছে যে, অরফিউস নামে এক গায়কের স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি তাঁর গানের দ্বারা মৃত্যুদেবতাকে সন্তুষ্ট করে স্ত্রীকে ফিরে পান একটি শর্তে। কিন্তু পথে ঔৎসুক্য বশতঃ স্ত্রীর দিকে শর্ত ভঙ্গ করে তাকানো মাত্র স্ত্রী পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায়। ম্যাকসম্যুলর-এর মতে এ গল্পের অর্থ হলো—সূর্য উষার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই, অর্থাৎ উদয় হলেই, উষা অন্তর্হিত হয়ে যায়। ইন্দ্রের অহিহনন সম্পর্কেও গ্রীক ভাষায় অনুরূপ গল্প আছে। হারকিউলিস অরথ্রসকে হনন করে রিত্রহান হয়েছিলেন। এখানে অরথ্রস হলো—বৃত্র; একেস—অহি। মনীষী ম্যাকসম্যুলর প্রণীত *Chips from A German Workshop* নামক গ্রন্থে এই ধরনের আখ্যানের উল্লেখ আছে। এছাড়া ঋগ্বেদের দ্যৌঃ হলো—গ্রীকদের জিউস (Zeus) এবং প্রমন্থ হলো—প্রমেথিউস।

পরবর্তীকালেও গ্রীসের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ নানাভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। গ্রীক-ঐতিহ্য অনুসারে, থেলস্ (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী), এমপেডোক্লিস (Empedocles, খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) এনাকসাগোরাস (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) ডেমোক্রাটিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিকগণ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রাচ্য দেশে গিয়েছিলেন। ভারতীয় দর্শনের কাছে প্রাচীন গ্রীকদর্শন বহুসাংশে ঋণী। দার্শনিক পিথাগোরাস (খ্রীঃ পূঃ ৫৮০-৫৫০) জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং নিরামিষভোজী ছিলেন। তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন বলেও প্রবাদ আছে। ধর্ম, দর্শন, গণিত প্রভৃতি সম্পর্কে পিথাগোরাস যেসব মতবাদ প্রচার করে গেছেন, সে সবই উক্ত শতাব্দীতে ভারতে

প্রচলিত ছিল। জন্মান্তরবাদ, পঞ্চ মহাভূত তত্ত্ব, জ্যামিতিতে পিথাগোরীয় উপপাদ্য প্রভৃতি ভারতীয় ভাবধারার কাছেই ঋণী। ম্যাকসম্যুলর মনে করেন, সক্রেটিস-এর (খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯) সময়েও ভারতীয় পণ্ডিতগণের যাতায়াত ছিল। শিষ্য আরিস্টটল-এর একজন ছাত্রশিষ্য লিখে গেছেন সক্রেটিস-এর সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিকদের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার কথা। প্লেটো ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্লেটোর 'রিপাব্লিক' গ্রন্থটি ভারতীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার পুনরুক্তি মাত্র (Urwicle)। সংখ্যাতত্ত্ব, অঙ্ক, বীজগণিত, দশমিক, জ্যোতিষ প্রভৃতি ভারতেরই আবিষ্কার। জ্যামিতিতেও গ্রীস ভারতের কাছে ঋণী। ভারতের শুলভ সূত্র (শ্রৌত সূত্রের অংশবিশেষ) অধিকতর পুরাতন। যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণসমূহে জ্যামিতিক নিদর্শন রয়েছে।

শুধু ভারতীয় আর্যগণের সঙ্গে নয়, ইরানীয় আর্যগণের সঙ্গেও গ্রীসের যোগাযোগ ছিল। পারস্য সাম্রাজ্য ছিল গ্রীসের প্রতিবেশী। পারস্য সম্রাট গ্রীস আক্রমণ করেছিলেন। গ্রীক ভাষাও ভারতীয় এবং পারসীক ভাষার কছে ঋণী।

ভারত-ইয়োরোপীয় গ্রীক ভাষা বাইরের থেকে আমদানি করা ভাষা। গ্রীসের গ্রীকভাষী জনগণ হলো আকাইয়ান, যারা আনুমানিক বারশত খ্রীস্ট পূর্বাব্দে গ্রীসে আগমন করে; কিন্তু কোথা থেকে তারা এসেছিল তা বলা শক্ত। সংক্ষেপে বলা যায়, গ্রীসের মানস-জগতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বর্তমান আফগানিস্তান প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক যুগ থেকেই বৃহত্তর ভারতের অংশ ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এদেশের বাহ্লিক, কাম্বোজ, দরদ ও গান্ধার রাজ্যের রাজগণ যোগদান করেছিলেন। বাহ্লিক হলো বর্তমানের বদক্ষাণ। এটি আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত; শতপথ ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ আছে। বাহ্লিকের দক্ষিণে ছিল দরদ ও কাম্বোজ রাজ্য, যা বর্তমানে পামীর নামে পরিচিত। ঋগ্বেদে ঋষি উপমন্যুর উল্লেখ আছে (১.১০২.৯)। কাম্বোজ ঔপমন্যব তাঁর পুত্র; বংশ ব্রাহ্মণে (সামবেদ) এই ঋষির উল্লেখ আছে—বিশিষ্ট বেদ-অধ্যাপক রূপে। গান্ধার রাজ্য ছিল আফগানিস্তান ও ভারতের সীমান্ত জুড়ে অবস্থিত। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সাসানীয়গণ (পারস্যের রাজবংশ) ব্যাকট্রিয়াকে (বর্তমান বলখ বা বদক্ষাণ, হিন্দুকুশের উত্তরে) কাযতঃ ভারতীয় অক্ষস ও অক্সাস নদীকে (আমুদরিয়া) বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের নদী বলেই জানতেন। গ্রীক লেখকগণও ব্যাকট্রিয়াকে ভারতীয় প্রদেশ বলেই মনে করতেন। সেখানে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করতেন।

আফগানিস্তান

হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবিবরণীতেও এই তথ্যই পাওয়া যায়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেল্যুকাসকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর ভারতীয় উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে আরকোশিয়া (কান্দাহার), কাবুল, আসিয়া (হিরাত) ও জেড্রোসিয়া (বেলুচিস্তান) রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। অশোকের সময়ে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হিন্দুকুশ পর্বতের সানুদেশে কপিসা নগরীতে অশোকের বাণী সম্বলিত স্তম্ভ এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। কপিসাতে প্রাকৃত ভাষা চালু ছিল। ২০৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে হিন্দুকুশের দক্ষিণে ভারতীয় সুভগসেনা রাজত্ব করতেন। ঐ সময়েই গ্রীকগণ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং কাবুল ও আরকোশিয়া জয়ের পর পাঞ্জাবেরও কিছু অংশ অধিকার করেছিল। তৎকালীন গ্রীক রাজা ও তৎপুত্র ডেমেট্রিয়াস নিজেদের ভারতীয় রাজা বলে প্রচার করতেন। ডেমেট্রিয়াস ও পরবর্তী গ্রীক রাজগণের মুদ্রার এক পৃষ্ঠে গ্রীক ও অপর পৃষ্ঠে ভারতীয় নিদর্শন অঙ্কিত থাকত। হিন্দুকুশ পর্যন্ত ছিল ভারতীর সংস্কৃতির প্রসার। ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা দ্বিতীয় ক্যাডফিসেস (মহারাজা গোজান) ও তৎপুত্র বাসুদেব-এর মুদ্রায় একদিকে রাজমূর্তি ও অপরদিকে শিবমূর্তি শোভা পেত। বৌদ্ধধর্ম সমগ্র আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছিল। নগরহার-এ (জেলালাবাদ) প্রচুর বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। পাঁচ মাইল দূরে, হাড্ডাতে বুদ্ধদেবের মস্তিষ্কের হাড় সমাধিস্থ হয়েছিল। কোহিস্তানে এক বৌদ্ধ নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। হিউয়েন সাঙ্-এর সময় পর্যন্ত বলখ্-এ (বাহ্লিক) একশত বৌদ্ধ বিহার ও ৩০০০-এর উপর বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। কুনডুজ-এর (আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত) অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধ। বলখ্-এর রাজধানী দ্বিতীয় রাজগৃহ বলে হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেছিলেন। গাজ, বামিয়ান, কপিসা প্রভৃতি বৌদ্ধ নগরী রূপে পরিচিত ছিল। হিন্দুগণও সেখানে পাশাপাশি বসবাস করতেন।

মধ্য এশিয়া

চীন ও ভারত থেকে গ্রীস-রোম পর্যন্ত প্রসারিত সুদীর্ঘ স্থলবাণিজ্য পথের পার্শ্বে মধ্য এশিয়ার অক্সাস (আমুদরিয়া) ও তারিণ নদী এলাকায়, খ্রীস্টজন্মের পূর্বে এবং সমসাময়িক কালে কয়েকটি সমৃদ্ধশালী নগর-কেন্দ্রিক রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই রাজ্যগুলো ছিল আন্তর্জাতিক। কোন কোন নগরের অধিবাসীরা ইরানী ভাষায় কথা বলত, কিন্তু তার বর্ণমালা ও লিপি ছিল সংস্কৃত। গ্রীক শাসকগণই ছিল এইসব রাজ্যের শাসনকর্তা। মধ্য এশিয়ার শিল্প-সাহিত্য ও ভাস্কর্যে ছিল ভারতীয়, গ্রীক ও ইরানী ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ। প্রথম শতাব্দীতেই চীন

সীমান্তের সিথিয়গণ এইসব অঞ্চল অধিকার করেন কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতীয়গণ ঐসব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সেখানে দ্রুত প্রসার লাভ করে। স্থলবাণিজ্য পথের পূর্বপ্রান্তের শেষ নগরী ছিল চীনের তুনহুয়াং (বর্তমান সিনকিয়াং বা চীনাতুর্কীস্তানের লপনর হ্রদের পূর্বপ্রান্তে)। ওখানকার অধিবাসীরা ছিল—চীনা, কুচিয়ান, খোটানি ও ভারতীয়। ওখানেও বৌদ্ধধর্ম ছিল। আর ছিল অজস্র বৌদ্ধগুহা।

চীনের সিনকিয়াং প্রদেশ (পূর্ব নাম চীনা-তুর্কীস্তান) প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল ভারতীয় উপনিবেশ। প্রাচীনতম কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল। এই প্রদেশের মাটি খুঁড়ে, এমন কি ৩০ ফুট মাটির নীচেও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহু নগরীর সন্ধান পেয়েছেন, যার অধিকাংশই ছিল ভারতীয় উপনিবেশ। কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, কুচি, ইয়েনকি (অগ্নিদেশ), কারাসহর প্রভৃতি অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে প্রচুর মূর্তি, বৌদ্ধস্তূপ, বিহার, হিন্দু মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, যা ভারতীয় স্থাপত্যকলারই নিদর্শন। এমন কি বহু বৌদ্ধ পুথিপত্রসহ পাওয়া গেছে সংস্কৃত ও পালি ভাষার পুথিপত্র এবং ব্রাহ্মী ও খারোষ্ঠী লিপিতে, কাঠের ফলকে, চামড়ায় ও রেশম কাপড়ের ওপর লেখা নানা নিদর্শন। এই সব অঞ্চলে যদিও বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রবল তবু সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও ছিলেন। নিয়াত, কুবের, ত্রিমুখ (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) যুক্ত-সীলমোহর এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এনডেরেতে পাওয়া গেছে গণেশের চিত্র। খোটানে ভারতীয় নৃপতিগণ বহুকাল ধরে রাজত্ব করেছিলেন, এর দীর্ঘ তালিকা তিব্বতীয় সাহিত্যে আছে। খোটানের গোমতী বিহারটি মধ্য এশিয়ার মধ্যে ছিল সর্ববৃহৎ। কুচি এবং তুরফান ছিল বহুপূর্বেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের এক বিশেষ কেন্দ্র। পারস্যের সিস্তানে কো-খজা পাহাড়ে বিরাট বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমান রাশিয়ার অঙ্গরাজ্য উরখুর, কিরঘিজ, উজবেক ও তাজিক—এই চারটি রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। সুচে (বর্তমান তকমাক) কাসখেন্দ, সুতৃষ্ণা, (উরটেপে) সমরখন্দ, থোকন্দ, বোখারা, কেশ (বর্তমান স্ট্যালিনগ্রাড) প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধবিহার ছিল। দক্ষিণে উজবেকিস্তানের কারাটেগে পাহাড়ে মাটি খুঁড়ে একটি বৌদ্ধবিহার (খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর) পাওয়া গেছে। সংস্কৃত ভাষায়, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে একটি লেখ্ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এছাড়া ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে ভারতীয় আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন একটু অনুসন্ধান করলেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

পরিশিষ্ট

ঋগ্বেদের রচনাকাল

বিদ্ ধাতুর অর্থ—জানা। যাঁকে জানলে সব জানার শেষ হয়, তিনিই হলেন আর্য ঋষিগণ দ্বারা উদ্দীপ্ত বেদমন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ঋগ্বেদের রচনাকাল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই কথা ওঠে—ঋগ্বেদের রচয়িতা কে বা কারা। বেদ যাদের ধর্মগ্রন্থ. সেই সনাতন ধর্মবিশ্বাসীগণের নিকট বেদ (চার সংহিতা) হলো অপৌরুষেয় ও নিত্য। অর্থাৎ, এই সংহিতা চতুষ্টয়ের কোন রচয়িতা নেই। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বেদেরও সৃষ্টি, যতদিন সৃষ্টি আছে ততদিন বেদও আছে। বৈদিক ঋষিগণ এই মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টা মাত্র। ঋষ্ ধাতুর অর্থ—দর্শন। যিনি মন্ত্র দেখেছিলেন তিনিই ঋষি। ঋষিগণ ছিলেন ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি, মহাপুরুষ, মহাকবি; ধ্যানাবস্থিত তদ্গত চিত্তে তাঁরা সত্য দর্শন করেছিলেন। যে দেবতার কল্যাণে এই সত্য দর্শন করা সম্ভব হয়েছিল, তিনিই প্রকৃত পক্ষে রচয়িতা, আর যিনি দেখলেন এবং প্রথম উচ্চারণ করলেন —তিনিই ঋষি। কিন্তু দেবতা মাত্রেই এক এবং অদ্বিতীয়, পরব্রহ্মের অংশভূত বা বিভূতিস্বরূপ। সুতরাং বেদ প্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হয়েছিল। বেদ হলো ঈশ্বরের বাক্য, এই বিশ্বাসই হিন্দুসাধকদের মধ্যে বদ্ধমূল। হিন্দু-ধর্মগন্থসমূহ, হিন্দু-দর্শন, এই বিশ্বাসকেই প্রচার করে এসেছে। কবি কালিদাস লিখেছিলেন "মন্ত্র কৃতাং", ভবভূতি প্রতিবাদে লিখলেন—'মন্ত্র দৃশাং'। অর্থাৎ, ঋষিরা মন্ত্র রচনা করে নি, দ্রষ্টা মাত্র। ঋগ্বেদে কতকগুলো ঋক বা মন্ত্র নিয়ে একটি সূক্ত রচিত। প্রতিটি সূক্তের শিরোদেশে সেই সূক্তের দেবতা, ঋষি ও ছন্দ—এই তিনের নাম ঘোষণা করা আছে। অনেক সূক্ত পাঠ করলে উপরে প্রদত্ত ঋষিই রচয়িতা বলে অনুমিত হয়। পরমেশ্বর স্বয়ং ঋষিগণের হৃদয়ে অনুভূতি জাগ্রত করেছেন, কণ্ঠে ছন্দোময় বাণী দিয়েছেন সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, তাই হয়তো ঋষিগণকে দ্রষ্টা বলা হয়।

ঋগ্বেদ হলো বহু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ঋক সমূহের সংগৃহীত এক সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র। কথিত আছে, সূক্তদ্রষ্টা পরাশর ঋষির পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শেষবারের মত এই ঋকসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন। মন্ত্রসমূহ ঋক, যজুঃ, সাম—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, সম্ভবতঃ ব্যাসদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই, কারণ ঋগ্বেদের একটি ঋকে (১০.৯০.৯) ঋক সামানি যজুঃ—এই

তিন বেদেরই উল্লেখ আছে। বস্তুতপক্ষে, যজ্ঞে ব্যবহারের জন্যই রচিত হয় এই সকল মন্ত্র। যজ্ঞে যেমন 'হোতা' ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করেন, তেমনি 'উদ্‌গাতা' সামমন্ত্র গান করেন (২.৪৩.১), অধ্বর্যু যজুঃমন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দেন (ঋ ২.১), আর ব্রহ্মা যজ্ঞকার্য তত্ত্বাবধান করেন। ঋগ্বেদে অন্যূন চার ঋত্বিকের উল্লেখ স্থানে স্থানে আছে, কোথাও বা সাতজন ঋত্বিকেরও উল্লেখ আকে (ঋ ২.১.২)। সুতরাং এতেও প্রমাণিত হয় যে, ঋকসমূহের রচনা-সমাপ্তির পূর্বেই যজুঃ ও সাম ছিল। যজ্ঞকে কেন্দ্র করেই তিন প্রকার মন্ত্রের উদ্ভব হয়। অথর্ববেদের উল্লেখও ব্রাহ্মণ-আরণ্যক উপনিষদসমূহে আছে। কথিত আছে, ব্যাসদেব সর্বপ্রথম মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করে যেসকল মন্ত্র যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে প্রয়োজন মত তিনভাগে বিভক্ত করেন, অবশিষ্ট মন্ত্রগুলোকে অথর্ববেদে সংকলন করেন। তৎপূর্বে অথর্ববেদে সংগৃহীত মন্ত্রসমূহ অপর তিন বেদেই স্থান পেয়েছিল। অথর্ববেদের মন্ত্রগুলো যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হয় না বলে তার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। এই বেদের মধ্যেও অতি উচ্চ ভাবসম্বলিত মন্ত্রসমূহ আছে।

সেই প্রাচীন যুগে এরূপ ধারণা ছিল যে, ঋগ্বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণে একটি স্বর বা বর্ণের দুষ্ট প্রয়োগেই যজমানের ভীষণ অনিষ্ট হতে পাবে। সেই কারণে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ যাতে অবিকৃত থাকে, নিখুঁতভাবে সুরক্ষিত হয়, পাঠের মধ্যে কোন বিকৃতি না ঘটে কিম্বা যাতে কোন পরবর্তী রচনা প্রক্ষিপ্ত না হয় অথবা কোন অক্ষর বা শব্দ মাত্রও বাদ না পড়ে, সেজন্য ঋষিগণ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে নানা পন্থার আবিষ্কার করেছিলেন। ঋষি শৌনক তাঁর চরণব্যূহ গ্রন্থে প্রতিটি সংহিতার সূক্ত সংখ্যা, মন্ত্র সংখ্যা ও অক্ষর সংখ্যা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব না-ও হতে পারে মনে করে, তাঁরা বৈদিক মন্ত্রের বিবিধ উপায়ে পাঠের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। এক একটি মন্ত্র একাদশ প্রকারে পাঠের উপায় তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন— তিনটি প্রকৃতি ও আটটি বিকৃতি পাঠ। প্রকৃতি পাঠ হলো : পদ পাঠ, সংহিতা পাঠ, ক্রম পাঠ এবং আটটি বিকৃতি পাঠ হলো : জটা, মালা, শিখা, রেখা, ধ্বজো, দণ্ডো, রথো, ঘন"। ব্রাহ্মণ রচনা সমাপ্তির পূর্বেই ঋগ্বেদ-সংহিতা দৃঢ়ভাবে অপরিবর্তিত আকার ধারণ করেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ দৃঢ়তার সঙ্গে লিখে গেছেন যে, যজুর্বেদের যজুঃগুলোরও বিধানবাক্য পরিবর্তন সম্ভবপর হতে পারে কিন্তু ঋগ্বেদ-সংহিতার একটি বর্ণেরও পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, আচার্য যাস্ক-এর সময় থেকে এ যাবৎকাল ঋগ্বেদের একটি স্বর বা মাত্রারও পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যাস্কের পূর্ববর্তী অবস্থা জানবার উপায় নেই। সম্ভবতঃ শতপথ

ব্রাহ্মণের উক্তিই সত্য। সেই যুগে লিখিত ভাষা না থাকলে এত প্রকার পাঠের ব্যবস্থা মুখে মুখে রক্ষা করা অসম্ভব ছিল।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত ঋষিগণের অথবা রাজগণের কাল-নির্ণয় করতে পারলেই ঋগ্বেদ রচনার কাল-নির্ণয় সম্ভবপর হয়। কিন্তু উপরোক্ত ঋষিগণের বা তৎকালীন রাজগণের বংশ-পরিচয়, কিংবা তাঁদের সময়কাল অথবা তাঁদের বসতিস্থলের কোন বিবরণ কেবলমাত্র বেদ পাঠে জানা যায় না। কোন কোন স্থলে পিতৃ-নাম অথবা গোত্রনাম দেওয়া আছে মাত্র। বিশেষ বিশেষ স্থলে কে কার সম-সাময়িক তারও সামান্য উল্লেখ আছে। সূক্তদ্রষ্টা বা রচয়িতাগণের মধ্যে অনেক রাজার নাম লক্ষণীয়। এই রাজগণ রাজর্ষি ছিলেন। রাজার পুত্র ঋষি, আবার ঋষির পুত্র রাজা, দুই-ই ছিল। চারিবর্ণে ভেদ তখনো গড়ে ওঠেনি। সূক্তরচয়িতা ঋষিগণ সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। একমাত্র দশম মণ্ডলেই সূক্তরচয়িতা অথবা দ্রষ্টাঋষির সংখ্যা হলো ১৩৩ জন। এতদ্ব্যতীত সূক্তগুলোর মধ্যে অনেক ঋষির নাম উল্লেখ করা আছে। অনেক রাজার নামও আছে; তাঁরা নিজেরাই ছিলেন হয় সূক্তরচয়িতা, যজ্ঞে যজমান অথবা দাতা। আর রয়েছে তৎকালে প্রচলিত ছোট ছোট কিম্বদন্তী, আখ্যায়ন, রূপকথা, ইতিকথার ইঙ্গিত, বিশেষ করে নাসত্য স্তুতিতে। এ সবের পরিচয় বা ইতিহাস জানতে হলে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রাদি, পুরাণসমূহ, রামায়ণ, মহাভারত একযোগে পাঠ ও গবেষণা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বেদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হলে পুরাণ অবশ্যপাঠ্য। এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই ব্যাসদেব খুব সম্ভবতঃ বেদ সমূহ সংহিতাকারে প্রকাশ করার পরই তৎকালীন প্রচলিত পুরাণকথা সমূহ একত্র করে পুরাণ-সংহিতা সংকলন করেছিলেন। এই পুরাণ-সংহিতাকে অবলম্বন করেই তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুরাণ রচনা করতে থাকেন।

দুঃখের বিষয়, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং তাঁদের অনুসরণকারী অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ, পুরাণগুলোকে কোন গুরুত্বই দেননি। তাঁরা পুরাণ-কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে করেননি। অথচ আমরা দেখতে পাই, বৈদিক সাহিত্য ও ভারতীয় প্রাজ্ঞজন পুরাণকে অতি উচ্চাসন দিয়েছিলেন। বৈদিককালে 'পুরাণ' গ্রন্থ ছিল। অথর্ববেদে দেখতে পাই—ঋক, সাম, ছন্দ যজুঃ মন্ত্রগুলো পুরাণ আখ্যানের সঙ্গে সেই ব্রহ্মা "থেকে লাভ হয়েছে" (অ ১১. ৪. ৩-৫)। ছান্দোগ্য উপনিষদ ইতিহাস পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলে আখ্যা দিয়েছেন (৭.১.৪)। উক্ত উপনিষদের মতে—ইতিহাস-পুরাণ হলো ফুল আর অথর্ববেদের মন্ত্রগুলো মৌমাছি। বড় বড় যজ্ঞে ঋষিগণ বিশ্রামকালে সূতমুখে পুরাণকথা

শুনতেন। সূতগণ পুরাণ-প্রবক্তা ছিলেন। অমিত তেজ দেবতা, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য মহাত্মাগণের বংশবৃত্তান্ত জেনে তা ধারণ করে রাখাই ছিল সূত-এর স্বধর্ম। অতি উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণগণের মধ্য থেকেই সূতগণের সৃষ্টি হতো। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বহুস্থলে সূতকে সত্যব্রত পরায়ণ, অতি বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্য তাঁর অর্থ-শাস্ত্রে ইতিহাস-পুরাণকে বেদ আখ্যা দিয়েছিলেন এবং রাজগণকে প্রতিদিন অপরাহ্নে ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণের জন্য পৌরাণিক সূত এবং মাগধগণকে উপযুক্ত মাসিক বেতন দিয়ে নিযুক্ত রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সূতগণের কর্তব্য ছিল —যেরূপ দেখবেন ও শুনবেন, অবিকল সেরূপই বর্ণনা করবেন। পুরাণকার যেরূপ শুনেছেন, সেরূপই বিনাবিচারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

"স এবমুক্তো মুনিভিঃ সূতো বুদ্ধিমতা বরঃ
আচচক্ষে যথাবৃত্তং যথাদৃষ্টং যথা শ্রুতম্ ॥ (বায়ু)

অর্থাৎ, "মুনিগণ কর্তৃক এই প্রকার কথিত হলে পর, বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূত, যথাদৃষ্ট ও শ্রুত, যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে লাগলেন।"

এই কারণেই সকল পুরাণে সব বিষয়ে ঐক্য নেই। মহাভারতে পুরুরাজ-বংশের দুটি বংশাবলী প্রদত্ত আছে, পার্থক্য আছে। এই সব বর্ণনা থেকে সত্য উদ্ধার করাই পুরাণ ব্যাখ্যাকারের কাজ ; পুরাণকার স্বয়ং এ বিষয়ে নিরপেক্ষ।

রাজগণের সভায় একজন করে মাগধ থাকতেন ; যাঁদের কাজ ছিল নিজ নিজ প্রভু-রাজগণের বংশ ও কীর্তিকলাপের বিবরণ রক্ষা করা। সূতগণ এদের কাছ থেকে সমসাময়িক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতেন। সূতগণ সকল রাজারই বৃত্তান্ত জানতেন। পরম্পরাগত সূতকাহিনী ঋষিগণ কর্তৃক গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়ে পুরাণ নাম ধারণ করত। বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যায় সূত ও মাগধ—দুয়েরই উপ-স্থিতির উল্লেখ আছে।

পুরাণসমূহ পাঁচটি লক্ষণযুক্ত—"সর্গশ্চ, প্রতিসর্গশ্চ, বংশো মন্বন্তরাণিচ বংশা-নুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্" (বায়ু ৪/১০)। অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয়, বিশিষ্ট রাজা-ঋষি, দেবতা ও দৈত্য প্রভৃতির বংশবিবরণ, বিভিন্ন বংশীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ ও মন্বন্তর বর্ণনা (মনুকাল—কালনির্দেশের বিশেষ সংকেত—সকল প্রকার কাল পরিমাপ)—পুরাণ সমূহের এই পঞ্চ লক্ষণ।

অনেকে পুরাণের ভাষা বিচার করে এর প্রাচীনত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। পুরাণকে মানুষের সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় করার আশায়, পুরাণ-কর্তাগণ যুগে যুগে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষানুসরণে পুরাণের ভাষা সংস্কার করতেন। তা সত্ত্বেও পুরাণের

প্রাচীন সংগ্রহকারের ভাষা যে একেবারে নেই, তা নয়। যযাতি-গাথা এবং উশনা কবির ধ্রুব সম্পর্কিত গাথাও পুরাণে আছে। প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ পুরাণে আর্ষ প্রয়োগের অপ্রতুলতা নেই; "পুরাতনস্ত কল্পস্ত পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ" (মৎস্ত)। পণ্ডিতগণ পুরাণসমূহকে পুরাকালীন ইতিবৃত্ত বলেই অবগত আছেন।

পুরাণগুলোতে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জন আছে। এগুলো পুরাণকারের ইচ্ছাকৃত। প্রত্যেকটি অতিরঞ্জিত বিবরণের অন্তরালে কোন নির্দিষ্ট ঘটনার নির্দেশ আছে। এই অতিরঞ্জন এতই পরিস্ফুট যে, তদ্দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা নেই। রাম কত বৎসর বয়সে বিবাহ করলেন, বনগমন করলেন, বন থেকে প্রত্যাগমন করলেন, সিংহাসনে আরোহণ করলেন, এসব বর্ণনায় অবিশ্বাস্ত কিছু নেই; কিন্তু তিনি একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করে স্বর্গাধিরোহণ করলেন, কার্তবীর্যার্জুন ৮০,০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন; অলর্ক ৬১ হাজার বৎসর রাজত্ব করেছিলেন, এ সকল ক্ষেত্রে 'সহস্র' হলো উপলক্ষণের প্রয়োগ, সম্মানিত ব্যক্তির আয়ুষ্কাল বা রাজত্বকাল অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে। 'সহস্র' বাদ দিলেই প্রকৃত বৎসর পাওয়া যায়। পুরাণকার স্থলে স্থলে অলৌকিকত্ব আরোপের চেষ্টাও করেছেন। সাধারণ ধর্মবুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত নয়। ধর্মের মূল অলৌকিক। ঋষি পৌরাণিক বিবরণকে ধর্মগ্রাহ্য রূপ দিলেন। ফলে, পুরাণে অতিরঞ্জিত ও অতিপ্রাকৃত প্রস্তাব এলো এবং পুরাণ ধর্মশাস্ত্র রূপে পরিগণিত হলো। পুরাণকার জানতেন, জনসাধারণ যদি পুরাণে আগ্রহান্বিত হয়, তাহলেই পুরাণ কালের হাত থেকে রক্ষা পাবে। পুরাণে আছে রূপকের বাহুল্য। কারণ জনসাধারণের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্ত পুরাণ রচিত হয়েছিল।

পুরাণ বেদ সম্মিতম্। পুরাণের সঙ্গে বেদের কোন বিরোধ নেই। পুরাণ বেদকে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করেছে। পুরাণকার বলেন, যে পুরাণ জানে না তার কাছে বেদ প্রহৃত হবার আশঙ্কা আছে (বায়ু ৬/২০০)। সেকালে কীর্তিসাদৃশ্য, নামসাদৃশ্য কল্পিত হতো। আবার শ্রুতিপ্রমাদ হেতু একই রাজার নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন প্রকার আছে। পুরাণসমূহে প্রাচীন-অর্বাচীন সকল সময়েরই ছাপ আছে। পরম্পরাপ্রাপ্ত ইতিবৃত্তে এরূপই থাকবে। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের যোগ হলে প্রাচীন অংশের প্রাচীনত্ব বা বিশুদ্ধতা লয় পাবে কেন?

এ কথা সত্য, আপাতদৃষ্টিতে ঋষি ও রাজগণের বংশানুচরিত রচনায় পুরাণসমূহে অনেক ক্ষেত্রে কোন ঐক্য নেই। সেকালে একই রাজার বিভিন্ন নাম ছিল। একই বংশে একই নামে একাধিক রাজার নাম পাওয়া যায়। একই নামে বিভিন্ন বংশে ভিন্ন ভিন্ন রাজা দেখা যায়। ঋষিরা কোথাও বংশ বা পিতৃনামে, কোথাও

গোত্রনামে পরিচিত। এই সব কারণে অসামঞ্জস্য আছে। কিন্তু বেদ-সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ-উপনিষদসমূহ, বিভিন্ন পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি একত্র বিচার করলে সামঞ্জস্য আনয়ন করা সম্ভব। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি এফ. ই. পার্জিটার সাহেব, ভারতীয় ঐতিহাসিক এ. ডি. পুসলকার এবং রমেশ-চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতগণ বৈবস্বত মনু থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় ঐতিহ্য-বাহী প্রাচীন ইতিবৃত্তকে বহু গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করেছেন। রাজগণের মোটামুটি বংশ-তালিকাও তাতে পাওয়া যায়।

বৈবস্বত মনুর পর থেকে দুটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একটি সূর্যবংশ—মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু থেকে; অপরটি চন্দ্রবংশ—মনুকন্যা ইলার (স্বামী সোম) পুত্র পুরুরবা থেকে। ঋগ্বেদে রাজা ইক্ষ্বাকু এবং রাজা পুরুরবা দুয়েরই উল্লেখ আছে; আছে তাঁদেরই সন্তানসন্ততি বহু রাজগণের নাম। চন্দ্র-বংশের বহু শাখা-প্রশাখার নামও ঋগ্বেদে আছে। মহাভারতখ্যাত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু রাজাদ্বয়ের পিতামহ শান্তনু রাজার যজ্ঞের উল্লেখও ঋগ্বেদে পাই। দ্রুপদ রাজার প্রপিতামহের নামও ঋগ্বেদে আছে। বৈবস্বত মনু থেকে শান্তনু হচ্ছেন —একানব্বই পুরুষ। শান্তনুর পূর্বপুরুষ রাজা সুরথ, জহ্নু, কুরু প্রভৃতির নামও ঋগ্বেদে আছে। ব্যাসদেবের পিতা পরাশর ঋষি হলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালের ঋষি, অসিত দেবল হলেন ঋগ্বেদের সূক্ত রচয়িতা; নানা কারণেই ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ রচনার কাজ অব্যাহত ছিল—রাজা শান্তনুর কাল পর্যন্ত; আর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সূক্ত রচনার সূত্রপাত হয়েছিল বৈবস্বত মনু থেকে। রাজা শান্তনুর পৌত্র-প্রপৌত্রের সময় ঘটে বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ঋগ্বেদ কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল তা জানতে হলে বৈবস্বত মনুর রাজত্বকাল ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে পুরাণসমূহে। তেরটি পুরাণে সূর্যবংশের রাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত মহাভারতে উল্লিখিত আছে এবং তৎকালীন সাহিত্যেও এর কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈবস্বত মনু থেকে কুরুক্ষেত্র বা ভারতযুদ্ধ পর্যন্ত রাজগণের তালিকা স্থির হলেও কে কোন্ সময়ে কত বৎসর রাজত্ব করেছেন, তার কালনির্দেশ করতে না পারলে সত্যকাহিনীরও ঐতিবৃত্তিক মূল্য থাকে না। কালনির্দেশ করতে গিয়ে ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভারতীয় ঐতি-হাসিকগণ, পুরাণসমূহে প্রদত্ত কালগণনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা মত রাজগণের গড় পর্যায়কাল কল্পনা করে নিয়েছেন। পার্জিটার সাহেব পুরাণ-

সমূহের মতানৈক্যের সুযোগ নিয়ে প্রতি রাজার রাজত্বের গড় পর্যায়কাল সম্পূর্ণ খামখেয়ালি বশে ১৮ বৎসর অনুমান করে কাল নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ৯৩০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এবং বৈবস্বত মনুর রাজ্যারোহণ (৯৫ জন রাজা × ১৮) ২৬৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। পুরাণকারগণের অনুসরণে পার্জিটার সাহেব মহাপদ্মনন্দের রাজ্যারোহণ বৎসরকে 'কালবিন্দু' স্থির করে, স্মরণাতীত কালের রাজগণের (ভারতের) কাল গণনা করেছেন। তাঁর মতে, মহাপদ্মনন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন ৩৮২ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ নন্দের রাজত্ব আনুমানিক ৪১৩ খ্রীস্টপূর্বে শুরু হয়েছিল বলে তাঁর রচিত ভারতের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর 'বৈদিক ভারত' পুস্তকে নন্দের রাজত্বকাল সম্পর্কে পার্জিটারের মতকেই অনুসরণ করেছেন। কেবলমাত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালনির্ণয়ে, বিষ্ণু পুরাণ প্রদত্ত নক্ষত্রযুগ মানদণ্ডে নির্ণীত মহাপদ্মনন্দের সিংহাসনে অধিরোহণ থেকে ভারতযুদ্ধ পর্যন্ত সমষ্টিকাল ১০১৫ বৎসর মেনে নিয়েছেন। আর ভারতযুদ্ধ কালটাকে মেনে নিয়েছেন ১৪০০ খ্রীস্টপূর্বের সামান্য অগ্রপশ্চাতে। তিনি বৈবস্বত মনুকাল স্থির করেছেন, পার্জিটারের গড় রাজত্বকাল ১৮ বৎসর ধরে (১৪০০ + ৯৫ × ১৮) ৩১১০ খ্রীঃ পূঃ। এতদ্বারা তিনি পুরাণ ও পার্জিটার উভয়কেই সম্মান দেখিয়েছেন, কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন যুক্তিকে; তিনি অবশ্য ভারতযুদ্ধের কাল সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত নন। এই যুদ্ধ তাঁর মতে, ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে হতে পারে। ১৪০০-এর পূর্বে হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে অবশ্য কিছু লেখেননি। এই প্রসঙ্গে পুরাণসমূহে বর্ণিত আর একটি বিশেষ কালবিন্দুরও তিনি উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ যে সময় থেকে কল্যব্দের সূত্রপাত হয়েছিল সেই কালবিন্দু। পঞ্জিকা সমূহেও প্রতি বৎসর এই কল্যব্দের গণনা চলে আসছে। বর্তমান বৎসরের পঞ্জিকায়, 'কলে র্গতাব্দাঃ' দেওয়া আছে ৫০৮৪। এই অঙ্ক থেকে বর্তমান ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দ বাদ দিলে পাওয়া যায় ৩১০১ খ্রীঃ পূঃ। এটিই তাঁর মতে জ্যোতিষিক গণনার পক্ষে সুবিধাজনক, কলিযুগের কালমুখ, বৈবস্বত মনুর রাজ্যকালারম্ভ এবং প্রলয় বৎসর, যার বর্ণনা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে (শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত প্রভৃতিতে), ব্যাবিলোনীয় ও য়িহুদীদের প্রাচীন গাথায় আমরা পাই। মেসোপটেমিয়ার বন্যা নাকি ঐ সালেই হয়েছিল। এ সম্পর্কে আলোচনা ইতিপূর্বেই এ-গ্রন্থে করা হয়েছে। ৩১০১ বৎসরটি যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভারতের রাজগণের কাল-নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে, ভারতীয় পুরাণকারগণ যেভাবে যুগ-কল্পনা

করেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রয়োজন। পুরাণের ভিত্তি ও বর্ণনার ধারা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।

দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ তৃতীয় নয়নে দেখেছিলেন, অনাদি অনন্তকাল ধরে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আবর্তন চলছে। গণনার মানদণ্ড তাঁরা সেই দৃষ্টিতেই স্থির করেছিলেন। পুরাণসমূহে তাই মোটামুটি তিন প্রকারের যুগমানের কল্পনা দেখতে পাই। এক, দৈবমান—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রভৃতি দৈবগণনার ব্যাপারে এবং জ্যোতিষিক প্রয়োজনে; পঞ্জিকাসমূহে এই মান অনুযায়ী গণনা আছে। এই দৈবগণনায় বর্তমানে শ্বেতবরাহ কল্প চলছে। কল্পকাল ৪৩২ কোটি বৎসর। বর্তমানে কলিযুগ (৪,৩২,০০০ বৎসর) চলছে, যার ৫০৮৪ বৎসর গত হয়েছে বলে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিবৃত্ত রচনায় এই দৈবমানের সত্যি কোন প্রয়োজন নেই।

পুরাণকৃত কালনির্ণয়

রাজাগণের রাজ্যকাল স্থিরীকরণের ব্যাপারে পৈত্র যুগমানই প্রশস্ত। পুরাণসমূহে মৃত পূর্বপুরুষগণকে ঋগ্বেদের অনুকরণে পিতৃপুরুষ বলা হয়েছে। পিতৃগণের কালনির্ণয়ে যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় তাই পৈত্র যুগমান। পৈত্র মানদণ্ড ও লঘুমানব মানদণ্ড দুই-ই নৈসর্গিক, জ্যোতিষিক কল্পনা। লঘু মানবমান—চতুর্মাস বিকল্পিতা; অর্থাৎ, চার প্রকার মাস দ্বারা বিভক্ত এবং সকল প্রকার কালবিভাগ এই মান দ্বারাই নিরূপিত হয়। চার প্রকার মাস হলো—সাবন, সৌর, চান্দ্র ও নক্ষত্র। সাবন মাসে ৩০ সূর্যোদয়; সৌর মাসে সূর্য এক রাশি গমন করেন; চান্দ্র মাস হলো শুক্ল প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত কাল এবং নক্ষত্র মাস চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগ কাল। এই চারপ্রকার মাসমানে পাঁচ বৎসরই লঘুতম। দেখা গেছে—৫ সৌর বৎসরে ৬০ সৌর মাস, ৬১ সাবন মাস, ৬২ চান্দ্র মাস ও ৬৭ নক্ষত্র মাস পূর্ণ হয়। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন কোন কালবিন্দু নেই যেখানে ঐ চারপ্রকার মাসই পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্ত হতে পারে। মাসই এ যুগের একক বা মান—তা পরিস্ফুট।

তিনটি যুগমান: দৈব, পৈত্র ও লঘু মানব

আবার ৩৫৫ দিনে এক চান্দ্র বৎসর এবং ৩৬৬ দিনে এক সৌর বৎসর পূর্ণ হয়। সুতরাং ৩৫৫ সৌর বৎসরে ৩৬৬ চান্দ্র বৎসর পূর্ণ হয়। চন্দ্র ও সূর্যই প্রধান জ্যোতিষ্ক। এক নির্দিষ্ট দিনেই চান্দ্র ও সৌর বৎসর এবং উপরোক্ত লঘু মানবমান (৫ বৎসরের) আরম্ভ ধরলে দেখা যাবে, ৩৫৫ বৎসরের চান্দ্র ও সৌর বৎসরে ৭১টি (৩৫৫ ÷ ৫) লঘুমানব যুগ। ৩৫৫ বৎসরের এই যুগও নৈসর্গিক যুগকাল। এই যুগকালকে মনুকাল বলে কল্পনা করা হয়েছে। এক মনুতে ৭১

লঘু মানবযুগ। এক হাজার লঘু মানবযুগে এক লৌকিক কল্প। অর্থাৎ, ৫০০০ বৎসর (কল্পনায় যা খাড়া করা হয়েছে তাই কল্প) মনুকালকে (৩৫৫ বৎসর) এক কল্পকালে খাপ খাওয়ানো প্রয়োজন। দেখা গেল ১৪ মনু ও ৩০ বৎসরে এক কল্প হয়। প্রত্যেকটি মনুর পরে ২ বৎসর করে সন্ধিকাল ধরলে এবং প্রথম মনুর আরম্ভে ২ বৎসরের এক সন্ধিকাল ধরলে মোট পনের সন্ধি ধরা হয়। সূর্যসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ১৪ মনু ও পনের সন্ধিতে এক লৌকিক মনুকল্প। এই মনুকল্প নৈসর্গিক যুগ নয়। পঞ্চবর্ষ ভিত্তিক যুগের মান-মাস পূর্বেই বলা হয়েছে। মনুকল্পকে মাস-মানে আনলে ৬০,০০০ (৫০০০ × ১২) মাস, তাকে ৩০ দিয়ে ভাগ করলে ২০০০ মাস। প্রত্যেক ভাগকে (৬০০০০ ÷ ৩০ = ২০০০ মাস) পৈত্র যুগ বলা হয়। এক মনুকল্পে ৩০ পৈত্র যুগ বা পিতৃ মানদণ্ড। মনু হলো বিশেষ কাল বিভাগের নাম। এই কল্প মানদণ্ডেই গণনা শুরু হয়েছে প্রাচীন ভারতের প্রথম কিংবদন্তীর রাজা স্বায়ম্ভুব মনু থেকে। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশের ইতিবৃত্ত পুরাণসমূহে আছে। মনুবিভাগ কাল্পনিক, তাই মনুগণকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়েছে। অধিকাংশ মনুকালের নাম, কোন সমসাময়িক ব্যক্তিবিশেষের নাম থেকে এসেছে, যথা: (১) স্বায়ম্ভুব (২) স্বরোচিত (৩) ঔত্তমি (৪) তামস (৫) রৈবত (৬) চাক্ষুস (৭) বৈবস্বতমনু (৮) সাবর্ণি।

বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যেই মনুকল্প কালের (৫ হাজার বৎসরের) অন্তর্বিভাগও কল্পিত হয়েছে। কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারটি অন্তর্বিভাগ ‘ধর্মযুগ’ বলে কথিত। শুক্ল যজুর্বেদে এই ধর্মযুগের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই চারটি বিভাগ অসমান। কৃত বা সত্য ৪ হলে ত্রেতা ৩, দ্বাপর ২ এবং কলি ১। অর্থাৎ, ৪ : ৩ : ২ : ১ এই হারে চার ধর্মের যুগমান বা মনুকল্প কাল। এই চারটি যুগবিভাগ ধর্মাবস্থা জ্ঞাপক। এগুলোর এক-একটি বিভাগকেই ধর্মযুগ বলে। কৃত-এর পর ত্রেতা, তৎপর দ্বাপর, সর্বশেষে কলি। এই বিভাগগুলোর আবর্তন চলতে থাকে। ঋগ্বেদে তিন যুগের উল্লেখ আছে। ৫ বৎসরের লঘু মানবযুগকেও এরূপ চারটি ধর্মযুগে ভাগ করা চলে, ক্রমান্বয়ে—২৪, ১৮, ১২ ও ছয়মাস হয়। এত অল্পকাল অন্তর ধর্মাবস্থা পরিবর্তিত হয় না। তাই পাঁচ হাজার বৎসরের কল্পকালকেই ধর্মযুগে ভাগ করা হয়েছে। এরূপ ভাগ দৈবমানেও আছে, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এক মনুকল্পে ৬০০০০ মাস; ধর্মযুগে তা ভাগ করলে দাঁড়ায়: সত্য—২৪০০০ মাস বা ২০০০ বৎসর বা ১২ পৈত্র যুগ (২০০০ মাসে)। ত্রেতা যুগ—১৮০০০ মাস, বা নয় পৈত্র যুগ বা ১৫০০ বৎসর; তৎপর দ্বাপর যুগ—১২০০০ মাস বা ১০০০ বৎসর বা ৬

চার ধর্মযুগ

পৈত্র যুগ ; শেষ কলিযুগ—৬০০০ মাস বা ৫০০ বৎসর বা ৩ পৈত্র যুগ। পৈত্র যুগ মানে সত্য—১২ পর্যন্ত, তৎপর ত্রেতা—২১ পর্যন্ত, দ্বাপর ২৭ পর্যন্ত এবং কলি ২৮ থেকে ৩০ পর্যন্ত। মনুকল্পমানে সন্ধি-কল্পনা প্রয়োজন হয়েছিল (১৪ মনু ১৫ সন্ধি)। ধর্মযুগেও সন্ধ্যা-কল্পনা আবশ্যক হয়। ধর্মযুগ ক্রমশঃ আসে, হঠাৎ পরিবর্তন নয়। এই সন্ধ্যাকল্পনা খুবই চিত্তাকর্ষক : সত্যযুগ সন্ধ্যা, তৎপর সত্য যুগ, তৎপর সত্য সন্ধ্যাংশ ; ত্রেতা সন্ধ্যা, তৎপর ত্রেতাযুগ, তৎপর ত্রেতা সন্ধ্যাংশ ; এভাবেই আসে দ্বাপর এবং কলি। এই ভাগ হয় নিম্নলিখিত ভাবে : কৃত বা সত্য ২৪০০০ মাস=২.৪ ক (১ ক=১০,০০০ মাস)=২ ক+$\frac{২}{১০}$ ক+$\frac{২}{১০}$ ক অর্থাৎ, ২০০০ মাস কৃত সন্ধ্যা+২০,০০০ মাস কৃত+২০০০ মাস কৃত সন্ধ্যাংশ ; এভাবে ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিকেও ভাগ করতে হয় ; তাতে দাঁড়ায়, ত্রেতা—৪০০০ মাস সন্ধ্যা+১০,০০০ মাস ত্রেতা ও ৪০০০ মাস ত্রেতা সন্ধ্যাংশ। দ্বাপর—১০০০ মাস দ্বাপর সন্ধ্যা+১০,০০০ মাস দ্বাপর ও ১০০০ মাস দ্বাপর সন্ধ্যাংশ। তেমনি কলি—৬০০ মাস=.৬ক=$\frac{৫}{১০০}$ক+.৫ক+$\frac{৫}{১০০}$ক=৫০০ মাস (ক=১০,০০০ মাস ধরে) কলি সন্ধ্যা+৫০০০ মাস কলি+৫০০ মাস কলি সন্ধ্যাংশ।

এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষ পর্যন্ত যে কাল গত হয় তাকেই পর্যায়কাল বলে। এক পুরুষের জন্মকাল থেকে পরবর্তী পুরুষের জন্মকালের ব্যবধানই পর্যায়। জন্মের পরিবর্তে উভয়েরই রাজ্যারোহণ বৎসরও ধরা চলে। জন্মকাল থেকে জন্মকালের ব্যবধানই পর্যায় নিরূপণে প্রশস্ত। পর্যায়কাল লব্ধ গণনা স্থূল নির্দেশ মাত্র। কতিপয় রাজগণের রাজত্বকাল বা জন্মকাল জানা থাকলে তাদের গড় পর্যায়কাল নিরূপণ করা যায়, যথা : মোগল পর্যায়কাল বাবর থেকে বাহাদুর শা—সাত পুরুষ। বাবরের জন্ম ১৪৪৮ খ্রীঃ অঃ, বাহাদুর শা ১৬৪৩ খ্রীঃ অঃ, উভয়ের মধ্যে অন্তর ৬ পর্যায়কাল, মোট ১৬০ বৎসর। অতএব এক পর্যায়কাল প্রায় ২৬ বৎসর (১৬০÷৬) এই বংশে পিতাপুত্র অক্ষুণ্ণ আছে। হুমায়ুন থেকে ঔরঙ্গজেব ৫ পুরুষ। প্রথমের রাজ্যারম্ভ থেকে পঞ্চমের রাজ্যশেষ (১৫৩০ খ্রীঃ—১৭০৭ খ্রীঃ) ১৭৭ বৎসর ; গড় রাজ্যকাল=১৭৭÷৫=৩৫.৪ বৎসর। গড় রাজ্যকাল ও গড় পর্যায়কাল এক নয়।

পর্যায়কাল

প্রথম রাজা, দ্বিতীয় রাজা, তৃতীয় রাজা এই সংখ্যা গণনাই (১, ২, ৩, ৪) হলো পর্যায় সংখ্যা। পুরাণে, প্রাচীন ভারতের রাজগণের গণনায় মনুকল্প মানদণ্ডে, প্রথম রাজা স্বায়ম্ভুব মনু থেকেই রাজগণের পর্যায় সংখ্যা গণনার সূত্রপাত হয়েছিল। সপ্তম মনু বৈবস্বত মনুর পর্যায় সংখ্যা ৮৭। প্রিয়ব্রত বংশের ৪৯ পর্যায়ের রাজা প্রচেতাগণের পর ৮৩ পর্যায়

পর্যায় সংখ্যা

পর্যন্ত কোন রাজার নাম নেই। পরবর্তী রাজা হলেন ৮৪ পর্যায় সংখ্যায় দক্ষ রাজা। প্রচেতাগণের পর ৯০৭ বৎসর কাল অরাজকতা ছিল।

পুরাণে স্বায়ম্ভুব মনু থেকে ৭ম মনু বৈবস্বত মনুকাল পর্যন্ত প্রধানতঃ মনুকল্প কাল দ্বারাই কাল নির্দিষ্ট হয়েছে। বৈবস্বত মনু থেকে যুধিষ্ঠির পর্যন্ত ধর্মযুগ ও পৈত্র মানদণ্ড দ্বারা কাল নির্দিষ্ট হয়েছে। যুধিষ্ঠির থেকে অন্ধ্র রাজগণ পর্যন্ত বর্ষমান ও সপ্তর্ষিমান প্রযুক্ত হয়েছে। তৎপরে শুধুমাত্র বর্ষমানদণ্ড চলেছে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে এবং বিভিন্ন নক্ষত্র ধরে কাল গণনাকে সপ্তর্ষিমান বলে। সৌরজ্যোতিষ্ক পরিমণ্ডলটি জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা, চিত্রা প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রমণ্ডলে বিভক্ত। সূর্যের এই ২৭টি নক্ষত্রপথ পরিক্রমা করতে বার মাস সময় লাগে, আর এই পথপরিক্রমায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের লাগে ২৭০০ বৎসর, অর্থাৎ এক নক্ষত্র মহাযুগ। এক একটি নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থিতি প্রায় ১০০ বৎসর। সাতটি পবিত্র বিশিষ্ট ঋষির নামাঙ্কিত সাতটি তারার এক গুচ্ছকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে। সপ্তর্ষির প্রথম দুই নক্ষত্রের (পুলহ ও ক্রতু) মধ্যবিন্দুর দক্ষিণে সমসূত্রে যে নক্ষত্র পাওয়া যায়, সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থিতি সেই নক্ষত্রে। এটিও একটি নৈসর্গিক মান। পৌরাণিক মনুকল্প গণনার আদি বিন্দু ছিল স্বায়ম্ভুব মনু। সেই সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল ছিল দ্বিতীয় নক্ষত্র মূলাতে। প্রথম নক্ষত্র জ্যেষ্ঠা; দ্বিতীয় নামটিও লক্ষণীয়; এটিকে মূল, অর্থাৎ আদি বিন্দু ধরে সপ্তর্ষি মহাযুগকল্প আরম্ভ। কলিযুগ আরম্ভে সপ্তর্ষিমণ্ডল ছিল মঘা নক্ষত্রে। মহাভারত ও পুরাণসমূহের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন ছিল মঘানক্ষত্রে। মঘা হলো বিংশতি সংখ্যক নক্ষত্র। সপ্তর্ষিমণ্ডল মূলা (দ্বিতীয়) থেকে শুরু করে প্রথম পরিক্রমার শেষে দ্বিতীয় পরিক্রমার বিংশতি নক্ষত্রে (মঘা) উপনীত হলে কলিযুগ আরম্ভ হয় এবং দ্বাপর ও কলির অন্তর কাল প্রাপ্ত হলে, অর্থাৎ কলি সন্ধ্যা (৫০০ মাস=৪২ বৎসর প্রায়) গতে স্যমন্ত পঞ্চকে (কুরুক্ষেত্রে) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল (২৬ নক্ষত্র+২০ নক্ষত্রে উপস্থিতি+৪২ বৎসর=২৬০০+১৯০০+৪২= ৪৫৪২ বৎসর গতে মনুকল্পের সূচনা থেকে)

সপ্তর্ষি মানদণ্ড

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলি দ্বাপরোভূৎ
স্যমন্ত পঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ॥"

(মহাভারত, আদি ২/১৫)

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—এই তিন যুগের মোট বৎসর পূর্বের হিসাব মত (২০০০+ ১৫০০+১০০০) ৪৫০০ বৎসর; তারও ৪২ বৎসর গতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। অর্থাৎ,

স্বায়ম্ভুব মনু থেকে ৪৫৪২ বৎসর গতে। স্বায়ম্ভুব মনু থেকে বৈবস্বত মনু ৬ মনু অন্তরে=(৩৫৫×৬+৭ সন্ধি=২১৪৪), অর্থাৎ ২১৪৪ বৎসর পরে। সুতরাং বৈবস্বত মনু থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৪৫৪২—২১৪৪=২৩৯৮ বৎসর গতে। ভারতযুদ্ধের সময়ে পরীক্ষিৎ-এর জন্ম। পুরাণকারগণ দেখিয়েছেন, ভারতযুদ্ধ থেকে, অর্থাৎ পরীক্ষিৎ-এর জন্ম থেকে মহাপদ্মনন্দ-র রাজ্যাভিষেক বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড মতে ১৪১৫ বৎসরের ব্যবধান, আর বায়ু ও মৎস্য পুরাণের মতে ১৪৫০ বৎসরের ব্যবধান। এর কোনটি গ্রাহ্য? নিম্নে শ্লোক দুটি দেওয়া হলো:

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্

এতদ্বর্ষ সহস্রংতু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।" (বিষ্ণু)

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্

এতৎবর্ষ সহস্রংতু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্।" (বায়ু)

এই দুটি শ্লোক রচনার সাদৃশ্য বিস্ময়কর, কেবলমাত্র পার্থক্য 'পঞ্চদশোত্তরম্' এবং 'পঞ্চাশদুত্তরম্'-এ! ভাগবত পুরাণ লিখেছেন, এই পার্থক্য ১১১৫ বৎসর। বিষ্ণু ও ভাগবত উভয়েই পরীক্ষিৎকে মঘা নক্ষত্রে ও নন্দাভিষেককে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে ফেলেছেন। নন্দর মৃত্যুও পূর্বাষাঢ়াতেই। নন্দের রাজত্বকাল ২৮ বৎসর। মঘা থেকে পূর্বাষাঢ়া ১১ নক্ষত্র যুগ, অর্থাৎ ১১০০ বৎসর। পরীক্ষিতের জন্ম কলিসন্ধ্যা ও কলির সন্ধিস্থলে, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বিষ্ণু মতে, কলিসন্ধ্যা ৪২+১০১৫+২৮ বৎসর রাজত্বকাল=১০৮৫; এই মতে নন্দ মৃত্যু অবধি পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রেই থাকে। বায়ু মতে ৪২+১০৫০+২৮=১১২০; সুতরাং এই মতে নন্দের রাজ্যকাল পূর্বাষাঢ়া ছাড়িয়ে যায়।

বায়ু ও মৎস্য মতে (বিষ্ণুতে কোন উল্লেখ নেই) নন্দ থেকে অন্ধ্র রাজত্বের অবসান কাল ৮৩৬ বৎসর। উভয় পুরাণই উল্লেখ করেছেন যে, অন্ধ্রান্ত কাল-এ সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ক্ষয় হয়ে নতুন করে সপ্তর্ষি যুগ আরম্ভ হবে। এই যুগ, নবযুগ—অশ্বিনী নক্ষত্রে আরম্ভ। মঘা থেকে অশ্বিনীর শেষ ১৯০০ বৎসর। বায়ু ও মৎস্য মতে, এই কাল—৪২+১০৫০+৮৩৬=১৯২৮, অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্র পার হয়ে যায়। বিষ্ণু মতে—৪২+১০১৫+৮৩৬=১৮৯৩, অর্থাৎ অন্ধ্র রাজত্বের অবসান কালটি নবযুগের প্রথম মাসের মধ্যেই পড়ে। সুতরাং দুদিক থেকেই বিচার করে মনে হয়—বিষ্ণু মতই প্রামাণিক। অর্থাৎ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় (পরীক্ষিতের জন্মকাল) থেকে মহাপদ্মনন্দের রাজ্যাভিষেক ১০১৫ বৎসরের ব্যবধান। প্রখ্যাত রমেশচন্দ্র মজুমদার এই অঙ্কটিই গ্রহণ করেছেন।

খ্রীস্টাব্দ ধরে কাল নিরূপণ করতে হলে—হয় চন্দ্রগুপ্ত-এর রাজ্যকাল কিংবা কালবিন্দু ধরে অগ্রসর হতে হয়, নতুবা অন্ধ্রান্ত বৎসর ধরে এগোতে হয়। চন্দ্রগুপ্ত ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক। আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন ৩২৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। ৩২৬ কিংবা ৩২৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত (তখনো মগধের রাজা হননি) আলেকজাণ্ডার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুরাণের হিসাব মতে ৩২০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন। পরে নানা রাজ্য অধিকার করে ৩১৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বর্তমান ঐতিহাসিকগণের মতে ৩২২-২৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে শেষ নন্দ রাজাকে নিহত করে চন্দ্রগুপ্ত মগধ অধিকার করেছিলেন। পুরাণসমূহ একমত (বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য) যে, নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের ভয়ে নন্দবংশীয়গণ মগধ ছেড়ে অন্যত্র রাজ্য স্থাপন করে; এদের উচ্ছেদ করতে চন্দ্রগুপ্তর মৎস্য মতে ১২ বৎসর ও বায়ু মতে ১৬ বৎসর লেগেছিল। এই ১২ কিংবা ১৬ বৎসর, নন্দবংশের ১০০ বৎসর রাজত্বকালের অন্তর্ভুক্ত। ৩০৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত-র সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গ্রীকরাজ সেল্যুকাস সন্ধি করেন। অনুমান, এই যুদ্ধে শেষ নন্দবংশীয় রাজা সেল্যুকাস-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মগধ-সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির আশায়। ৩০৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ থেকে ১০০ বৎসর পূর্বে ৪০৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মহাপদ্মনন্দ মগধ অধিকার করেছিলেন, পরে ৪০১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে তার অভিষেক হয়। নন্দের অভিষেক থেকে (৪০১ খ্রীঃ পূঃ) অন্ধ্রান্ত কাল ৮৪৬ বৎসর হলো ৪৩৫ খ্রীস্টাব্দ। অন্ধ্র বংশের ৩০ জন রাজা; ২৭ পর্যায় সংখ্যায় যজ্ঞশ্রী বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তৎকালের চীনা পরিব্রাজকদের মতে ৪০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি অন্ধ্রের রাজা ছিলেন। তৎপর তিন রাজা ৩২ বৎসর রাজত্ব করতে পারেন, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পুরাণ মতে, মগধে নন্দবংশীয়গণ ৮৬ বৎসর (অবশিষ্ট ১৪ বৎসর অন্যত্র), মৌর্যগণ ১৩৭ বৎসর, শুঙ্গগণ ১১২ বৎসর, কন্বগণ ৪৫ বৎসর ও অন্ধ্রগণ ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজার সংখ্যা ৬৩ জন, রাজ্যকাল মোট ৮৩৬ বৎসর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, মহাপদ্ম নন্দ হন প্রথম ভারত-সম্রাট। তৎপূর্বে, সহস্রাধিক বৎসর কালের মধ্যে (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর) আর কোন ভারতীয় রাজা সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি। নন্দ ছিলেন জাতিতে শূদ্র। তৎকালীন ভারতের ক্ষত্রিয় রাজাদের তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালে ভারতে ক্ষত্রিয় রাজত্বের অবসান ঘটে। মনুষ্যগণনানুসারে তাঁর রাজত্ব

শুরু সত্যযুগে ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে (কলিযুগ ৫৯০—কলিসন্ধ্যা ৪২) ৪৫৮ বৎসর পরে কলি যুগের অবসান হয়েছিল। কিন্তু নন্দের রাজত্বকালে ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংস হওয়ায় পুরাণকারগণের মতে, মহাপদ্ম নন্দ হলেন—সাক্ষাৎ কলি। নন্দকে বায়ু পুরাণ 'কালসম্বৃত' উপাধি দিয়েছিলেন। 'কালসম্বৃত'-এর অর্থ—কাল কর্তৃক আবরিত অথবা মনোনীত। এখান থেকেই নতুন কাল বা সম্বৎ সৃষ্টি। নন্দাভিষেকের বৎসরকে কালমুখ বলা হয়। এই কালমুখ থেকে ভারতযুদ্ধ ১০১৫ বৎসর পূর্বে এবং অন্ধ্র রাজত্বের শেষ ৮৩৬ বৎসর পরে। পুরাণকারগণ আদি পৌরাণিক গণনা পরিত্যাগ করে কলিবৃদ্ধি পরিকল্পনা করলেন। কলিতে ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট হয়। নন্দাভিষেক থেকে নন্দাব্দ গণনা শুরু হয়েছিল। পরে তাঁরা নন্দাব্দকে কল্যব্দতে পরিবর্তন করেন। পরবর্তীকালে, এই কল্যব্দের কালমুখ আরও শক্ত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা এক নক্ষত্র মহাযুগ (২৭০০ বৎসর) পশ্চাতে টেনে নিয়ে অষ্টম সাবর্ণি মনুর রাজত্বের শেষ বিন্দুতে পৌছে দিলেন। বৈবস্বত মনুকালকে বৃদ্ধি করে সাবর্ণি মনুকাল পর্যন্ত টেনে দেওয়া হয়েছিল। বৈবস্বত ও সাবর্ণি মনুকাল একত্রে চলেছিল। ঋগ্বেদে সাবর্ণি মনুর উল্লেখ আছে। এই ব্যবস্থায় মনুকল্পকাল গণনা যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে কল্যব্দ শুরু হলো। আশ্চর্য এই যে, দেব যুগমানের কলিযুগ আরম্ভ এই একই বৎসরে (৩১০১ খ্রীঃ পূঃ)। এই বৎসরটি এক বিখ্যাত কালমুখ। এখান থেকে দৈবমানের কলিযুগ আরম্ভ (পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য) ও মনুকল্পমানের অষ্টম মনুকাল বা বর্ধিত সপ্তম মনুকাল শেষ ; নন্দাব্দকে কল্যব্দে পরিণত করে তার কালমুখ এ বৎসরকেই দেখান হয়। কল্যব্দ ৩১০১ খ্রীঃ পূঃ থেকে শুরু হয়েছিল, এর সমর্থন দ্বিতীয় পুলকেশী (খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দী) কর্তৃক স্থাপিত আইহোল শিলালেখ-এ এবং আর্যভট্টের গ্রন্থে পাওয়া যায়। কল্যব্দ ও মনুকল্পের কলিযুগ আরম্ভের অব্দ এক নয়। অতীতে এই ভুল অনেকেই করেছেন।

নন্দের রাজ্যারোহণ বৎসর স্থির হলে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের রাজগণের কালনির্ণয় সহজসাধ্য হয়। বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের হিসাবমত নন্দ রাজ্যাভিষেকের (৪০১ খ্রীঃ পূঃ) সঙ্গে ভিনসেন্ট স্মিথ-এর কল্পিত বৎসরের (৪১৩ খ্রীঃ পূঃ) ব্যবধান সামান্য কয়েক বৎসর মাত্র।

পুরাণসমূহে কোথাও প্রতি রাজার, কোথাও প্রতি রাজবংশের রাজত্বকাল দেওয়া আছে। নন্দের রাজ্যাভিষেককে কেন্দ্র করেই পরীক্ষিৎ রাজার জন্ম, নন্দের রাজ্যারোহণ কাল এবং মগধে অন্ধ্ররাজবংশের রাজত্বের অবসান কাল দেওয়া আছে। পুরাণসমূহের মধ্যে কিছু কিছু মতপার্থক্যও আছে। বায়ু, বিষ্ণু, মৎস্য,

ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত, গরুড় ও ভবিষ্য পুরাণ এবং মহাভারত বিচার করে কালনির্ণয়ে সামঞ্জস্য আনয়ন সম্ভব। বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্যই এ ব্যাপারে বিশিষ্ট পুরাণ। কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে নন্দ পর্যন্ত মোট ৩৭ জন রাজার নাম পুরাণসমূহে পাওয়া যায়। মগধের রাজা জরাসন্ধের পুত্র রাজা সহদেব ভারতযুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়ে নিহত হন। এই বংশে (বার্হদ্রথ বংশ কুরুবংশেরই এক শাখা) সহদেবের পর থেকে মোট ২২ জন রাজা পুরাণ মতে ৫৩৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। শেষ রাজা রিপুঞ্জয়কে নিহত করে মুনিক প্রদ্যোত-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বায়ু, বিষ্ণু, মৎস্য—এই তিন পুরাণই এই বংশের পাঁচজন রাজার উল্লেখ করে-ছেন। এই বংশে মুনিক প্রথম সিংহাসন দখল করলেও এবং দশ বৎসর রাজত্ব করলেও তিনি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র প্রদ্যোত ঐ বংশের প্রথম রাজা বলে ঘোষিত হন। প্রদ্যোত থেকে এই বংশ রাজত্ব করেন ১৩৮ বৎসর, কিন্তু বায়ু পুরাণ মতে মুনিকের দশ বৎসরের রাজত্ব ধরে ব্যষ্টিকাল হিসাবে ১৪৮ বৎসর দেখান হয়েছে। এক পুরাণের সঙ্গে অন্য পুরাণের মতপার্থক্য এই প্রকার। এই বংশের শেষ রাজা নন্দীবর্ধন, তার পরে শিশুনাক বংশ। সকল পুরাণই এই দুই বংশকে একত্র দেখিয়েছে। শিশুনাক বংশের দশজন রাজার রাজত্বকালের সমষ্টি হিসাবে ৩৬২ বৎসর বায়ু ও বিষ্ণু উভয় পুরাণই দেখিয়েছে, কিন্তু ব্যষ্টি রাজত্বকাল যোগ করে ৩৩২ বৎসর পাওয়া যায়। সমষ্টি রাজত্বের মধ্যে শিশুনাক মগধ দখলের পূর্বে বারাণসীতে যে ৩০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন সম্ভবতঃ তাও যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এ দুই বংশ মগধে রাজত্ব করেছিলেন ১৪৮+৩৩২=৪৮০ বৎসর। এ দুই বংশের (প্রদ্যোত ও শিশুনাক) গড় রাজত্বকাল ৩২ বৎসর। এ দুই বংশেই ছিল পুত্রপরম্পরায় রাজত্ব; এতে কোন ছেদ ছিল না। উপরে বর্ণিত হিসাব মত, ভারতযুদ্ধের পরে মহাপদ্মনন্দের রাজত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত মোট (২২+১৫) ৩৭ জন রাজা (৫৩৫+১৪৮+৩৩২) ১০১৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। ফলে গড় রাজত্বকাল হয় ২৭.৪ বৎসর। এই গণনা বিষ্ণু পুরাণের সপ্তর্ষি যুগের নক্ষত্র গণনার সঙ্গে মিলে যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়, নন্দ রাজ্যাভিষেক ৪০১ খ্রীঃ পূঃ ধরলে ১৪১৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে (৪০১+১০১৫)।

সপ্তর্ষিযুগ মানদণ্ডে, ৩১০১ কল্যব্দ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মঘা নক্ষত্রে। পূর্বাষাঢ়া থেকে মঘা ১৭ নক্ষত্র। ৩১০১—১৭০০=১৪০১ খ্রীঃ পূঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শতাব্দী। ৩১০০ খ্রীঃ পূঃ মনুকাল শেষ; ৩১০১ খ্রীঃ পূঃ থেকে কল্যব্দ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে বৈবস্বত মনুকাল ২৩৭৮ বৎসরের অন্তর, এটা

পূর্বেই দেখান হয়েছে। সুতরাং বৈবস্বত মনুর আরম্ভ ১৪১৬+২৩৯৮=৩৮১৪ খ্রীঃ পূঃ। বৈবস্বত মনু থেকে স্বায়ম্ভুব মনুর অন্তর ২১৪৪ বৎসর, এটাও পূর্বে দেখান হয়েছে। সুতরাং স্বায়ম্ভুব মনুকাল ২১৪৪+বৈবস্বত মনু ৩৮১৪=৫৯৫৮ খ্রীঃ পূঃ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, স্বায়ম্ভুব মনু থেকে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর—এই তিন ধর্মযুগ ও কলি সন্ধ্যা ৪২ বৎসর বাদ দিলে (৫৯৫৮ খ্রীঃ পূঃ—৪৫০০—৪২) ১৪১৬ খ্রীঃ পূঃ হয়; এইভাবে হিসাবটি ঠিকই মিলে যায়।

বৈবস্বত মনু থেকে সূর্যবংশের রাজা বৃহদ্বল (যিনি পাণ্ডব শিবিরে যোগ দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন) পর্যন্ত ৯৫ জন রাজা (তেরটি পুরাণ এ-সম্পর্কে একমত), পর্যায় কাল ৮৭ থেকে ১৮১ পর্যন্ত রাজত্ব করে গেছেন। পুরাণকারগণ কাল-গণনার ক্ষেত্রে সূর্যবংশকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ এই বংশে পুত্রপরম্পরাতে কোন ছেদ নেই। মনুকল্প গণনায় বৈবস্বত থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত হয় ২৩৯৮ বৎসর (৫০০০ মনুকল্প—২১৪৪ বৈবস্বত মনু—৫০০ বৎসর কলিকাল+৪২ বৎসর কলি সন্ধ্যা)। ৯৫ জন রাজা ২৩৯৮ বৎসর রাজত্ব করলে গড় রাজত্বকাল দাঁড়ায় ২৫.২ বৎসর। এটাও কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়। পুত্রপরম্পরায় যে-রাজবংশ এত সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছে (পৃথিবীতে অতুলনীয়) তাদের গড় রাজ্যকাল—২৫.২ বৎসর কি খুবই বিস্ময়কর ঘটনা?

ভিনসেণ্ট স্মিথ, উইলসন, পার্জিটার এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ পুরাণসমূহে লিখিত রাজগণের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত রাজত্বকাল বা তাঁদের প্রদত্ত গড় রাজত্বকাল স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত নন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কল্পিত এক-একটি গড় রাজত্বকাল ধরে গণনা করেছেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ মনে করেন, বহু পর্যায় ধরে গণনা করলে দেখা যায় যে, পর্যায়কাল কদাচিৎ ২৫ বৎসর পর্যন্ত ওঠে এবং গড় রাজত্বকালও এই সংখ্যার ঊর্ধ্বে যাওয়া সম্ভবপর নয় (দ্র. *Early History of India*, p. 47)। ভিনসেণ্ট স্মিথ নন্দীবর্ধন ও মহানন্দীর (শিশুনাক বংশের) পর পর রাজত্বকাল ৪২ ও ৪৩ বৎসরকে অবিশ্বাস্য মনে করেছেন। শিশুনাক বংশের দশজন রাজার (ইতিপূর্বে প্রদত্ত) ৩৩২ বৎসর রাজত্ব এবং গড় রাজত্বকাল ৩২ বৎসরকে তিনি স্বীকার করেননি। তৎপরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন, ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত দশজন রাজা ২৫০ বৎসর রাজত্ব করেছেন। সুতরাং তিনি শিশুনাক বংশের রাজত্বকাল ২৫০ বৎসর ধরে গণনা করেছেন। পার্জিটারও এই ধরনের দীর্ঘ রাজত্ব-কাল স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত নন। তাঁর মতে গড় ১৮ বৎসর রাজত্বকাল ধরাই সমীচীন। অথচ আমরা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসেই দেখতে পাই, রাজা জন

থেকে তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্ব পর্যন্ত ৫ জন রাজা ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭৮ বৎসর রাজত্ব করেছেন, এদের গড় রাজ্যকাল ৩৫.৬ বৎসর ; এরা পুত্রপরম্পরায় রাজত্ব করেছেন। আবার বাংলার পাল রাজবংশে দেখতে পাই নির্বাচিত রাজা গোপাল থেকে পুত্রপরম্পরায় তৃতীয় বিগ্রহ পাল পর্যন্ত ১২ জন রাজা ৩২০ বৎসর রাজত্ব করেছেন এবং তাদের গড় রাজত্বকাল ২৬ বৎসর। ভারতের গুপ্ত বংশে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খ্রীস্টাব্দ) থেকে স্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত ৫ জন রাজা মোট ১৪৭ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করেছেন। মোগল রাজত্বে হুমায়ুন থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত ৫ জন রাজা ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ১৭৭ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ৩৫ বৎসর রাজত্ব করে গেছেন। দাক্ষিণাত্যের বৃহত্তর পল্লভ রাজত্বে, সিংহ বর্মণ থেকে দ্বিতীয় নন্দী বর্মণ, ৫৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৭৯৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৯ জন রাজা ২৪৬ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ২৭ বৎসর রাজত্ব করেছেন। নেল্লোর-গুণ্টুরের পল্লভগণ ও বিরুকাচ বর্মণ ৩৭৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় বিষ্ণুগোপ বর্মণ পর্যন্ত ৭ জনে মোট ২১০ বৎসর, গড়ে ৩০ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। স্কটল্যাণ্ড যখন স্বাধীন ছিল রাজা প্রথম ডেভিড থেকে তৃতীয় আলেকজাণ্ডার পর্যন্ত (১১২৪ খ্রীঃ থেকে ১২৮৬ খ্রীঃ) ৫ জন রাজা ১৬২ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ৩২ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। ইয়োরোপে হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশ, প্রথম রুডলফ থেকে ম্যাক্সমিলান (প্রথম), ১২৭৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৮ জন রাজা মোট ২৪৬ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ৩০ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। ইংল্যাণ্ডে প্রথম উইলিয়াম থেকে ৪র্থ এডওয়ার্ড পর্যন্ত ষোল জন রাজা ১০৬৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৪১৭ বৎসর, গড়ে ২৬ বৎসর করে রাজত্ব করেছিলেন, যদিও এক্ষেত্রে তিনটি ছেদ পড়েছিল। বাংলার সেন বংশের তিন রাজা—বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন পর্যায়ক্রমে ১০৭৫ থেকে ১২০৫ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ১৩০ বৎসর, গড়ে ৪৩ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। পাল বংশে ধর্মপাল ৭৭৫ থেকে ৮১০ খ্রীস্টাব্দ মোট ৩৫ বৎসর ও তৎপুত্র দেবপাল ৮১০ থেকে ৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেছেন। ঐ বংশেই ৬ষ্ঠ রাজা নারায়ণ পাল ৮৬১ থেকে ৯১৭ খ্রীস্টাব্দ মোট ৫৬ বৎসর ও তৎপুত্র ৯১৭ থেকে ৯৫২ খ্রীস্টাব্দ মোট ৩৫ বৎসর, সর্বমোট ৯১ বৎসর রাজত্ব করেছেন। অথচ ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব পর পর ২ জন রাজার ৮৫ বৎসর রাজত্বকে অবিশ্বাস্য মনে করেছিলেন।

নন্দ রাজ্যাভিষেক ৪০১ খ্রীঃ পূঃ কালবিন্দু ধরে নিলে মনুকল্প, সপ্তর্ষিযুগ ও কল্যাব্দ মানদণ্ডে একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে নন্দ-রাজত্ব

৪১৩ খ্রীঃ পূঃ। ৪১৩ স্থির বিন্দু ধরে গণনা করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয় ১৪২৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে।

শিশুনাক বংশীয় নন্দীবর্ধন আনুমানিক ৪৬৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে এক খাল খনন করেছিলেন, একথা লিপিবদ্ধ আছে উড়িষ্যার রাজা খরবেল-এর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে। (দ্র. *Early History of India* by Vincent Smith, p. 44)। পুরাণের হিসাব মতে নন্দীবর্ধনের রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬-৪৪৪। সুতরাং পুরাণকারের হিসাব যে মোটামুটি ঠিক, তা প্রমাণিত হয়।

পৌরাণিক গণনায়, সূর্যবংশের গড় রাজত্বকাল গোষ্ঠীগতভাবে নিম্নরূপ :

১. বৈবস্বত থেকে মান্ধাতা ২০ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ৮৭ থেকে ১০৬, মোট রাজত্বকাল ৩৮২ বৎসর, গড় রাজত্বকাল ১৯.১ বৎসর।

২. মান্ধাতার পর থেকে সগর পর্যন্ত ১৯ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ১০৭ থেকে ১২৫, মোট রাজত্বকাল ৫০৫ বৎসর, গড় রাজত্বকাল ২৬.৩ বৎসর।

৩. সগরের পর থেকে মূলক পর্যন্ত ১৬ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ১২৬ থেকে ১৪১, মোট রাজত্বকাল ৫০২ বৎসর, গড় রাজত্বকাল ৩১.৩ বৎসর।

৪. মূলক-এর পর থেকে রাম পর্যন্ত মোট ১০ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ১৪২ থেকে ১৫১, মোট রাজত্বকাল ৩২৫, গড় রাজত্বকাল ৩২.৫ বৎসর।

৫. রাম-পুত্র থেকে বৃহদ্বল পর্যন্ত মোট ৩০ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ১৫২ থেকে ১৮১, মোট রাজত্বকাল ৬৮৪, গড় রাজত্বকাল ২২.৮ বৎসর।

মনুকল্প মানদণ্ডে প্রাপ্ত রাজত্বের পরিমাণ, সপ্তর্ষি নক্ষত্র মানদণ্ড দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, জ্যোতির্বিদদের কল্যাব্দ কালমুখ ধরে গণনাতেও যে সমর্থন পাওয়া গেছে তদপেক্ষা কি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের স্বেচ্ছাচারী কল্পিত সংখ্যাই অধিকতর প্রামাণ্য? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ২৮ পৈত্রিক যুগে ১৪১৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ঘটেছে, এটাই স্থূল গণনা। এক্ষেত্রে প্রকৃত বৎসর নিরূপণে হয়তো সামান্য কয়েক বৎসরের হেরফের হতে পারে।

এই অনুসারে প্রথম কিম্বদন্তীর রাজা স্বায়ম্ভুব মনু খ্রীস্ট জন্মের প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্বে (৫৯৫৮ খ্রীঃ পূঃ) প্রথম পৈত্র যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঋগ্বেদের আদি সূক্ত-রচয়িতা অথবা দ্রষ্টা বৈবস্বত মনু ত্রেতার ১৩ পৈত্র যুগে প্রায় চার সহস্র বৎসর পূর্বে (৩৮১৪ খ্রীঃ পূঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ২৪ পৈত্র যুগমানে, দ্বাপরে রামচন্দ্র ২১২৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে (পর্যায় সংখ্যা ১৫১) এবং শ্রীকৃষ্ণ ২৭-২৯ পৈত্র যুগের সন্ধিতে ১৪৫৮ খ্রীস্ট পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কাল দ্বাপরাংশ সংক্ষয়ে ও কলি আরম্ভে। (স্বায়ম্ভুব মনু ৫৯৫৮—৪৫০০ = ১৪৫৮)।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে, ঋগ্বেদের সূক্ত রচনার সূত্রপাত হয়েছিল—১৩ পৈত্র মানে ৮৭ পর্যায় সংখ্যায় বৈবস্বত মনু থেকে এবং তা চলেছিল যুধিষ্ঠির-এর প্রপিতা-মহ, ভীষ্মের পিতা শান্তনুর রাজত্বকাল অবধি। শান্তনু দ্বাপর যুগের শেষভাগে ২৭ পৈত্র যুগে ১৭৮ পর্যায় সংখ্যায় হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন। গড় রাজত্বকাল ২২.৮ ধরে হিসাব করলে শান্তনুর রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ পনের শতাব্দীর শেষভাগে পড়ে। ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা অসিত দেবল। অসিতপুত্র দেবল, ভীষ্মের সময় ছিলেন। দেবল পাণ্ডবদের সময় ছিলেন ; তার ছোট ভাই ধৌম্য কুরুকুলের পুরোহিত। সুতরাং বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ উনচল্লিশ শতাব্দী থেকে খ্রীঃ পূঃ পনের শতাব্দী পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘকালে ৯২ জন রাজার ধারাবাহিক রাজত্বের কথা আমরা পুরাণসমূহে পাই। এই রাজগণের নাম অলীক বা কল্পিত নয়, তার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে, চার বেদে এবং ব্রাহ্মণসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এদের অনেকেই ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা, যজ্ঞের যজমান অথবা বিশিষ্ট দাতা রূপে বর্ণিত হয়েছেন। কে, কোন্ সময়ে রাজত্ব করেছেন তা ধারণা করার জন্য পর্যায়ক্রমিক একটি তালিকা এই সঙ্গে প্রদত্ত হলো। একই পর্যায় সংখ্যায় যাঁদের নাম থাকবে তাঁরা সমসাময়িক, এটাই ধরে নিতে হবে। ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে রাজগণের পিতৃনাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও সমসাময়িক রাজার নাম এবং বংশের কথাও বলা হয়েছে, যেমন : পুরু বংশ (ঋ ১০.৪৮. ৫), যদুবংশ (৮. ৬. ৪৬), চেদিবংশ (ঋ ৮. ৪) প্রভৃতি। এই রাজগণ ছাড়াও বহু রাজার নাম ঋগ্বেদে রয়েছে, যাদের পরিচয় পুরাণসমূহ ঘেঁটে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত করা বর্তমানে এই বৃদ্ধ গ্রন্থকারের পক্ষে শারীরিক কারণেই আর সম্ভব নয়। কিন্তু এই তালিকা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, ঋগ্বেদে সংকলিত মন্ত্রসমূহ সুদীর্ঘকাল (দ্বিসহস্রাধিক বৎসর)—নিরানব্বই পুরুষ ধরে দৃষ্ট বা রচিত হয়েছিল এবং ঐ মন্ত্রগুলো কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের রচনা নয়।

প্রাচীন আর্যগণ ইতিবৃত্ত লিখতে জানতেন না, এই অপবাদও সম্পূর্ণ অসত্য এবং অজ্ঞতাপ্রসূত। আর্যগণের ইতিবৃত্ত ভাবনার উৎকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে পুরাণই হলো জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পুরাণে প্রায় ছয়-হাজার খ্রীঃ পূঃ থেকে ৪৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৬৩৯৩ বৎসরের অখণ্ড রাজক্রম বিধৃত আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-এক অতুলনীয় ঘটনা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য ম্যাক্সমূলর-এর মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কি করে ঋগ্বেদের রচনাকাল তিন-চার শতাব্দী বলে অনুমান করতে পারলেন, সে কথা ভেবে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। এটা তিনি কী করে ভাবতে পারলেন যে,

এর রচনা শুরু হয়েছে মাত্র খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে ? তিনি হয়তো ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বেদ-সংহিতার চর্চা করেননি এবং পুরাণসমূহকে করেছেন সম্পূর্ণ অবজ্ঞা। একটা বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা, অর্থাৎ আর্যরা ভারতে বহিরাগত, এই ভাবনাই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণকে হয়তো এমনি অন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু ঋগ্বেদ যে খ্রীস্টপূর্ব পনের থেকে বারো শতাব্দীর বহু পূর্বেরই রচনা, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ তো সরস্বতী নদী। ঋগ্বেদের যুগেই তো এই নদী ছিল পূর্ণ যৌবনা এবং খরস্রোতা। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে এই নদী শুকিয়ে যেতে থাকে এবং খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে সরস্বতীর স্রোতধারা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। এই কারণেই হারাপ্পা-সভ্যতার পতন ঘটে। সুতরাং ঋগ্বেদের রচনাকাল কোনক্রমেই হারাপ্পা-পরবর্তী নয়। কোনো যুক্তিবাদী মানুষ এই বাস্তব ঘটনা অগ্রাহ্য করতে পারেন না, এটাই আমার ধারণা।

যাহোক, ভারতবর্ষ পরাধীন ও পরপদানত ছিল। প্রায় আট শত বৎসর এই দেশ বৈদেশিক রাজশক্তির গোলামী করেছে। এই কারণে তাদের অতীত যে এমন গৌরবোজ্জ্বল—একথা প্রভুজাতীয়গণের পক্ষে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন ছিল। তাঁদের পক্ষে মিসর, সুমের, ব্যাবিলোন প্রভৃতি সভ্যতার প্রাচীনতা স্বীকার করতে বাধা ছিল না, কারণ ঐসব সভ্যতার বংশধর বলে পরিচয় দিতে এবং সেই সভ্যতার দাবীদার হতে আজ আর কেউ নেই। কিন্তু ভারতীয় আর্য-সভ্যতা আজও জীবন্ত। খ্রীস্টপূর্ব ছয় হাজার বৎসর থেকে যে সভ্যতা-সংস্কৃতির সূত্রপাত তার প্রবাহ আজও অব্যাহত। বিদেশী পণ্ডিতেরা এই সত্য জানেন বলে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই তাঁরা এতকাল এই বিপরীত পথে পরিক্রমা করে চলেছেন। দুঃখের হলেও কথাটা যে অসত্য নয়, অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই গ্রন্থ থেকেই তার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন।

ঋগ্বেদের বহু স্থলেই ভৃগু, অথর্বা, দধীচি, অঙ্গিরা, কণ্ব, অত্রি মনু প্রভৃতি প্রাচীন নমস্য ঋষিগণকে 'পূর্বকালীন ঋষি' বলে উল্লেখ করে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের ৬.২১ সূক্তে প্রাচীন কালের বিখ্যাত ঋষি ভরদ্বাজ নিজেকে অর্বাচীন ঋষি বলেছেন—পূর্বকালীন জাত পুরাতন ঋষিগণ, মধ্যকালীন ও ইদানীন্তন ঋষিগণের উল্লেখ করেছেন। অপর বিখ্যাত ঋষি বিশ্বামিত্র, (৩'৩২ সূক্তে) পুরাতন, মধ্যতন, অধুনাতন স্তোম বা স্তুতির উল্লেখ করেছেন। বৃহস্পতি হলেন ঋগ্বেদের একজন দেবতা (ঋ ১০.৬৪.৪, ২.২৩.২. ৪.৫০ এবং ৭.৯৭ প্রভৃতি)। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে তিনি দেবতা রূপে স্তুতি লাভ করেছেন। ঐ ঋগ্বেদেই দেখা যায়, তিনি একজন সূক্ত-রচয়িতা

ঋষি ছিলেন (১০.৭২, ১০.৬৮.১২ প্রভৃতি)। বিখ্যাত ঋষি অবাস্ত বৃহস্পতিকে নিম্নলিখিত বাক্যে প্রণতি জানিয়েছিলেন: "যিনি অনেক পুরাতন ঋক রচনা করে গিয়েছেন, এখন যিনি মেঘলোক নিবাসী হয়েছেন, সেই বৃহস্পতিকে এই নমস্কার করলাম।" বিভিন্ন দেবতা যেমন মানুষ রূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন, তেমনি বৈদিক যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষও প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতায় পরিণত হতেন। একে 'দিবি আরোহণ' বলে। শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রথমে মানুষ রূপেই পূজা পেতে থাকেন, তৎপরে দেবতা হন এবং তৎপরে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে কল্পিত হন। বৃহস্পতিও প্রথমে মানুষ ঋষি, তৎপরে দেবতা, তৎপরে আকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। কৃষ্ণ মানুষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, কৃষ্ণ সূর্য। রামও তদ্রূপ; ধ্রুব মানুষ, রাজা, আবার জ্যোতিষ্ক। মনুপিতা বিবস্বান মানুষ ছিলেন, আবার ঋগ্বেদেই তিনি সূর্যের অপর একটি নাম রূপে বিরাজিত। দক্ষ রাজা এবং প্রজাপতি, আবার দেবতাও। ঊর্ধ্বাকাশে যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয় তা ভারতেরই প্রাচীন সাতজন ঋষির নামে চিহ্নিত। এই সবের মধ্যেই আমরা ঋগ্বেদের প্রাচীনতার প্রমাণ পাই।

প্রাচীনতম কাল থেকেই—অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতে যখন দেবতা ও মানুষ একাকার হয়েছিল, সেই সময় থেকেই আর্য রাজা ও ঋষিকণ্ঠে বেদের মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হতে শুরু করেছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই বেণপুত্র পৃথু রাজার (সরস্বতী তীরে) যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা থেকে (ঋ ১০.১৪৮ দ্রষ্টব্য)। আর্যগণ ভারতেরই সন্তান, ভারতীয় আর্যেরা দেবগণের আরাধনায় সমর্পিত-প্রাণ। তাঁরা বহিরাগত নন। চতুর্বেদ তাঁদেরই কণ্ঠনিঃসৃত সম্পদ।

পুরাণসমূহে ও রামায়ণ-মহাভারতে আমরা বৈবস্বত মনুর বংশধরদের পরিচয় পাই, বহু রাজার নামও পাই যাদের মধ্যে অনেকেই ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা, যজ্ঞের যজমান অথবা যশস্বী দাতা। মান্ধাতৃ, যযাতি, ভরত, অভ্যাবর্তী, ভাবয়ব্য, ত্রসদস্যু, দিবোদাস, সুদাস প্রভৃতি সম্রাটগণও ঋগ্বেদে আছেন। দুষ্মন্তপুত্র ভরতের পরবর্তী সময় (মনু থেকে ২৪ পুরুষ রাজা ভরতের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত সূক্ত সংখ্যা অধিক নয়) থেকেই ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ভরত থেকেই দেশের নাম ভারতবর্ষ। ভারত বংশেরই রাজা কুরু থেকে এই বংশের নাম কৌরব বলে পরিচিত হতে থাকে। ইতিপূর্বেই ভারতবংশ থেকেই দুটি শাখা বেরিয়েছিল (ঋগ্বেদে যাদের কৃভিগণ বলা হয়েছে) বৈবস্বত মনু থেকে প্রায় ৬০ পুরুষ পরে, অর্থাৎ পরবর্তীকালে তাঁরা পাঞ্চালগণ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এদের দুটি রাজ্য—উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল

বিখ্যাত হয়েছিল। উত্তর পাঞ্চালের প্রথম বারজন রাজার মধ্যে অন্ততঃ আটজন রাজার নাম সূক্ত-রচয়িতা রূপে আমরা ঋগ্বেদে পাই। মুদ্‌গল এ-বংশেরই প্রথম বিখ্যাত রাজা ও সূক্ত-রচয়িতা; রানী ইন্দ্রসেনা যুদ্ধে এঁর রথের সারথি ছিলেন (ঋগ্বেদ)। ক্ষত্রিয় হয়েও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ ও তাঁর পুত্রপৌত্ররা ব্রাহ্মণ-ঋষি। ঋষি উশিজ বংশে পর পর অন্ততঃ ছয়জন ঋষির নাম পাই, যাঁরা ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা। রহুগণ, ইষিরথ, কন্ব প্রভৃতি অনেকেই আছেন ঋষি-বংশে, যাঁরা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ঋগ্বেদের সূক্ত রচনা করে গেছেন। বহু ঋষি বংশের উল্লেখ আমরা ঋগ্বেদে পাই। বায়ু ও মৎস্য পুরাণে ঋষি বংশসমূহের পরিচয় বিধৃত আছে; ঋগ্বেদের কালেই আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর ভারতে, দক্ষিণের বহুলাংশে ও বিদর্ভে ব্যাপ্ত হয়েছিল। ঋগ্বেদ রচনার সমাপ্তি কালে, দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই যুদ্ধে ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকের প্রায় সব নরপতিগণই যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গেই পূর্বের প্রাগজ্যোতিষপুর, দক্ষিণের কেরল, চোল, পাণ্ড্য, বিদর্ভ, অন্ধ্র, মালব প্রভৃতি রাজ্যের নাম মহাভারতে দেখতে পাই। বৈদিক যুগের ঋষিগণ, অর্থাৎ অসিত, দেবল, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং উক্ত যুগের রাজা শান্তনুর পুত্র ভীষ্মদেব ঐ যুদ্ধে কৌরব পক্ষে প্রধান সেনাপতি পদে বৃত ছিলেন। সুতরাং বৈদিক যুগ ও ভারতযুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অধিক ছিল না।

মোট কথা, ভারতের সেই ঊষাকাল থেকেই এক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় আমরা এই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে পাই। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্মেষ থেকে শুরু করে তার পূর্ণ পরিণতির রূপটিও আমরা পাই এই গ্রন্থে, যা সত্যিই ছিল দীর্ঘকালের সাধনালব্ধ সম্পদ।

পৌরাণিক রাজগণের পর্যায়ক্রমিক তালিকা

পর্যায় সংখ্যা	রাজগণের নাম	ঋগ্বেদের সূক্ত/ঋক সংখ্যা
৮৭	বৈবস্বত মনু	৮. ৪২, ৮. ২৯-৩০-৩১
৮৭ক	সাবর্ণি মনু	১০. ৬২. ৯-১১
৮৮	নাভানেদ্দিষ্ট (মনুপুত্র)	১০. ৬১. ১
৮৮	শর্যাত	১. ১১২. ১৭
৮৮	ইক্ষ্বাকু	১০. ৬০. ৪
৮৮	ইলা (বৈবস্বত-কন্যা)	১. ৩২
৮৯	পুরুরবা (ইলাপুত্র)	১০. ৯৫. ১. ৩১. ৪
৯০	আয়ু (ঐ পুত্র)	১০. ৪৯. ৫, ১. ৫৩. ১০
৯১	বৎসপ্রি (নাভাগ বংশ)	১০. ৪৫
৯১	নহুষ (আয়ুপুত্র)	১. ৩১. ১১, ৮. ৬
৯২	যযাতি (নহুষপুত্র)	১. ৩১, ১০. ৬৩. ১
৯২	পৃথু	১০. ৯৩. ১৪, ৬. ২৭. ৮
৯৩	পুরু	১. ১০৮. ৮
৯৩	যদু	৮. ১০. ৫, ১. ১০৮. ৮
৯৩	তুর্বশু	৮. ১০. ৫, ১. ১০৮. ৮
৯৩	অনু	৮. ১০. ৫. ১. ১০৮. ৮
৯৩	দ্রুহ্য	৮. ১০. ৫, ১. ১০৮.৮
৯৪	জন্মেজয় (পুরুরাজার পুত্র)	৮. ৩
১০৫	যুবনাশ্ব	গোপথ ব্রাহ্মণ
১০৬	মান্ধাতা যৌবনাশ্বি	৮.৪১.১২, ১.১১২.১৩, ১০.১৩৪
১০৭	পুরু কুৎস (ঐ পুত্র)	৪. ৪২, ৮. ১৯. ৩৬
১০৮	ত্রসদস্যু (ঐ পুত্র)	৪. ৪২, ৮. ১৯. ৩৬
১০৮	মরুত্ত (সম্রাট, তুর্বশু বংশ)	
১০৯	তৃক্ষি (ত্রসদস্যু-পুত্র)	৮. ২২. ৭
১০৯	দুষ্মন্ত	শতপথ ব্রাহ্মণ
১১০	ভরত	৬. ১৬. ৪
১১০	চিত্ররথ (অনু বংশ)	৮. ২১. ১৭

পর্যায় সংখ্যা	রাজগণের নাম	ঋগ্বেদের সূক্ত/ঋক সংখ্যা
১১১	দেবশ্রবা দেবরাত (ভরত-পুত্র)	৩. ২৩. ২
১১১	অশ্বমেধ (ভরত-পুত্র, রাজা ও ঋষি)	৫.২৭.৮, ৬৮.১৬
১১১	ত্র্যারুণ (রাজর্ষি ত্রিবৃষ্ণপুত্র)	৫. ২৭. ৩
১১১	ঋক্ষ	৮. ৬৮. ১৬
১১৩	সুহোত্র (উশিনপুত্র শিবি)	৪. ৪৩
১১৬	ত্রয্যারুণ (সূর্যবংশ)	৮. ২১. ১৭
১২৭	প্রতর্দন (দৈবদাসী)	৯. ৯৬
১৩৪	অম্বরীষ (সূর্যবংশ)	৯. ৯৮
১৪৬	ভূম্যশ্ব (মুদ্গল-পিতা)	
১৪৭	মুদ্গল-স্ত্রী ইন্দ্রসেনা (সারথি-যোদ্ধা)	১০. ১০২. ১
১৪৭	সৃঞ্জয় (দেবরাত-পুত্র)	৬. ২৭. ৭, ৬. ৪৭.২২, ৪.১৫.৪
১৪৮	বধ্র্যশ্ব (মুদ্গল-পুত্র)	৬. ৬১. ১
১৫৮	প্রস্তোক (সৃঞ্জয়-পুত্র)	৬. ৪৭. ২২-২৩
১৪৯	দিবোদাস (ঐ-পুত্র)	১০. ৬৯. ১
১৪৯	সুমিত্র (বধ্র্যশ্ব-পুত্র)	১০. ৬৯. ১
১৪৯	ঋক্ষ (অজামিঠ-পুত্র)	৮. ৬৮. ১৬
১৫০	ইন্দ্রোত (দিবোদাস-পুত্র)	৮. ৬৮. ১৭
১৫৪	দেববান	
১৫৫	পিজাবন (ঐ পুত্র)	৭. ১৮. ২২-২৩
১৫৫	ত্রসদস্যু (পুরু কুৎস-পুত্র)	১০. ৩৩. ৪
১৫৬	সুদাস (পাঞ্চাল)	১.৪৭.৬, ৭.১৮.২২-২৩, ৭.৮৩.১
১৫৬	কুরু শ্রবণ	১০. ৩৩. ৪
১৫৭	জহ্নু	১. ১১৬. ১৯
১৫৮	সুরথ (ঐ পুত্র)	৭. ৮৩. ১
১৫৯	চেদি [যদুবংশ]	৮. ৫. ৩৭-৩৮
	সহদেব	৪. ১৫. ৭

পর্যায় সংখ্যা	রাজগণের নাম	ঋগ্বেদের সূক্ত/ঋক সংখ্যা
	সোমক (ঐ পুত্র)	৪. ১৫. ৭
১৭২	বৃষভ	৬. ২৬. ৪
১৭৪	ঋক্ষ (অক্রোধন-পুত্র)	৮. ৭৪. ৪
১৭৫	শ্রুতর্বা (ঐ পুত্র)	৮. ৭৪. ৪
১৭৮	শান্তনু	১০. ৯৮

এতদ্ব্যতীত, ঋগ্বেদ গ্রন্থে আমরা বহু রাজার নাম পাই, যাঁদের মধ্যে অনেকে তৎকালে দাতা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সুতরাং তাঁরা নগণ্য নন। এই রাজগণ, কোন্ সময়ে কোথায় রাজত্ব করেছিলেন তা জানা যায় না। এঁদের কিছু কিছু নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. পৃথুর বংশধর সম্রাট অভ্যাবর্তী (ঋ ৬. ২৭. ৮)
২. রাজা মরুতাশ্ব, তৎপুত্র বিদথ (ঋ ৫. ৩৩. ৯), তৎপুত্র ঋজিস্বা (৪. ১৬. ১৩)
৩. রাজা বড়শিখ-এর পুত্র ব্রীচিবান (ঋ. ৬. ২৭. ৫)
৪. রাজা লক্ষ্মণ-এর পুত্র ধন্য (ঋ ৫. ৩৩)
৫. দর্ভের পুত্র রাজা রথবীথি (ঋ ৫. ৬১. ১৭ ও ১৯), গোমতী তীরে
৬. রুরুর পুত্র কুৎস (৪. ১৬)
৭/৮. বৎস কুলের রাজা তুর্বীতি (১. ৫৪)
৯. বয়ন্তের পুত্র পাশদ্যুম্ন (৭. ৩৩. ২)
১০. দাতা রাজা শ্রুতরথ (ঋ ৫. ৩৬)
১১. অগ্নিবেশ-এর পুত্র রাজা শত্রি (ঋ ৫. ৩৪)
১২. রাজর্ষি তুগ্র
১৩. রাজর্ষি বিমদ (১. ১১৬. ১ ও ২)
১৪. রাজা জাহুষ (১. ১১৬. ২০)
১৫. শতবনি পুত্র রাজা পুরুনীথ (১. ৫৯. ৭)
১৬. রাজা খেল, তৎপত্নী সূত্র-রচয়িত্রী রানী বিশপলা (১. ১১৬. ১৫)
১৭. যদুবংশীয় রাজা পৃথুশ্রবা এবং তৎপুত্র কনীথ (ঋ. ৮. ৪৬.২৯, ১.১১৬. ২৬ ;
অশ্ব-র পুত্র ঋষি বশ-এর কন্যার কানীন পুত্র পৃথুশ্রবা
১৮. সুষম রাজার পুত্র বরু রাজা (ঋ ৮. ২৪ ও ২৫)

১৯. কুরুযান-এর পুত্র রাজা পাকস্থামা (৬. ৯. ২১)

২০. রাজা পুরুমীঢ় (ঋ ৮. ৭১. ১৩)

২১. রাজা স্বনয় (ঋ ১. ১২৩ ও ১২৬) ভাবয়ব্য পুত্র (সায়ন) কক্ষীবানের শ্বশুর

২২. রাজা সুশ্রবা (ঋ ১. ৫৩. ১০). বায়ু পুরাণ মতে একজন প্রজাপতি

২৩. চেদীবংশীয় রাজা কশু (ঋ ৮. ৫. ৩৮)

২৪. যদুবংশীয় রাজা পশুপুত্র তিরিন্দির, বিখ্যাত দাতা (৮. ৬. ৪৬)

২৫. রুসম জনপদের রাজা ঋণঞ্চয় (ঋ ৫. ৩০. ১৪, ৫. ৯০. ১২)

২৬. রাজা বিভিন্দু (বিন্দু ?) (ঋ ৮. ২. ৪১), মহান দাতা

২৭. রাজা তরন্ত, তৎ মহিষী শশীয়শী (ঋ ৫. ৬১. ৫ ও ১০)

২৮. সিন্ধু দেশের সম্রাট ভাবয়ব্য (ঋ ১. ১২৬. ১), প্রমুখ আরও অনেকে।

গ্রন্থপঞ্জী

এই পুস্তক রচনাকালে যেসব গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. *Rigvedic India*, Vol. I : by A. C. Das.

২. *The Vedic Age*, Vol. I : General Editor : R. C. Majumder.

৩. *Ancient Indian Historic Tradition :* by F. E. Pargiter.

৪. *History of Mankind*, Vol. I : by Sir Leonard Wooley.

৫. ঋগ্বেদ : রমেশচন্দ্র দত্ত ও দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

৬. পুরাণ প্রবেশ : গিরীন্দ্রশেখর বসু।

৭. *Rigvedic Culture of the Pre-Historic Indus :* by Swami Sankarananda.

৮. *The Indo-Aryan Races :* by Ramaprosad Chanda.

৯. *Pre-History of India :* by H. D. Sankalia.

১০. *Pre-History and Proto-History of India & Pakistan :* by H. D. Sankalia.

১১. *Indian Archaeology Today :* by H. D. Sankalia.

১২. *Pre-History & Proto-History of India :* by K. C. Jain.

১৩. *Indian Pre-History :* by A. Ghosh.

১৪. *Archaeology of Soviet Central Asia and The Indian Borderlands*, 2 Vols. : by S. P. Gupte.

১৫. *Harappan Civilisation : A Contemporary Perspective :* by Greg Prossehl.

১৬. *History of Persian Literature :* by Yunus Jaffery.

১৭. *A History of Persia :* by Sir Percy Sikes,

১৮. *History of Europe :* by Freeman Edward, A.

১৯. *History of German Literature :* by Werner P. Friederich.

২০. *Hindu States of Sumeria :* by Swami Sankarananda.

২১. *The Last Days of Mahenjodaro :* by Swami Sankarananda.

২২. *The Indus People Speak :* by Swami Sankarananda.

২৩. ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন।

২৪. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস : জাহ্নবীচরণ ভৌমিক।

২৫. ভাষা-বিজ্ঞান পরিচয় : সুকুমার বিশ্বাস, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬. বায়ু পুরাণ

২৭. বিষ্ণু পুরাণ

আর্যদিগের বহুবিতর্কিত আদি বাসভূমি ভারতবর্ষ

অধ্যাপক শচীন্দ্রকুমার মাইতি

Professor of Indology, Research Department,

Government Sanskrit College, Calcutta

আর্যদের জন্মভূমির ঠিকানা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিতমহলের একটি পুরোনো ও বহুবিতর্কিত প্রসঙ্গ। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অন্যান্য গবেষণার ফলে এ বিষয়ে নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে এবং আমাদের চিন্তাধারায় নতুন মোড় অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

খ্রীস্টজন্মের পঞ্চদশ শতকের পূর্বে রচিত ঋগ্বেদ ইতিহাসবেত্তাদের প্রাচীনতম দলিল কুভা (**Kabul**), সিন্ধু (**the Indus**), বিতস্তা (**the Jhelum**), বিপাশা (**the Bias**), শতদ্রু (**the Sutlej**), সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, এসব নদীর নামের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। এ থেকে আর্যদের আদি নিবাস সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই।

অন্যদিকে ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাক্ষ্য নিয়ে কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এশিয়া মাইনরকে আর্যদের প্রাচীন বাসভূমি বলে দাবী করেন। কিন্তু **Prof. Goetze**-এর মতে প্রাচীনতম **Indo-European** ভাষাভাষী হিত্তিদের (**Hittie**) এশিয়া মাইনরে পদার্পণ ঘটে খ্রীঃ পূঃ ১৯৫০-এর কাছাকাছি। আবার মধ্য এশিয়াকে আর্যদের বাসস্থানের ধারণাও অনেক পণ্ডিতের মনে হয়। কিন্তু এই মত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য একদল মধ্য এশিয়াতে আর্যদের সাময়িক উপস্থিতি মেনে নিলেও তারা যে বহিরাগত এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

আর্যদের ইয়োরোপীয়ানত্ব নিয়ে ওদেশের ভারততত্ত্ববিদদের দাবী বেশ কিছুদিন ধরে উচ্চগ্রামে প্রচারিত হচ্ছে। তাঁদের যুক্তি: **Indo-European** অন্তর্গত লিথুয়ানিয়ান ভাষাতেই এই ভাষাগোষ্ঠীর আদি বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান এবং পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের তুলনায় ইয়োরোপেই ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি ভাষার প্রচলন। সুতরাং আর্যরা ইয়োরোপ থেকেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এই সিদ্ধান্তই যুক্তিগ্রাহ্য।

ভাষাভিত্তিক এই থিওরির উপস্থাপনা অষ্টাদশ শতকে শেষপাদে।

Coeurdoux এবং স্যার উইলিয়াম জোনস বৈদিক ভাষা ও গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্টিক, পারসিক ভাষাগুলির মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। যেমন বীর (warrior = সংস্কৃত) ≡ Vir (ল্যাটিন) ≡ Wer (অ্যাংলো স্যাকসন) ≡ Heros (গ্রীক)।

পিতর (সংস্কৃত) ≡ Pater (ল্যাটিন) ≡ Father (ইংরাজী) ≡ Fadar (জার্মান)।

অশ্ব (সংস্কৃত) ≡ Hoise (ইংরাজী) ≡ Aszawa (লিথুয়ানিয়ান)। শুধু শব্দগত নয়, ব্যাকরণ ও গঠনশৈলীর মিশ্রণও এমনই উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতদের ধারণা হল যে এইসব সমপ্রকৃতির ভাষাগুলি মূলে ছিল একটি সাধারণ উৎসভাষা যা কিনা অধুনা লোপ পেয়ে গেছে। এই উৎসভাষা ইয়োরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে বর্তমানের সদৃশ ভাষাগুলি উৎপন্ন হয়েছে। এই ভাষাগোষ্ঠীর নাম দেওয়া হল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী।[১]

তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিকদের পরবর্তী প্রচেষ্টা হল সেই অজানা ভাষার আদি রূপরেখা মনে রেখে ও ভৌগোলিক বিশেষত্ব বিচার করে, এইসব ভাষাভাষীদের বৈশিষ্ট্যের একটা স্পষ্ট ছবির ধারণা করা। তাঁদের মতে ঐ মনুষ্যগোষ্ঠীর বাস ছিল সমুদ্র থেকে দূরে। স্থানগুলির আবহাওয়া ছিল গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের। তারা যাযাবর নয়, তাদের জীবনযাপন হত কৃষিকাজে ও পশুচারণে। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর, শুয়োর তাদের পালিত পশু বলে অনুমান করা হয়। এই সব থেকে Dr. P. Giles সিদ্ধান্ত করলেন এই শর্ত পূরণ করতে পারে ইয়োরোপের একটিই অঞ্চল। সেটি পূর্বদিকে কার্পেথিয়ান পর্বতমালা (Carpethians), দক্ষিণে বল্কান (Balkans) পশ্চিমে অস্ট্রিয়ান আল্পস (Austrian Alps) ও Brehmer Wald এবং উত্তরে Erzgeberg ও কার্পেথিয়ান পর্বতমালার সংযোগকারী পর্বতশ্রেণী। অঞ্চলটি সুজলা সুফলা হাঙ্গেরীর শস্যক্ষেত্র এবং তৃণভূমি সমন্বিত যা কিনা অশ্বপালনের উপযুক্ত।[২] J. L. Myres ও Harold Peake-এর অনুগামীদের ভিন্ন মত। তাঁরা মনে করেন দক্ষিণ রাশিয়ার তৃণভূমি ও কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বদিক হচ্ছে এই জায়গা। অধ্যাপক স্টুয়ার্ট পিগট (Stwart Piggott) প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে অনুমান করেন যে খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বা দু হাজার বছরে মনুষ্যগোষ্ঠীর জীবন ছিল কৃষি

১. Sir W. Jones' Presidential address to the Asiatic Society of Bengal, 1786.

২. *Cambridge History of India*, Vol. I, pp. 68-69.

ও যাযাবর বৃত্তির সংমিশ্রণ। সমাধি দেখে মনে হয় যে তারা মোটের উপর স্থায়ী বসতিতে বাস করত। গোড়াতে না হলেও অন্তত পরবর্তীকালে তারা ভেড়া, গবাদিপশু ও ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে ছিল। মৃতের সমাধি পাথুরে যুদ্ধ কুঠার সহ সমাধি দেখে অনুমান করা হয় যে তাদের সমাজে যোদ্ধা ও দলপতির অস্তিত্ব ছিল। এ তর্কের মীমাংসা এখনও হয়নি।

আর্যদের অভিপ্রয়াণ পথ (Migration route) নিয়েও পাশ্চাত্য ভারত-তাত্ত্বিকদের (Indologists) মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। দক্ষিণ রাশিয়াতে তৃণভূমিকে (steppes) যাঁরা আদি আর্যবাসভূমি মনে করেন, তাঁদের মতে এশিয়াগামী আর্যদের দলের পথ ছিল কৃষ্ণ সাগরের উত্তর দিক দিয়ে হয়ে ককেশাস পর্বত পার হয়ে বা কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিক ঘুরে। এতে Dr. P. Giles-এর ঘোর আপত্তি। তিনি বলেন, প্রায় অসহায় কোনও আদিম নর গোষ্ঠীর পক্ষে তাদের গবাদি পশু ও যাবতীয় মালপত্র নিয়ে মনুষ্যবাসের অযোগ্য এই অঞ্চল অতিক্রম করা অসম্ভব। তাঁর মতে আর্যদের এশিয়াযাত্রাপথ ছিল বসফরাস বা দার্দানেলিস প্রণালী অতিক্রম করে। এরপর তারা কৃষ্ণসাগর-এর দক্ষিণ ধরে পূর্বদিকে এশিয়া মাইনরের লেক Van অঞ্চল পার হয়ে Tabriz ও কাস্পিয়ান সাগর, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ পার হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌছায়। তাঁর এ মতের সপক্ষে আছে এশিয়া মাইনরের বোঘাজ কোই (Boghaz-Koi) শিলালেখ (খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতক)। এই শিলালিপিতে আমরা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র দেবতার নাম পাই। পশ্চিম এশিয়ার সমসাময়িক তেল-এল-আমারনা (Tel-el-Amerna) লিপির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এই প্রাচীন লিপিতে আমরা ঋগ্বেদের দেবতাদের উল্লেখ দেখি। এগুলিতে আমরা মেসো-পটেমিয়া মিটানিজাতের রাজা বা আর্টাটামা (Artatama), টুসারাট্টা (Tusratta), সুত্তারনা (Suttarna) প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাই। এসব নাম নিশ্চিতভাবে আর্যদের।

খ্রীঃ পূঃ ১৭৪৬ থেকে ১১৮০ সালে মিডিয়া দেশের কাসাইট জাতি গোটা ব্যাবিলনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাদের মধ্যেও রাজারা জড়া এবং তাদের দেবতাও ছিল আর্যনামধারী যদিও জাতি হিসাবে তারা মিটানিদের থেকে পৃথক। তাদর সুরিয়স সংস্কৃতের সূর্য, মারিটাস মরুত আবার সিমালিয়া বরফের রানী। পর্বত (হিমালয় পর্বত) ও নগাধিরাজ হিমালয়ের অনেক নামের সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই বরফের ইরানী শব্দ Zima—বরফ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন অ্যাসিরীয় মন্দিরে পূজিত দেবদেবীর নামের তালিকা পাওয়া যায় Assur Banipal-এর (C. 700

B. C.) পুস্তক ভাণ্ডারে। Assura-Mazdas এবং তার সাত পরী ও সাতজন দুষ্ট আত্মার (spirits)-এর সঙ্গে জরথুষ্ট্রীয় দেবরাজ Ahura-Mazda এবং সাত Amesha-spentas এবং সাত দুষ্ট Daivas-এর মিল স্বতঃসিদ্ধ। ...

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতের বিপক্ষে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিকগণ বৈদিক আর্যদের ভারতীয়ত্ব জোরালো যুক্তি খাড়া করলেন। এদের মধ্যে প্রধান হলেন K. M. Munshi, R. C. Gaur, A. P. Agrawal, D. P. Agrawal, B. B. Lal, A. C. Day প্রভৃতি আরও অনেকে।

মানব সভ্যতার প্রাচীনতম দলিল ঋগ্বেদের আর্যদের দ্বারা রচিত হয়েছিল সপ্তসিন্ধুর দেশে। এতে ভৌগোলিক নাম ও বিবরণও সবই এই অঞ্চলের— এশিয়ার অন্য অঞ্চল বা ইয়োরোপের নয়। এতে আমরা বৈদিক আর্যদের জীবন ও চিন্তাধারার পরিচয় পাই। সঞ্চারণশীল একটা মানবগোষ্ঠী তাদের অভিপ্রয়াণের (migration) আগের স্থানগুলির স্মৃতি অতি যত্নে মনের মণিকোঠায় জমিয়ে রাখে। আর্যদের বৈদিক সাহিত্যে অভারতীয় কোনো স্থানের নামই আমাদের চোখে পড়ে না। যেকোনো ইয়োরোপীয় ভাষার চেয়ে সংস্কৃতে আদি ইন্দো-ইয়োরাপীয় ভাষার আদি রূপরেখা চোখে পড়ে বেশি। ভারতের বাইরেই যদি আর্যদের বাসস্থান থেকে থাকে অথবা যে অঞ্চল দিয়ে তাদের ভারতে আগমন সে পথের কিছু হদিশ তাদের জাতিসত্তায় নিশ্চয়ই থাকতো। ঋগ্বেদের ভৌগোলিক বিবরণ চমৎকার খেটে যায় পাঞ্জাব ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে। সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কারের পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে খননকাজ শুরু হল। এবং ভারতই আর্যদের বাসস্থান এ মত জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতে প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, লৌহযুগ, Ochre Coloured Pottery (OCP) সংস্কৃতিতে সবগুলি যুগের মানবসভ্যতার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। যুগ নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতি Radio Carbon Dating পদ্ধতি প্রয়োগ করে এসব জানা সম্ভব হয়েছে। K. V. Soundara Rajan-এর মতে OCP-র সাথে পাওয়া তাম্রপিণ্ড হরপ্পা শ্রেণীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অ-হরাপ্পীয় তাম্র ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী তাম্রশিল্পে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা যায় এরকম তাম্র আকরের নিশ্চয়ই সন্ধান পেয়েছিল। তাদের বিচরণশীল অর্ধ-নাগরিক সমাজ ব্যবস্থাতে তাদের ছেড়ে যাওয়া অশুদ্ধ তাম্রপিণ্ডের সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রস্তর যন্ত্রপাতি (microliths) পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে। তাম্র ছিল তাদের কাছে মহামূল্যবান ও ক্রমদুষ্প্রাপ্য ধাতু। তাম্র শিল্পীরা ধাতু-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারক ও বাহক। মধ্যভারতে গিরিমাটি রংয়ের মৃৎশিল্প ছিল এই তাম্রশিল্পের

সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। Soundara Rajan-এর মতে নাসিকে Period I-এ তাই OCP-র সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রস্তর যন্ত্রের সহাবস্থান। এই সহাবস্থান কিন্তু Jorwe-এর নিম্নমানের ব্রোঞ্জের সঙ্গে নেই। Maheshwal-ও বলেন তাম্র কুঠারের সঙ্গে OPC-র উপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। তাম্রশিল্পের সঙ্গে OCP-র নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে এখন প্রমাণিত সত্য। তাঁর মতে রাজস্থান ও সিংভূমের তাম্রশিল্পে অগ্রগতি গঙ্গা অববাহিকার তাম্রশিল্প প্রবর্তনের কারণ।

R. C. Gour, B. B. Lal, M N. Deshpande, R. C. Agarwal, A. C. Das এবং আরো অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিমত আর্যসভ্যতার সূতিকালগ্ন থেকে উন্নতির শিখরে পৌঁছনো একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা।

OCP (Ochre-Coloured Pottery=গিরিমাটি রংয়ের মৃৎপাত্র) প্রথম আবিষ্কার করেন B. B. Lal হস্তিনাপুরাতে (Hastinapura, Period I) (1954-55) খননের ফলে। পরবর্তীকালে এগুলি রাজস্থানে, গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে পাওয়া গেছে। যেমন উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে (Doab), রাজস্থানের, হারয়ানা, পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে। অনেক জায়গায় খননকাজ হয়েছে, এর ফলে OCP-র সঙ্গে যুক্ত সভ্যতা সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। সাইপাই (Saipai) (Lal, 1971-72) উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া (Etawah) জেলায় পাওয়া নিদর্শনে তাম্রবস্তুর সঙ্গে OCP-র অবস্থান দেখা গেছে। একটা মাথায় হুকওয়ালা বর্শাফলক ও একটি হারপুণ এই জাতের জিনিসের সঙ্গে পাওয়া যায়। এখানেই পাওয়া গিয়েছিল অনেক তাম্রভাণ্ডার (Hoard)।

গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় OCP-র এই আবিষ্কার হলেও জিনিসগুলি ইতস্তত ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায় (Lal, 1968), R. C. Gour U. P.-এর বুলন্দসার জেলার Lal Quila-তে (1969-72) খনন কাজ চালান। Gour-এর (1971-72, 73) আবিষ্কারের ফলে আমাদের ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটে। Ambkheri (Despande, 1971-72, 1977)-এ (সাহারানপুর জেলা, U.P.) এবং যোধপুরা (Agrawal ও Vijai Kumar, 1976 ; Agrawala, 1977)—তহশীলে (Jaipur, Rajasthan) রীতিমত বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। দুটি জায়গায় একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল। Ambkheri-তে হরাপ্পীয় সংশ্রব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যোধপুরে হরাপ্পীয় সংশ্রবহীন এবং Lal Quila-র মত (Gour, 1973), Siswal (Suraj Bhan, 1971-72), Chautang নদীর বাঁ পাশে (Chautang=প্রাচীন দৃশদ্বতী) [হরিয়ানার হিসার জেলায়] Sothi (Dikshit 1984) Faridabad (Sharma, 1982), Lal Quila-র সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য

লক্ষণীয়। এইসব জায়গাগুলি প্রাক্-হরাপ্পা যুগের এবং Saraikhola (Halim, 1972 a 1972.b) Bhir স্তূপ (Taxila) থেকে 2.5 কিমি. দূরে (পাকিস্তানে)। ইতিমধ্যে Taxila প্রাক্-হরাপ্পা যুগের বলে মনে করা হচ্ছে। এই পারিপার্শ্বিকে Hathial যে বসতি আবিষ্কার হয়েছে তার বয়স স্থির হয়েছে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দে (Allchin, 1982)। এখন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এবং পাকিস্তানে সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন ধারা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (1.8.1 : 1·6) যে প্রলয়ের কথা আছে, যা থেকে জানা যায়, মনু একাই শুধু বেঁচে যান, তার উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই ; কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আছে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি অবিশ্রাম বৃষ্টি ও প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও প্রচণ্ড ভূমিকম্পে OCP জনপদগুলি ভেসে যায়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতির Mythology-তেই এই প্লাবনের উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এই প্লাবনেই সিন্ধুনদীতীরবর্তী মহেঞ্জোদরো সভ্যতা ধ্বংস হয় (Raikes, 1964, Dales 1965)। Lal Quila-তে অতীতের সে ভূমিকম্পের নিদর্শন দেখা যায়। কিছু মানুষ পশ্চিম পথ ধরে পালিয়ে বাঁচল আর এই প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের স্মৃতি বয়ে নিয়ে গেল তাম্রাস্ত্র ব্যবহারকারী আর্যগোষ্ঠীর পক্ষে আদিম (primeordial) অরণ্যসঙ্কুল পূর্ব দিকের গঙ্গা উপত্যকা অগম্য ছিল।

ঋগ্বেদের কালের নদী সরস্বতী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে হরাপ্পীয় পরিণত সভ্যতার অবনতি ঘটে। কালিবঙ্গানে (Kalibangan) আমরা তার নিদর্শন দেখতে পাই : সরস্বতী উপত্যকায় প্রাক-হরাপ্পীয়, হরাপ্পীয় এবং PGW (Printed Glazed Ware) এ তিন সভ্যতারই নিদর্শন পাওয়া যায়। PGW সর্বশেষের সভ্যতা। সরস্বতীর শুষ্ক নদীবক্ষে আমরা এর সাক্ষ্য পাই। হরাপ্পীয় সভ্যতা নগর সভ্যতা এবং ঋগ্বেদ বর্ণিত আর্য সভ্যতার সঙ্গে তার বিস্তর পার্থক্য। কাজেই এ সিদ্ধান্ত স্বতঃই এসে যায় যে সপ্তসিন্ধুর প্রাক-হরাপ্পীয় সভ্যতা সত্যিকারের আর্যসভ্যতা।

Barrow (1973)-র মতে ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য থেকে ঋগ্বেদের ভাষা সদৃশ আরো অনেক ভাষার যে ভাষা-পরিবার তা সুদূর অতীতের কোন বিস্মৃত এক উৎস ভাষা থেকেই উৎপন্ন। এই আদি সাধারণ ভাষাভাষীদের দেশ ছিল ; Giles (1914)-এর মতে হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল। তাঁর অভিমতের সপক্ষে আছে বোঘাজ কোই (Boghaz Koi)-এর লিখন (খ্রীঃ পূঃ 1400)। ঋগ্বেদের মিত্র, বরুণ, ইন্দ্রের নাম দেখা যায় এতে। ম্যাক্সমুলার। Max Muller, 1860) এশিয়া মাইনরের রাজারাজড়ার নামে ঋগ্বেদের নামের সাদৃশ্য দেখে এশিয়া মাইনরকে আর্যদের আদি বাসভূম বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। আর্যরা

ভারতে প্রবেশ করে এখান থেকেই। নামবাচক শব্দগুলি কিন্তু ঋগ্বেদের নামের অপভ্রংশ মাত্র এবং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে একটি ভাষা উৎপত্তির স্থান ও কাল থেকে দূরে চলে গেলেই বিকৃত হয়, উল্টোটা সত্যি নয়। সুতরাং আর্যরা সপ্তসিন্ধুর দেশ থেকেই বহির্গমন করেছিল এটা ধরে নেওয়া অধিকতর সঙ্গত; এবং এই অভিপ্রয়াণ (migration) ঘটেছিল প্লাবনের এবং ঋগ্বেদের পরবর্তী কালে।

Lal Quila এবং প্রাক্-হরাপ্পীয় মাটির পুতুল এবং মৃৎপাত্রে চিত্রিত অশ্ব, বৃষ ঋগ্বেদে উল্লেখিত এবং আর্যদের প্রিয় জীবজন্তু।

Lal Quila-তে পাওয়া অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে ঘোড়ার হাড় ছিল। Mohan-Jodaro, হরাপ্পা, Rupar, Lothal, *Sarkatda* এসব জায়গাতেও গৃহপালিত ঘোড়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। (Swell এবং *Guha* 1931, Sharma 1974; Nath, 1963, Prasad, 1936)। এর থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাক্-হরাপ্পীয়দের (আর্য) দের কাছ থেকেই হরাপ্পীয়রা অশ্ব সম্বন্ধে জেনেছে, অবশ্য তারা নিজেরাও শিখে থাকতে পারে।

Atranjikhera, Lal Quila, Jhinjhina, *Nasipur* এইসব জায়গা থেকে পাওয়া মৃৎপাত্রের টুকরোর Carbon dating থেকে জানা যায় (Huxtable, Zimmerman ও Gaur, 1977) যে OCP সভ্যতা, প্রাক-হরাপ্পীয়, হরাপ্পীয় সভ্যতার পরও বিদ্যমান ছিল। C^{14}-এর পরিমাণ বিচার করে Saraikhala-র প্রাক্-হরাপ্পীয় আর্য সভ্যতার কাল নির্দেশ করা হয় খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক 3200-3000 (Agrawal ও Kusumgar, 1974)।

ঋগ্বেদ (1. 35. 8) বর্ণিত আর্যদের আদি বাস সপ্তসিন্ধুতে OCP ছিল। সরস্বতী (ঋগ্বেদ VII. 36. 6; VI. 61. 10) এবং দৃশদ্বতী (ঋগ্বেদ VI. 35৯) নদীতীরে ঋগ্বেদের আর্যদের বসতি ছিল। খুঁটিনাটি বিচার করে দেখলে আর্যদের অভিপ্রয়াণ (migration) পশ্চিমদিকে ঘটেছিল বলেই মনে হয়।

পূর্বে পৃথিবীতে যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ সবই ইয়োরোপের বা ইয়োরোপে উদ্ভূত এইরকম দাবী করা হত। আর্য-সভ্যতার উদ্ভব ইয়োরোপে। সেখান থেকে এশিয়া মাইনর বা মেসোপটেমিয়া হয়ে অবশেষে মহেঞ্জোদরোর উন্নততর নগর সভ্যতাকে ধ্বংস করে বহিরাক্রমণকারী আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশ এই ছিল পূর্বেকার ধারণা। সেকালে পুরাতাত্ত্বিক খননকাজ কমই হয়েছিল। কিন্তু

পরবর্তীকালে পুরাতাত্ত্বিক খনন ও অন্যান্য গবেষণার যতই অগ্রগতি হচ্ছে আর্যদের ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে অভিমত ততই প্রবল ও অকাট্য হয়ে উঠছে।

এই নিবন্ধ রচনায় আমি অনেকের মধ্যে অধ্যাপক আর. সি. গৌর ও অধ্যাপক সুকুমার দাসের অনেক সাহায্য পেয়েছি; তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।